পুঁই-পালঙের স্বাদ

পূর্ণেন্দু পত্রীর

পুঁই-পালঙের স্বাদ

গল্প সংকলন

আত্মপ্রকাশ : ৫ এভিনিউ সাউথ, কলিকাতা-৭০০০৭৫
বিক্রয় কেন্দ্র : ৪২/১ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

Puin Palanger Swad
a collection of short stories
by Purnendu Patrea

প্রথম প্রকাশ
১ বৈশাখ ১৩৫৯

প্রকাশক
আত্মপ্রকাশ-এর পক্ষে
সমরেন্দ্র দাস
৫, এভিনিউ সাউথ, কলকাতা-৭০০০৭৫

মুদ্রক
শিবব্রত ভট্টাচার্য
জোনাকি প্রেস, ৭৯-এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

চয়নিকা, ৮২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

১

পুঁই-পালঙের স্বাদ

২

সুখেন্দুর শরীর ও মন

৩

আলো-হাওয়া-আকাশ

৪

নিশীথের একটা খাপছাড়া দিন

৫

খিদে

৬

হেরে যাওয়া

৭

কর্কটরাশি, বৃষলগ্ন

৮

জানোয়ার

৯

বেহুলা লখিন্দর ১৯৭৮

১০

আক্রমণ

১১

রাজ্যপাল বদল হয় কেন ?

পুঁই-পালঙের স্বাদ
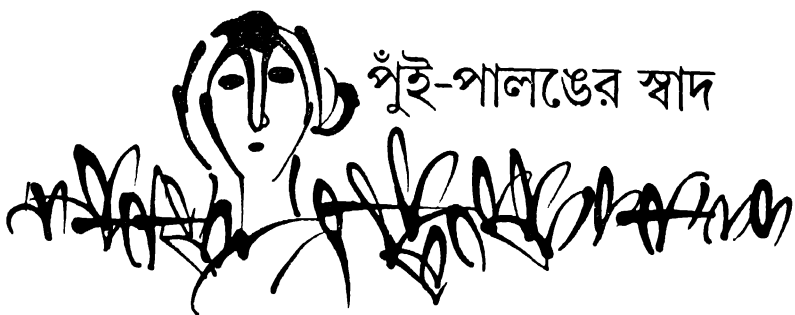
পুকুর পাড়ের পতিত ডাঙাটুকুতে আনাজ-পাতির চাষ করে গজেন সাঁত দু-বেলা দু-সন্ধ্যে খাওয়া-পরার জ্বালায় মরতে মরতে বেঁচে থাকার একটা রাস্তা খুঁজে পেল। গজেনের বাবা নবনী সাঁতের বাসনা ছিল কোন রকমে অবস্থাটার একটু ভোল পাল্টাতে পারলেই বাঁশ-খড়ি কিনে ঐ ডাঙাতেই একটা পানের বরোজ তুলবে। বাসনা পূর্ণ হবার আগেই নবনীকে স্বর্গবাসী হতে হল। নবনীর মৃত্যুর পর প্রায় বছর দেড়েক জায়গাটা বুনো আগাছার জঙ্গল হয়েই পড়েছিল। মগজে বুদ্ধিটা আসার সঙ্গে সঙ্গে গজেন উঠে-পড়ে লেগে গেল সেখানে বাগান বানাতে। শাক-সবজীর বাগান। একাই গতরে খেটে, মাটি কুপিয়ে চারপাশে কাঁটা বাবলা আর রাং-চিতের ঘন বেড়া দিয়ে ভেতরের ছোট্ট জায়গাটুকুতে অল্প কিছু দিনের মধ্যে ফল-ফসলের সমারোহে সবুজের হাট বসিয়ে ফেললে। ফল-ফসলগুলো শুধু যে ঘরে খেয়েই বেঁচে থাকার ভরসা এনেছে তা নয়। ওগুলো হাটে-বাজারে বিক্রি করে যে নগদ পয়সা আসে তা থেকেও বেঁচে থাকার অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। এখন আনাজ-তরিতরকারীর বাজারটা ক্রমশঃই

চড়ছে। আজ একরকম, কাল অন্যরকম। তাই ক্রমশঃ তার লোভ-লালসাও বেড়ে চলেছে লাভের গন্ধে। এই চড়া বাজারের মরশুমে সে যদি মোটা মূলধনের আনাজ ব্যবসায় নামতে পারতো তাহলে হ্যাঁ একবার নেড়ে চেড়ে হাতের সুখ, খেয়ে দেয়ে ভাতের সুখটা মিটতো বটে! কিন্তু বেশি সুখের জল্পনা-কল্পনায় বেশী মাথা ঘামাতে গেলে তার মাথার শিরা টনটন করে। তখন সে তার নিজের নৈরাশ্যকেই নিজে প্রবোধ জোগায়। কেন এতেই বা সুখটা কি কম। মাটির দাম নেই। গতরটা নিজের। ফল-ফসলের চারা বা বীজ জোগাড় করতে ক-পয়সাই বা লেগেছে। রোদ জলের পরমায়ু জোগাচ্ছে আকাশ প্রকৃতি। প্রায় বিনা মূলধনে এটাও কি কম লাভের ব্যবসা নাকি?

গজেনের দুঃখ-দারিদ্র্যের সংসারে একটু একটু করে জীবনের জেল্লা ফুটতে শুরু করেছে। তা বলে এমন নয় যে উর্বশীকে দেখে গজেনের মনে হয়েছে তার বৌ সত্যিকারের উর্বশীর মতো স্বর্গ-মর্ত্যের সেরা সুন্দরী। শুধু উর্বশীর গালে-মুখে একটু মাংস লেগেছে। গোল বাতাবী লেবুর মতো না হলেও গালটা যে রক্ত মাংসের তৈরী সেটা অনুভব করা যায়। মাস দুই আগে উর্বশীর গালে সাঁটিয়ে একটা চড় কষাতে গিয়ে তার চোয়ালের হাড়ে গজেনের কড়া-পড়া হাতের আঙুলগুলো ঠোক্কর খেয়েছিল। আজ যদি তেমনি কোন কারণে মাথা গরমের ঝোঁকে চড় কষাতে হয় তাহলে……। না, সেরকম মন-মেজাজ আর নেই গজেনের। প্রায় দু-বেলা দু-সন্ধ্যে অনাহার, অর্ধাহার অথবা তুষ-কুঁড়ো মেশানো খুদের জাউয়ের অখাদ্য-খাওয়ার বদলে মাজা দাঁতের মতো সাদা ভাত আর বাগানের তাজা আনাজের তৈরী ডালনা—চচ্চড়ির স্বাদ পেতেই উর্বশীর গালের মতো, গজেনের স্বভাবটারও পরিবর্তন ঘটেছে কিছু। রোগাভোগা একপাল ন্যাংটো, আধ-ন্যাংটো বুনো শুয়োরকে নিজের ছেলের মতোই আদর করে সে। ক-দিন আগে নিজের গরজেই উর্বশীর জন্যে একটা মাঝারী গোছের শাড়ী কিনে এনেছে। নিজের জন্যেও বানিয়েছে মোটা মার্কিন থানের একটি ফতুয়া, শীত কালে শীত কাটাবার কথা মনে রেখে। আর এক দিন বাজারের বেচা-কেনা সেরে বাড়ি ফেরার পথে বনমালীর সেলুনে নগদ চার আনা দিয়ে চুল-দাড়ি কামিয়েছে। উর্বশীর ফরমাস মতো টুকি-টাকি ঘর সংসারের আরও কিছু জিনিস কেনার কথা মনে মনে ছকা আছে তার। গজেন নিজেই অবাক হয়ে ভাবে নিজের পাল্টে যাওয়া মনের চেহারাটার কথা। বুঝতে পারে, ইস্ কী রস-কষ হীন শুকনো কাঠ-খোট্টাই না হয়ে গিয়েছিল তার মেজাজটা। ডাল-ভাত, টাকা-পয়সার সঙ্গে মানুষের মনের যেন নাড়ীর সম্পর্ক!

সেদিন পারুলী এসেছিল বাজার করতে।

মজার মেয়ে বটে একটা! এমন ভাবে কথা কইল, তাকাল, যেন গজেন সাঁতকে সে জীবনে কোনদিন দেখেনি, চেনে না। তোমার পুঁই-পালঙের কত করে

দর গো, ও দোকানী। আর এই বুড়ো বেগুনের দরটাই বা কি ?
গজেনও জবাব দিল সঙ্গে সঙ্গেই। না-তাকিয়ে, না-হেসে—
বুড়ো নয় গো, একদম আইবুড়ো, ছুঁয়েই দেখ না। জবাবটা দেওয়ার পর গজেন তারিফ করে নিজের রসবোধকে। আর ভেবে অবাক হয় ঠিক ঠিক জবাবটা দিয়ে পারুলকে হতবাক করার মতো বুদ্ধি কি করে এল তার মনে! সেই সঙ্গে আরও একটা ভাবনা তার মাথা জুড়ে বসে। আনাজ কিনতে এসে পারুলী সেদিন ঝুঁকে কোঁচড় পেতে বেগুন নিচ্ছিল, তখন গজেনের চোখে পড়েছে তার শরীর ও বুকের গড়নটা। বেগুনের মতোই পুষ্ট। অথচ ওর জীবন-ভরা দুর্ভাগ্য। সংসার-ভরা দুর্দিন। জীবনটা কি ব্যর্থ নয় তার, অমন শরীরকে সমাদর করার কেউ নেই যার জীবনে।
একদিন বনমালী তার সেলুন থেকে গজেনকে দেখে হাঁক দেয়।
হেই গজেন, শুনে যা, শুনে যা নারে তাড়াতাড়ি। গজেন কাছে আসতেই বলে, ইদিকে নয় উদিকে ঐ বড় রাস্তার দিকে তাকা। দেখতে পাচ্ছ ? সাদা পাঞ্জাবী গায়ে ঢ্যাঙা মতন একটা লোক যাচ্ছে, ঐ যে রে ছাতা মাথায় বেটে লোকটার পাশে। ওকে চিনতে পারু ?
গজেন বলে, না, কে বল্ তো ? আমি চিনি নাকি ? বনমালী একজন খদ্দেরের গালে সাবান মাখিয়ে ঝোলানো চামড়ার ফিতেয় ক্ষুরটায় শান দিতে দিতে বলে, ওকে চিনলুনি, ঐ গো পারুলীর ভাতার। বাঁশুল্লের মানিক পধ্যান; আমার দোকানে এসেছিল চুল ছাটতে!
তাই নাকি ? তা পারুলীর খবর-টবর জিজ্ঞেসা করলো ? নিজের ছেলের কথা কিছু জিজ্ঞেস করেনি ?
হ্যাঁ, করল বৈকি। সব খবরই জিজ্ঞেস করলে। জানু লোকটার বোধায় মন পড়েছে। পারুলীর টানে না হোক্, ছেলের টানেই বোধায় নরম হয়েছে। প্রায়ই তো যাতায়াত করে ইখেন দিয়ে। আসলে লোকটার মনের ভাব কি জ্যানু ? আশেপাশে ঘুরেছে। শ্বশুর বাড়ির কেউ দেখতে পেয়ে যদি একটু সাধাসাধি করে তাহলেই রাগ-ভঞ্জন মান-ভঞ্জন হয়।
খবরটা শুনে গজেনের মনে পারুলীর জন্য এক অদ্ভুত সমবেদনা জাগে।
স্বামীর সংসার থেকে বিতাড়িত হয়ে দীর্ঘকাল বাপের বাড়ীর দুঃখ-কষ্টের সংসারে পারুলীর জীবনটা কত কষ্টেই না কেটে চলেছে।
গজেন ঠিক করে সন্ধ্যের পর পারুলীর বাড়িতে গিয়ে মানিক প্রধানের খবরটা দিয়ে আসবে।
কিন্তু নানা কারণে যাওয়া হয়ে ওঠেনি তার। একদিন দু-দিন নয়। পরপর-কদিনই। চাষ-বাসের কাজ শেষ হয়ে গেলেও মাঝে মাঝে গিয়ে জমিতে 'আগো' মেরে আসতে হয়। তাছাড়া ক-দিনের প্রচুর বর্ষায় বাগানে জল জমে গিয়ে আনাজ

পাতির যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট সামলাতেও ভারী ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে।

একদিন শেষ বিকেলে গজেনকে চমকে দিয়ে পারুলী তার বাগানে এসে দাঁড়ায়। শেষ বিকেলের রাঙা আলোয় চওড়া-চওড়া পুঁই-পালঙ ইত্যাদির সবুজ পাতা-গুলোয় সোনালী আভা ফুটেছে। চারপাশের এই নিবিড় ঘন সবুজ ও সোনালীতে মেশানো উজ্জ্বল রঙের সমাবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে পারুলীর গায়ের শ্যামল রঙেরও বদল ঘটে যায় কিছুটা।

পারুলী বলে, এই আসতে হল একবার। বাড়িতে কুটুম এসে গেলেন একজন।

কুটুম! গজেনের মনে পড়ে গেলে মানিক প্রধানের কথা। শেষ পর্যন্ত সেকি নিজেই ধরা দিয়ে নিজের পাপ-অন্যায়ের প্রায়শ্চিত করলো নাকি?

কুটুম, কুটুম আবার কে এল?

ছোট বোনের বর এল!

কুটুমটি যে মানিক প্রধান নয় এটা জেনে গজেন খুশি হয়। মানিক প্রধানের খবরটা পারুলীদের বাড়ীতে নিজের মুখে জানানোর সুযোগটা এখনো হারায়নি সে। গজেন জিজ্ঞেস করে, তা কিছু কি চাই নাকি? কি দরকারে ইখেনে আসা হয়েছে গা।

কিছু আনাজ পাতি নিতে। এক সের পুঁই শাক আর একপো করে বেগুন আর ঢেঁড়ুস দাও দেখি।

গজেন বলে, এ বাগান থেকে তো আর বেচাকেনা করিনি। মাপতে ওজন করতে গেলে আবার দাঁড়িপাল্লা আনতে হবে বাড়ি থেকে। তার চে আমি বরং তোমায় কিছু খেতে দিচ্ছি, নিয়ে যাও।

বর্ষার অতিরিক্ত জলে গোড়া পচে যেসব গাছের ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, এতক্ষণ সেগুলোকেই বেছে সাফ-সোফ করছিল গজেন। কিছু বাদ-সাদ দিয়ে ওর মধ্যে থেকেই আবার ভালো কিছু বেছে হাটে টাটকা আনাজের সঙ্গে বিক্রি করা যাবে। গজেন সেই জমানো আনাজ-পাতি থেকে ভালোমন্দ মিশিয়ে কিছু দেয় পারুলীকে।

বিনা পয়সায় এতগুলো আনাজ পাওয়ার আনন্দে যাবার সময় পারুলী খানিকটা শুকনো খাতির করে, এসো নাগো মোদের বাড়ি। নতুন জামাইকে দেখবে।

মুখ মিষ্টি করাবে নাকি?

সে হবে খন।

যাবার পথে একটু থমকে দাঁড়িয়ে পারুলী হেসে জবাব দেয়। তুচ্ছ-দু-দশ পয়সা আনাজের দামের চেয়ে অনেক বেশি দামের হাসি।

গজেন সন্ধ্যেটা পেরতে না পেরতেই ঘরে মন টিকোতে পারে না।

উর্বশী তালের বড়া ভাজছিল। একটু বসতে বললে গজেনকে। একটু বসলেই

হত। কিন্তু কি ভেবে গজেন উঠে পড়ল। সেই তালের বড়া জুটে গেল পারুলীদের বাড়ি। তালের বড়ার সঙ্গে দুটো রসগোল্লা। বোঝা গেল রসগোল্লাটা এনেছে নতুন জামাই। জামাইকে দেখে মন্দ লাগলো না। বয়স অল্প। লাজুক ও মেয়েলী ধরনের মুখ।

কোথাকার সয়লা-গানের দলে বেহুলা সাজে। ভালো গান জানে। চাষী-ভূষিদের ঘরে সচরাচর যেমন জামাই আসে, তেমন নয়। পোশাক পরিচ্ছদে সভ্য-ভব্যতার ছাপ আছে।

আর গজনের সবচেয়ে অবাক লাগল সেই অল্পবয়সের মুখচোরা জামাইকে কেন্দ্র করে পারুলীর অতিরিক্ত গায়ে-পড়া রং-ঢং, আদর-আবদার, ছল-চাতুরী। গজেন এর কারণটা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে বলেই তার মনের মধ্যে অভাগিনী পারুলীর জন্যে একটা কোমল বেদনা উৎসারিত হয়। শেষ পর্যন্ত সকলের সামনেই পারুলীর মাকে উদ্দেশ্য করে গজেন মানিক প্রধানের ঘটনা বলে : মন পড়েছে লোকটার। এ-পক্ষ থেকে একটু ডাকা-হাঁকা পেলেই লোকটা আবার সব গণ্ডগোল মিটিয়ে নিজের সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে পারুলীকে।

পারুলীর মা কপালে অনেকগুলো চিন্তার রেখা ফুটিয়ে যখন গজেনকে মানিক সম্বন্ধে আরও দুটো একটা প্রশ্ন করছিলেন সেই সময় দলিতা নাগিনীর মতো ফুঁসে উঠল পারুলী।

তোমাকে এত সাউকুড়ি ফলাতে কে বলেছে ইখেনে এসে? দালালী করতে এসেছ বুঝি? যার বৌ ছেলের দরকার সে নিজে এসে পায়ে তেল দিয়ে আবাহন করতে পারে না? তোমাকে ওকালতি করতে হবে কেন তার হয়ে? সে নিজে আসুক না। মুড় ঝাঁটায় ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবনি।

পারুলীর রণচণ্ডী-মার্কা মূর্তি দেখে গজেন ভড়কে যায়। লজ্জাও পায়। অপমানিত হয় আরও বেশী। একটা বিদেশী অচেনা লোকের সামনে তার মান-মর্যাদা মাটি হয়ে গেল ভেবে। যে-পারুলীকে হাসলে অমন সুন্দর দেখায়, সে যে রাগলে এমন ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, এমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো গজেনের আগে হয়নি। মনটা তার বিষিয়ে যায়।

বাড়ী ফিরে গোগ্রাসে একথালা ভাত খায় সে। উর্বশীর রান্না কুচো চিংড়ি দিয়ে কুমড়ো পুঁই শাকের তরকারীটা অমৃতের মত মনে হয়। শরীরে রঙ জেল্লা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রাধার হাতটাও কি উর্বশীর খুলে গেছে নাকি?

কয়েকদিন পরে বাজারে যাওয়ার পথে পারুলীর সঙ্গে আবার দেখা হয় গজেনের, ঘাট থেকে বাসন মাজা ফেলে পারুলী ডাঙায় উঠে এসে বলে, বলি ও কাজের মানুষ, এক মিনিট দাঁড়াবার ফুরসুৎ নেই বুঝি?

গজেন কোন জবাব না দিয়ে কেবল থামে একটু। মাথায় আনাজের ঝোড়া। রেগে বুঝি টং হয়ে আছো সেদিনের গাল-মন্দের কথায়, রাগ কি আর সাধে

হয়েছিল। তোমার গায়ে পড়া দরদ দেখে হয়েছিল।

গজেন বলে, আমি কি নিজের জন্যে কথাটা বলেছি। তোমার ভালোর জন্যেই বলেছি। পারুলী ঠোঁট উলটে হাসে। কিন্তু পরক্ষণে কথা বলে হাসির উল্টো ধরণে। কেন গো, তুমি কি আমার ভরণ-পোষণের মালিক নাকি, যে আমার ভালো-মন্দের কথা ভাবতে হবে তোমাকে?

সেদিন অপমানটা বিনাবাক্যে গায়ে মেখে নিয়েছে বলেই বুঝি পারুলীর সাহস বেড়েছে রাস্তায় ঘাটে তাকে অপমান করার? গজেন ভাবে একটা কোন রকম নোংরা কথা বলে পারুলীর বাড়াবাড়ি রকমের ঔদ্ধত্যের জবাব দেয়। কিন্তু তার বদলে সে এক পলকে পারুলীর শরীর ও স্বভাবের মধ্যেকার বৈপরীত্যের কথা ভেবে নিয়ে কেমন একটা নিরাবয়ব বেদনা উপলব্ধি করে। পারুলীর সামনে না দাঁড়িয়ে হনহন করে হাঁটা শুরু করার মুখে দুর্বল ভঙ্গিতে বলে যায়, ভরণ-পোষণের মালিক না হলেই বুঝি মানুষের সুখ-দুঃখের কথা ভাবতে নেই?

আকাশের ওপর থেকে সন্ধ্যেটা ক্রমশঃ ভারী হয়ে মাটির দিকে নামছে। পুকুরের জলে ম্লান হয়ে এসেছে গাছের ছায়া। চার পাশে ভয়ংকর স্তব্ধতা। কতদূরের একটা গাছে একপাল কাকের চেরা গলার কলরব ঘাটে দাঁড়িয়ে শুনতে পাচ্ছে পারুলী। মাঠ থেকে ধানের সতেজ চারার গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। তার সঙ্গে ভিজে মাটির। পারুলী ঘাটে এসেছে গা ধুতে। পুকুরে নেমে শরীরটাকে জলে ভিজিয়ে তোলার আগে অকারণে একঠায়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। তার চোখের দৃষ্টি পুকুরের ওপারের লম্বা লম্বা নারকেল গাছের মাথার ওপারের বিস্তৃত আকাশের দিকে।

আনমনে এতক্ষণ সে যে কী ভাবছিল তা সে নিজেই জানে না। তার ছোট বোন ঘাটের সামনের তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যের পিদিম দেখাতে এলে পারুলী সজাগ হয়ে তরতর করে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে জলে নেমে যায়। পারুলীর আনমনা ভাবটা কেবল যে ছোট বোন মনসারই চোখে পড়ল তা নয়। জামাই গনেশেরও চোখ এড়িয়ে গেল না। সকাল থেকে তার মনটাও বর্ষা ঋতুর মতো মেঘলা মেঘলা, কাল তার চলে যাওয়ার দিন।

কাল সকালের পর আবার কতদিন সে মনসাকে দেখতে পাবে না। বিয়ের সময়-কার মনসা শরীর-মনে অনেক বদলে গেছে এক বছরে। আগে কাছে ডাকলে ঘোমটার আড়ালে থর্‌থর্‌ করে কাঁপতো। এখন ঘোমটা খুলে চোখ দুটোকে চড়ুই পাখীর মতো নাচিয়ে-ঘুরিয়ে পানের পিক্‌ মাখা ঠোঁটে-ফিকফিকিয়ে হেসে কাছে এসে দাঁড়ায়। আরো কাছে ডাকলে কাজের ছল করে দূরে সরে যায়। আবার রাগ করে আরো দূরে সরিয়ে দিতে চাইলে গলা জড়িয়ে বুক জড়িয়ে শরীরটাকে মাতিয়ে তোলে।

আজকের একটা রাত্রিতে এক সঙ্গে কত রাত্রির ভালবাসা সে বাসবে তারই বিরামহীন

চিন্তার ফাঁকে গনেশের চোখে পড়ে পারুলীর গম্ভীর আনমনা মুখটা। কিন্তু এর কারণ জানবার কৌতূহল প্রকাশ করতে সাহস পায় না সে। হয়তো সকলের সামনে সেদিনকার গজেনের মতো তাকেও অপমান করে বসবে।

গনেশের চোখে মনসা যাই হোক আসলে তো সে এগারো বছরের একরত্তি গেঁড়ি মেয়ে। শরীরের গড়নের জোরেই একটু বড় মনে হয়। চাষী-ভূষীর সংসারে এরকমই হয়ে থাকে।

বিছানায় শুতে আসার কিছু পরেই মনসার চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে। কাল সকালের পর থেকে বুকে জড়িয়ে ঘুমোবার মানুষটাকে আর যে বুকের পাশে পাবে না এই বেদনাদায়ক অনুভূতির প্রতি মন তার যতই সকরুণ রকমের সজাগ থাকুক ঘুম জিনিসটার ক্রিয়া তাকে শরীরে-মনে নিস্তেজ করে রাখে। গনেশ নানা ফন্দি-ফিকির খাটিয়ে তবু অনেকটা রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখার দুঃসাধ্য চেষ্টা করে। তার ফলেই কিছুক্ষণের মতো সে একবার করে জেগে ওঠে। কিন্তু একটু পরেই যখন কানে আসে মনসার মৃদু নাক ডাকার শব্দ--রাগে দুঃখে অভিমানে গনেশের ইচ্ছে করে এই ঘুমকাতুরে মেয়েটার গালে ঠাস করে এক চড় কসিয়ে এখুনি তার টিনের সুটকেশে জামা-কাপড় ভরে নিয়ে এখান থেকেই চলে যায়।

গনেশ এতখানি করতে পারে না বটে কিন্তু দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে বিছানা ছেড়ে। ভিজে উঠোনে সবুজ শ্যাওলা জমেছে। আকাশ মেঘলা। হয়ত শেষ রাতে বৃষ্টি হবে। গনেশ ভাবে বৃষ্টিতে পথে-ঘাটে এক হাঁটু জল জমলেও কাল সে এখানে অন্নগ্রহণ করবে না। এমনকি মনসার চোখের জলেও যদি কোনদিন এই উঠোনের মাটিতে এমনি শ্যাওলা জমে ওঠে—তবুও ফিরবে কিনা সন্দেহ। সেকি এতই অপদার্থ যে মনসার মত একটা একফোঁটা পুঁচকে মেয়ের কাছ থেকে পায়ে ধরে খোসামোদ করে ভালবাসা আদায় করবে।

মনের মধ্যে একটা বিশ্রী ফাঁকা জ্বালা মোচড় খেতে থাকে তার। সেই সঙ্গে পেটের মধ্যেও কিসের যেন কামড়ানি ওঠে। শ্বশুর বাড়িতে এসে কয়েক দিন ধরে কেবলই পুঁইশাক আর কুমড়োর ঘণ্ট খাচ্ছে, তারই ফলে হজম শক্তির কোন রকম ব্যাঘাত ঘটে গেছে বোধহয়।

পাশের ঘরে থাকে পারুলী। সে এতক্ষণ জেগেই ছিল। ওদের কথাবার্তা কানে এসেছে তার। সেও তো কিছুকাল একটা পুরুষ মানুষের সঙ্গে কাটিয়েছে। কিন্তু পুরুষ মানুষের অমন মেয়েলী স্বভাব তার চোখে পড়েনি। খানিকটা ঈর্ষায় এবং বিরক্তিতে তার একবার ইচ্ছে করছিল নিজের ঘুমন্ত ছেলেটাকে চিমটি কেটে জাগিয়ে তোলে। ছেলেটা ভ্যাঁ করে চেঁচিয়ে কাঁদলে ওদের রাত জাগা ভালবাসার গজর-গজর তাকে আর শুনতে হবে না। কিন্তু ক্রমশঃ পাশের ঘরটাকে সাড়াশব্দ-হীন হতে দেখে পারুলী উৎকর্ণ। বোধহয় মান অভিমানের পালা। শেষ পর্যন্ত

গনেশের খিল খুলে বেরিয়ে আসার শব্দে অবাক হল পারুলী। এবং অনেকক্ষণ সময় কেটে যাবার পরও সে ঘরে ঢুকল না বুঝে পারুলী নিজেই বাইরে বেরিয়ে এলো।

দরজা খুলে দেখলে গনেশ বোকার মত আকাশের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

কি গ, দাঁড়ি কেন হেথা।

গনেশ উত্তর দেয় না।

উ বুঝি ঘুমিয়েছে ?

গনেশ কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে।

সমস্ত বাড়িটাও গনেশের না-বলা কথার মত নিশ্চুপ।

মানুষের জগতে এই মহা নিস্তব্ধতার সুযোগেই যেন আকাশে মেঘের জগতে একটা বিরাট দুরভিসন্ধি পাকিয়ে উঠছে। মেটে রংয়ের জলভারাবনত চাপ চাপ মেঘগুলো যেন একজন আরেকজনকে ঠেলা দিয়ে ছুটে নেমে আসতে চাইছে। কী যে ওদের ক্ষুধা কে জানে!

পারুলী গনেশের গা-ঘেঁষে দাঁড়ায়। মৃদু হেসে বলে,

মান-অভিমান চলছে নাকি গা? নইলে বৌকে ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে কেউ? উ মেয়েটার ওমনি স্বভাব। একটু ঘুমকাতুরে, ওকে একটু সহ্য-সামুই করে নিতে হবে তোমাকে।

পারুলীর কথাগুলি কত অন্তরঙ্গ দরদ-মাখানো। গনেশ ভাবে পারুলীর মুখ জোড়া গাম্ভীর্য হঠাৎ কেনই বা হল। পারুলী গনেশের পিঠে হাত রেখে আরও ঘন হয়ে আসে।

যাও, শুয়ে পড়গে, যাও।

গনেশ এতক্ষণে প্রতিবাদ করে বলে, নাগো দিদি রাগ করে আসিনি, এমনি।

তাহলে দাঁড়িয়ে কেন? উ সব বুঝি গ বুঝি। যাও, যাও, আমি বরং ডেকে ওর ঘুমটা ভাঙায়ে দিচ্ছি। ভাত-ঘুমটা ভেঙে দিলে ওমনি জাগবে খন।

পারুলীর এ ধরনের কথায় গনেশ লজ্জা পায়। সম্পর্কে গুরুজন, তার ওপর মেয়ে, এমন একজনের কাছ থেকে এধরনের কথা শুনতে কার না লজ্জা হয়?

গনেশ বলে, যাচ্ছি যাচ্ছি, তুমি শুয়ে পড়গে দিদি, আমার পেটটা কামড়াচ্ছিল তাই…

কিন্তু গনেশের জীবনের ভালোমন্দকে নিয়ে ভাবাটা যেন আজ রাত্রে পারুলীর জীবনের কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

পারুলী বলে, আর উ-ঘরে-যদি শুতে একান্তই অনিচ্ছা থাকে তবে আমার ঘরে শুবে এস, এসনা লজ্জা কি!

গনেশ সত্যিই এতক্ষণ বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল মেঘলা

আকাশের দিকে। পারুলীর শেষ কথা আর কথার স্বরের মায়া তাকে এক নিমেষে হতবুদ্ধি করে তুলল। তার স্বচ্ছন্দ শরীরটা কাঠের মত কঠিন আড়ষ্ট হয়ে উঠল মুহূর্তে। পারুলীর মাংসল মিষ্টি শরীরের ছোঁয়া, নিটোল বুকের স্পর্শ, তার মনের মধ্যে তোলপাড় তুলল ভীষণ আতঙ্কের। এতক্ষণ ধরে তার পেটের মধ্যে যে সত্যিকারের কামড়ানোটা ছিল সেটা উধাও হয়ে গেল নিমেষে। গনেশ আড়ষ্ট গলায় উচ্চারণ করলে, নাগোদিদি, আমার পেটটা কামড়াচ্ছিল ভাত খাবার পর থেকে। সেই জন্য বাইরে বেরিয়েছিলাম। আমি একবার বাগান থেকে আসি। প্রায় ছিটকে গনেশ উঠোনে নেমে যায়।

পারুলীর গলায় কিন্তু কিছুমাত্র ভাবান্তর নেই। সে বলে, একটু পা টিপে টিপে যেও ভাই, ভারী শ্যাওলা হয়েছে।

গনেশ তার পরের দিন সকালেই শ্বশুর বাড়ি থেকে বিদায় নিল। দেখতে দেখতে বর্ষাকালের শেষ। ভাদ্র মাসের আকাশে আশ্বিনের নীল ছোপ লেগে গেছে। পেঁজা তুলোর মত মেঘের কুণ্ডলীগুলো পৌরাণিক যুগের বিরাটাকৃতি রথের মত তুরঙ্গ গতিতে ছুটে চলেছে কোন অলক্ষ্য উদ্দেশ্যের দিকে।

গজেনের বাগানে পুঁই শাকের সবুজ ডাটা শুকিয়ে এল। শুকনো শক্ত ডাটায় মেচাড়ি ধরে গেল। পুঁই এর জায়গায় পালঙের বীজ বুনলে গজেন। পালঙের সাথে সাথে শীতের অন্যান্য কয়েকটি ফসলও।

বাগানকে সে আবার নতুন করে সাজালে বটে কিন্তু হিসেব করে দেখলে এদিক-ওদিক করে তার বাকি বকেয়াও জমেছে বিস্তর। দু-বেলা দু-সন্ধ্যে পথ চলতে মুখোমুখি দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে এমন চেনা-জানা লোকের সংখ্যাই বেশি। দু'পয়সা বাকির জন্যে দিনে দশবার করে তাগাদা দেবার মতো ঝানু ব্যবসায়ী এখনও হয়ে উঠতে পারেনি সে। তার চক্ষু লজ্জায় বাধে।

পারুলীদের একটা গাই প্রসব হবার পর দুধ দিচ্ছে। বামুন পাড়ায় দু-তিনটি বাড়িতে সে সকাল-সন্ধ্যে উঠনো-দুধ দিতে যায় গজেনের বাড়ির বাগানের পাশ দিয়ে।

গজেন বাগানে থাকলে দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলে। আবার কোনো কোনো দিন বাড়িতে এসেও উর্বশীর সঙ্গে আধঘণ্টা বসে থেকে গল্প করে যায়।

উর্বশী গর্ভবতী। তার জিভের স্বাদ নাই। বাসি, পচা, টক, ঝাল, নোনতা জাতীয় বিস্বাদ জিনিসের প্রতিই তার নজর বেশী। মাঝে মাঝে সে লুকিয়ে পারুলীকে দু'চারটে পয়সা দেয় বাজার থেকে তেলেভাজা কিনে আনার জন্যে। লঙ্কা চটকে বাসী টকচা পান্তাভাতের সঙ্গে খেতে অমৃতের স্বাদ পায় সে।

গজেন রোজই ভাবে পারুলীকে বাকি-পয়সার তাগাদা দেবে। কিন্তু পারুলীর মুখের দিকে তাকালে তার গলার রুক্ষ স্বরটা নরম হয়ে আসে। যে ভাষায়

মানুষের সুখ-দুঃখের ভালো-মন্দের খবর নেওয়া যায়, সে ভাষায় পাওনাদারের ঝাঁঝালো তাগাদা যথার্থ ফোটে নাকি ? তা সত্ত্বেও গজেন একদিন পথের মাঝে পারুলীকে ধরলে। হ্যাঁগা, আজ দে যাবো, কাল দে যাবো বলে বাকীতে আনাজ নিলে, বাকী পয়সা গুলো কবে দিচ্ছ বল দিকিনি ?

গজেন ভেবেছিল পারুলী বোধহয় ঝাঁঝিয়ে উঠে তাকেই দু-চারটে কড়া কথা শুনিয়ে দেবে, সেজন্যে সে নিজের জিভের শান দিচ্ছিল, কিন্তু পারুলীর মুখ ভঙ্গির দ্রুত পরিবর্তন এবং মুখে বিষণ্ণতার ছায়া ফুটে উঠতে দেখে গজেন অবাক।

আর বলো কেন, দু-বাবুর বাড়ি দুধ নিচ্ছে পোয়াতী খালাস হবার পর। দেড় মাস দু'মাস হয়ে গেল। ই-মাসে নয় উ-মাসে দুবো, উ-মাসে নয় সে মাসে দুবো এই তো চলছে। যে ছেলের পেটে দুধ জোগানোর পয়সা নেই, তেমন ছেলে বিয়োনো কেন বাবু ! আমারই হয়েছে যত জ্বালা। তুমি আর দু-পাঁচ দিন অপিক্ষে করো, এক বাবু তো বলেছেন পুজোর আগে একসঙ্গে দু-মাসের দাম মিটি দিবে।

গজেনের মনটা নরম হয়ে যায় নিমেষে। সত্যিই পারুলীর ওপরই ওদের সংসারের সব ঝামেলা। শ্বশুর বাড়ির সংসার সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে বাপের বাড়িতে এসে ধান ভানছে, চাল কুটছে, গতরে খাটছে দিনরাত, এত খেটেখুটেও মনের সুখ আছে কিনা সন্দেহ। অমন টাটকা শরীরটা সমাদরের অভাবে অকালে নটে গাছের মত শুকিয়ে যাবে ক-দিন পরে। মেয়ে মানুষের স্বামী গেল, শরীর গেল তো রইল কি ?

গজেন বলে, আজকাল আর এসনি কেন আনাজ পাতি নিতে ? তুমি কি আর বাকি দাম দিবেনি ? তবে অনেকদিনের বাকি কিনা, তাই কথাটা মনে করিয়ে দিলুম একবার।

পারুলী বলে, তুমিও তো আর মোদের বাড়ির পানেই যাওনা। কবে একবার রাগের মাথায় কি বলেছিনু সেই রাগ এখনো মনেপুষে রেখেছ বুঝি। পুরুষ মানুষের অত রাগ ভালো নয় গো, বুঝলে বাবু।

না গ না, যাইনি সেজন্যে নয়। যাওয়া হয়ে ওঠেনি পাঁচ কাজের ঝামেলায়। তুমি বরং এসনা একদিন। নতুন মুলো হয়েছে। নিয়ে যেও।

তোমার বৌ-এর আবার খুব পুরনো তেঁতুলের টক খাবার সখ হয়েছে। একদিন যাবখন।

পারুলীর ঠোঁটের হাসিটুকু নিয়ে গজেন বাড়ি ফেরে।

উর্বশীর ধুলো কাদা রংয়ের শরীরটায় দিনকে দিন নাতা-ঝাঁটা দেওয়া উঠোনের মত ঝকঝকে মাজা-ঘষা রং ফুটে বেরুচ্ছে। চার ছেলের মা। কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই। মনে হয় যেন এই প্রথম পোয়াতী। শরীরটায় কম বয়সের গড়ন-

বাঁধন এখনও এত অটুট।

সে তুলনায় পারুলীকে কত বুড়িয়ে যাওয়া মনে হয়। শরীরের সবই আছে। কানা-ভরা পুকুরের মতো যৌবন উথাল-পাথাল। কিন্তু উপরটা যেন পানার আবর্জনায় মলিন। ঢেউ এর অভাবেই যেন পানার স্তর ক্রমশঃ জমাট হয়ে উঠছে।

গজেনের মনে পারুলীর জন্য খানিকটা ব্যথা--বোধ জেগে থাকে। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর পারুলীর বাড়িতে যায় সে। পারুলী যথেষ্ট খাতির করে। পারুলী কথাবার্তা বলে কম। তার মা ও মনসার সঙ্গেও দু-একটা ঠাট্টা-রসিকতা হয়। কথা প্রসঙ্গে ছোট-জামাই গনেশের প্রশংসা করে পারুলীর মা। গজেনও সমর্থন করে সেটা। কোনো এক ফাঁকে পারুলী স্থান ত্যাগ করে উঠে গেলে তার মা চুপিচুপি গজেনকে প্রশ্ন করে, হ্যাঁ গজেন, তোর সঙ্গে কি মানিকের আর দেখা সাক্ষাৎ হয়?

না। বনমালীর দোকানে চুল ছাঁটতে এলে খবর পাই। আমার সঙ্গে দেখা হয় নি।

পারুলী ফিরে এলেই মানিকের কথাটা চাপা পড়ে। গজেন বোঝে মায়ের প্রাণ স্বামী-সুখ-বঞ্চিত মেয়ের দুঃখে মনে প্রাণে শান্তিহারা। গজেন আরও অবাক হয়ে ভাবে পারুলী কি কঠিন প্রাণের মানুষ। তার দেহের জৌলুষের ওপরই যে শুধু মলিন আস্তরণ পড়েছে তাই নয়, তার মনের চেহারাও ঘন আস্তরণে ঢাকা। সেখানকার গভীর অতলে যে হাসিকান্না ব্যথা-বেদনা তাপ-সন্তাপ, তা কারুরই দৃষ্টি গোচর হবার উপাই নেই।

আশ্বিনের পুজার পর গনেশ এসে মনসাকে নিয়ে চলে গেল।

পারুলী গজেনের কাছ থেকে আনাজ-তরকারী কিনে একটা বড় মাপের পুঁটলী বানিয়ে দিলে।

শীতের ফসল বেচে গজেনের লাভের পরিমাণটা মন্দ হয় নি। উর্বশীকে সে বেশ দাম দিয়েই একটা চওড়া লাল পাড় শাড়ী, ছেলে-মেয়েদের জন্যে মোটা চাদর কিনে দিয়েছে, নিজের জন্য একটা জুতো কিনেছে পাঁচ টাকা দিয়ে।

মাঠের পাকা ধানের গন্ধ বাতাসে ভরপুর। সকাল-দুপুরের সোনালী রোদ মাঠের শুকনো খড়ের গলা জড়িয়ে দুরন্ত শিশুর মত খেলা করে। ধান এবছর ভালো ফলেনি, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে বৃষ্টির অভাবে। খড়গুলোই ঢ্যাঙা হয়েছে।

গজেন ঠিক করে রাখে নতুন খড়ে এ-বছর ঘরের চাল ছাইবে। মাঘ-ফাল্গুনে একটা গাই-গোরু কেনারও ইচ্ছে আছে তার। সেজন্যে আরও কিছু টাকা জমানো দরকার।

গজেনের ইচ্ছে আছে এবার ধান মাড়া, খড়ের গাদা দেওয়ার কাজ চুকে গেলে রাসপুরের মেলায় দোকান দেবে। রাসপুরের মুলো-কালীর মেলা এক পক্ষ ধরে চলে। দশ-পনেরো মাইল দূর থেকেও লোকজন সেখানে আসে। পৌষের

অমাবস্যা থেকে শুরু হয় মেলা। নানা উৎসব অনুষ্ঠান, পুতুলনাচ, ম্যাজিক, নাগরদোলা আর কত কিছুতে মেলার পনেরোটা দিন জম-জমাট হয়ে থাকে। উর্বশী ছাড়া গজেন আর কাউকেই মেলায় যাওয়ার কথা বলেনি। পারুলী বোধহয় উর্বশীর কাছে থেকেই শুনেছিল। একদিন মুখোমুখি দেখা হতেই পারুলী বললে, আমাকে নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে? বিয়ের পর আর কখনো যাইনি রাসপুরের মুলো-কালীর মেলায়। শুনে অবাক হয় গজেন।

তুমি মেয়েমানুষ কোথাকে যাবে গা? কি করে যাবে, কোথাই বা থাকবে, আর সেকি এখানে, যে যাওয়া আসাটা মুখের কথা।

পারুলী ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

ভগবান দুটো পা দিয়েছেন, পায়ে হেঁটে যাবো, পায়ে হেঁটে ফিরবো। তোমাকে কি পাল্কী করে বিয়ের কনে সাজিয়ে নিয়ে যেতে বলেছি? কি করে যাবো সে-ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে কেন? তুমি পাড়া-পড়শী যাচ্ছ বলেই বলা। নইলে আমি কি আর সঙ্গী জুটোতে পারব নি?

গজেনের ভাবনাগুলো অমূলক নয়। তবু পারুলীর সাহস দেখে সে রাজী হয়। পারুলী গজেনকে ঠাট্টা করে বলে, দেখতে শুনতেই পুরুষ মানুষ তুমি, মনটা মেয়েমানুষের চেয়েও ভয় কাতুরে।

যাবার দিন পারুলী তার মাকে বলে, জানো মা, ফিরতে যদি দেরি হয় ভেবোনি কিছু। কুন্তি মাসীর বাড়িতে থাকবো দু-একদিন। তুমি দু-বাবুর বাড়ি উঠনো-দুধটা সময় মতো দিয়ে এসো কিন্তু।

যাওয়ার দিন পারুলী একটা লাল পেড়ে কাচা শাড়ী পরে। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর দেয়। মাথায় খোপা বাঁধে। শীতের পত্র-বিরল মলিন গাছটি হঠাৎ যেন বসন্তের ফুলে নয়ন লোভন রূপ নিয়ে জেগে ওঠে।

গজেনের মাথায় থাকে বড় ঝোড়া ভাঁত মুলো। আর পারুলীর হাতে থাকে একটা পুঁটলী, তাতে পরার কাপড় আর যাওয়ার পথে খাওয়ার জন্যে মুড়ি নারকেল। গজেনের বড় ছেলেটাও সঙ্গে আসার জন্যে বায়না ধরে ছিল। তাকে সে অনেক প্রলোভন দেখিয়ে ঠাণ্ডা করেছে। গজেনের বাগানে মুলো বাদে সিম, পালঙ, লাউ ফলেছে বেশ। সে ছেলেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করিয়েছে যাতে ঐ আনাজ গুলো নিয়ে সে বাজারে গিয়ে বসে।

গজেনের ছেলে নিতাই প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র। অনেক দিন থেকে তার একটা সাড়ে ছ-আনা দামের ফাউণ্টেন পেনের সখ। বাপ সেটা কিনে দেওয়ার শপথ করায় সে বাজারে যেতে রাজী হয়েছে।

গজেনের গ্রাম থেকে রাসপুরের মেলা প্রায় ছ'-মাইল পথ। সেটা সড়ক ধরে গেলে। কিন্তু আজকাল মাঠে-ধান কাটা হয়ে গেছে। মাঠের পথ ধরে গেলে দু-মাইলের মতো কম হয় রাস্তার মাপ। গজেন ও পারুলী মাঠ ঝাঁপিয়েই চলে

পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্যে।

দুজনে বেরিয়েছিল, চান-খাওয়া করে দশটায়। মেলায় পেঁছিল দুপুরে। গজেন একা হলে আরও তাড়াতাড়ি পেঁছিত। সঙ্গে মেয়েমানুষ থাকায় তার সঙ্গে সমান তালে হাঁটতে হয়েছে। তাতে অসুবিধে হয় নি কিছু, পরিশ্রমটা অনেক লঘু হয়েছে বরং।

বিরাট একটা ফাঁকা মাঠ জুড়ে মেলা বসে। যারা প্রতি বছর এখানে দোকান দেয় তারা বাঁশ বাখারী আর ছই দিয়ে চালা বেঁধেছে। যারা গজেনের মত উটকো দোকানী, তারা এমনিই বসে, মাথায় কোন আচ্ছাদন না টাঙিয়ে।

নাগরদোলা এখনো ঘুরতে শুরু করেনি। ঠিকঠাক হচ্ছে। পুতুল নাচের ঘর তৈরি। দুটো বড় সিন ঝুলছে। গজেন দূর থেকে তাকিয়েই বুঝলে একটা সিন হচ্ছে পঞ্চবটী বনে সীতা আঙুল বাড়িয়ে রামচন্দ্রকে সোনার হরিণ দেখাচ্ছেন। আর একটা সিনে কৌরব-সভায় দুঃশাসন একদিকে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করছেন অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বস্ত্র জোগাচ্ছেন। ম্যাজিকের দলে একটা মেয়ে আছে শুনে বহুলোক ম্যাজিকের এলাকায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। এদিক-ওদিকের অনেকগুলো তেলেভাজার দোকান থেকে পচা বাদাম তেলের গন্ধ বাতাসকে ঘুলিয়ে তুলেছে। বেলুন উড়ছে নানারংয়ের। একজন বাঁশিওয়ালা বাঁশিতে সিনেমার গানের সুর বাজিয়ে চলেছে। বাঁশি বিক্রির চেয়ে বাঁশি-শুনিয়ে লোকের মন হরণেই যেন তার আনন্দ বেশি। ছিট কাপড়ের দোকান বসেছে অসংখ্য তারাই মেলার অর্ধেক রূপ খোলতাই করে তুলেছে। একটা ছাড়া গরু এসে গজেনের মুলোর ঝোড়াটা শুঁকে গেল ঝোড়াটা আগাগোড়া দড়ি-জালে মোড়া ছিল বলেই ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন করে বিমুখ হতে হল তাকে।

পারুলীকে ঝোড়ার কাছে বসিয়ে রেখে গজেন ইতিমধ্যে—দু-এক চক্কর ঘুরে আসে। দু-একজন চেনা লোককে খুঁজে তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা-বার্তা বলে ফিরে এলে পারুলী বলে, এবার চাট্টি খেয়ে নাও, আমার পুঁটলীতে মুড়ি বাঁধা আছে।

তোমার খিদে পেয়েছে নাকি?

আমার পায়নি। তোমার পেয়েছে বলেই বলতেছি।

আমার পায়নি। তুমি খাবে তো খাও। দাঁড়াও চারটি মিষ্টি কিনে আনি।

মিষ্টি কি হবে মিছেমিছি? আমার কাছে নারকেল আছে।

তা থাক্ গরম জিলেপী ভাজতেছে। কিনে আনি। আর কিছু খাবে নাকি?

পারুলী গজেনের আত্মীয় কুটুম্ব কেউ নয়। পাড়া-পড়শী সম্পর্ক। তাকে এত খাতির না করলেও চলে। তবু যেহেতু গজেনের সঙ্গে সে মেলায় এসেছে তার সুখ-স্বাচ্ছন্দের দায় যেন আপনা থেকেই চেপেছে গজেনের কাঁধে। গ্রহণ করুক বা না করুক মেয়েদের জন্যে এমনি অযাচিত অনুগ্রহ প্রকাশ করার মধ্যে

পুরুষরা চিরকাল নিজেদেরই গুরুত্ব বা গৌরব অর্জন করে এসেছে। অধিকার বোধটা পুরুষ শ্রেণীর একচেটে। সেটা শাসন করার ক্ষেত্রে শোষণ করার ক্ষেত্রেও যতটা সত্য, স্নেহ ভালবাসা দয়া-দাক্ষিণ্যের ক্ষেত্রেও তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

বিকেলের রোদ শেষ হতে না হতেই পুতুল নাচের ছই ঘেরা ঘরে বাজনা বেজে উঠল। ঢোল সানাই আর খ্যানখ্যানে কাঁসি। নাগর-দোলা বাঁই বাঁই করে ঘুরতে থাকল আকাশে। ম্যাজিকের ঘরে আলো জ্বলল, বিলীতি বাজনার বাজখাঁই আওয়াজে মাঠের ফাটা মাটি উঠল কেঁপে। সার্কাসের গেটের সামনে বাঁশের উঁচু মঞ্চে শুরু হল কিম্ভূতকিমাকার ক্লাউনের নাচ। ছাউনি বাঁধা দোকানগুলোর হ্যাজাকবাতি সূর্যাস্তের অন্ধকারকে ভাগিয়ে দিলে। গজেনের এতক্ষণে খেয়াল হল সে আলোর কোন বন্দোবস্ত করেনি। কিন্তু ভেবে দেখলে আলোর বিশেষ প্রয়োজন নেই। তার চারপাশের আলোর সমারোহ সমস্ত মাঠটা জুড়েই প্রতিফলিত। তাছাড়া রাত্রে আনাজ-পাতি বেচাকেনা প্রায় হয় না। যা হবার হয় দিনমানে।

পারুলী তার কাপড়ের পুঁটলিটা হাতে নিয়ে বললে, আমি তাহলে যাই গা।

পারুলী খানিকটা এগিয়ে গেলে গজেন তাকে ডাকে। একটু ইতস্ততঃ করে বলে, একটা কাজ করতে পার যদি তো ভালো হয়।

কি বলো না।

গজেন তার কোমরে-জড়ানো টাকার গেঁজেলটা বার করে বলে, তুমিতো মাসীর বাড়ি যাচ্ছ। তাহলে এইটা তুমি নিয়ে যাও। নিজের কাছে কাছে রাখবে। এর মধ্যে সাড়ে পনেরোটা টাকা আছে। গুনে দেখে নেবে?

না থাক।

কালকে কখন আসবে বলো দিক্‌নি।

কাল দুপুর গড়াতে আসবো। টাকা নিয়ে আসতে হবে?

না, কাল আনতে হবেনি। কাল এলে বলে দেবো কবে চাই। এই মালগুলো বেচা শেষ হলে তবে টাকাটা লাগবে। কাছেই আমদানী-রপ্তানীর বড় বাজার আছে নদীর ধারে। সেখান থিকে পাইকারী দরে মাল কিনবো।

পারুলীর মন্থর গতিতে চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে গজেন অনেকবার ভাবলে আত্মীয়-কুটুম্ব নয় এমন একজন মেয়ে মানুষের কাছে কি এতগুলো টাকা ছেড়ে দেওয়া উচিত হল তার।

মেয়ে মানুষের স্বভাব তো—কার কাছে রাখবে, কার কাছে কি বলবে, কে বলতে কে দু-পাঁচ টাকা সরিয়ে নিলে তখন কীই বা করবে সে। কাল পারুলীকে টাকাটা সঙ্গে আনতে বললেই হত। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তার মনটা টাকার চিন্তায় উন্মুখ হয়ে রইলো।

রাত্রে খাওয়া-শোওয়ার ব্যবস্থাটা মন্দ হল না। গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে খড়

বিক্রি হতে এসেছিল মেলায়। এক আঁটি দু-আঁটি সেখান থেকেই চেয়ে-মেগে চমৎকার খড়ের বিছানা তৈরি হয়ে গেল।

গজেন আর তার চেনা-জানা আনাজ ব্যাপারী সকলে এক সঙ্গেই পাশাপাশি শোয়ার আয়োজন করলে। দু-একজনের কাছে ছই ছিল। ঠাণ্ডার ভয়ে সেটা টাঙিয়ে একটা লম্বা তাঁবুর মত তৈরি হয়ে গেল। খাওয়াও হল সবাই মিলে এক সঙ্গে।

পরের দিন দুপুরের ভেতর গজেনের মাল বিক্রি হয়ে গেল অর্ধেক। অন্যদের চেয়ে দু-পয়সা সস্তা দরে মাল ছাড়তেই খদ্দের বেশি পেল সে। দুপুর গড়াতেই পারুলী এসে হাজির। একা নয়, সঙ্গে আরো দু-চারজন মেয়েমানুষ। হয়তো মাসীর বাড়ির লোক কিংবা মাসীর গ্রামের পাড়া-পড়শী।

পারুলী এসেই বললে—সাঁতের পো আমরা আজকে পুতুল-নাচ দেখবো। কি পালা হবে বলো দিকিন আজ।

কি জানি, জানিনি তো ঠিক।

এখন চলি, আমরা অনেক কেনা-কাটা করবো ঘুরে ঘুরে। ই-মেলায় নাকি লোহা-লক্কড়ের জিনিস খুব সস্তা। তুমি এইখেনে থাকবে তো ?

হ্যাঁ, থাকবো।

তাহলে যাবার পথে দেখা করে যাব খন। টাকার দরকার থাকলে তখন বোলো।

গজেন টাকার কথাটা তখুনি বলতে চাইলে, কিন্তু কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকল। তার চোখে-মুখের ভঙ্গি দেখে পারুলী ব্যাপারটা বুঝে নিজেই বললে—তোমার টাকার জন্যে ভেবোনি। সে আমি মাসীর কাছে তালা-চাবি এঁটে রেখেছি।

পারুলীকে আজ বেশ প্রাণবন্ত মনে হল গজেনের। একদিনে তার বয়সটা অনেকখানি কমে গিয়ে গাছের বদলে পল্লবিনীলতা করে তুলেছে তাকে। বিনা পয়সার পুতুল-নাচ দেখার আনন্দেই কত খুশি-খুশি মেজাজ। অথচ গজেন যদি ইচ্ছে করে তাহলে তিন আনা দামের টিকিট কাটিয়ে তাকে কি একদিন ম্যাজিক দেখিয়ে দিতে পারে না ?

খুব পারে। হ্যাঁ, ব্যবসায় ভালো লাভ হলে নিশ্চয় একদিন ম্যাজিক সে দেখিয়ে দেবে পারুলীকে। পারুলীও খুশি হবে খুব। আহ! বেচারার স্বামী থেকেও নেই। সোহাগ করার লোকের অভাবে মনের কত আশা-আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যেই অযত্নের চারার মত জন্মেই শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, ওর স্বামী সঙ্গে থাকলে কি আর গজেনকে ওর জন্যে এত ভাবতে হত।

দু-তিন দিনে গজেনের লাভ হল মন্দ নয়। পারুলীর কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে সে পাইকারি দরে কাছের বাজার থেকে আরও অনেক রকমের আনাজ তরকারী কিনে বড় রকমের দোকান করে তুলেছে। গজেনের মনটা খুব প্রফুল্ল।

পারুলী বিকেলে আসতেই গজেন বললে—আজ যেন চলে যেওনি তাড়াতাড়ি।

কেন বলো তো ?

আমি ম্যাজিক দেখবো। তোমাকেও দেখাবো ভাবতেছি।
পারুলী সাদা দাঁতে রঙিন হাসে। গজেনের মনটা আরো রঙিন হয়। কেন, তুমি আবার পয়সা খরচা করবে কেন মিছেমিছি।
তা হোক না। দুজনে একসাথে এলুম। আমি একা একা দেখবো ভাবতে কেমন লাগেনি ?
আমার বাবু ভয় করে উ ম্যাজিক দেখতে।
কেন বলো দেখি ?
কি সব মেয়ে-মানুষকে কেটে দেখায় বলে। উ-সব কাটাকাটি দেখতে পারবনি আমি !
গজেন তাকে বোঝায় ম্যাজিকের কাটা সত্যিকারের কাটা নয়, কৌশলে সত্যিকারের মত দেখায়, ওতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।
ম্যাজিকে মেয়ে পুরুষের আলাদা-আলাদা জায়গা। মেয়েদের জায়গায় বসে পারুলী দেখে—ম্যাজিকের শেষ খেলা ঐ কাটাকাটির খেলা। পারুলীর ঐ সময়ে বুকের মধ্যেটা ঢিপঢিপ করে ওঠে। পুতুল-নাচে অভিমন্যু বধের দৃশ্যের চেয়ে এই করাত চালিয়ে মেয়েমানুষ কাটার দৃশ্যটা তাকে অনেক বেশি কষ্ট দেয়। বাইরে বেরিয়ে গজেনের সঙ্গে দেখা হবার পর গজেন লক্ষ্য করে পারুলীর চোখদুটো ভিজে ছপ ছপ করছে।
পারুলী বলে—ম্যাজিক তো দেখা হল—এখন একা একা বাড়ি ফিরি কি করে ?
চেনা-জানা সঙ্গী কেউ নেই ?
এই ভিড়ে কী করে কাকে খুঁজি বলো তো ?
এখনও রাত বেশি হয়নি। চলো আমিই না-হয় পৌঁছে দিয়ে আসি। তোমার মাসীর বাড়িটা চেনা হবে।
তাই চলো।
—ই দিকে এস।
উদিকে কেন আবার ! কি আছে উদিকে ?
এস না।
গজেন সটান পারুলীকে নিয়ে একটা মিষ্টির দোকানে ঢোকে। গজেনের এত খাতির-অভ্যর্থনা পারুলীর ভালো লাগে না একেবারে, তবু গজেন যদি কিছুতেই আপত্তি না শোনে তাহলে এই লোকজনের ভিড়ে কি চিৎকার করবে সে ?
আলো দিয়ে সাজানো দোকান। কাঁচের আলমারিতে থরে থরে নানা ধরনের খাবার সাজানো। দু-পাশে সারি সারি বেঞ্চ, মাঝখানে টেবিল, অনেক ভদ্র গোছের লোকও দোকানে বসে খাচ্ছে। এই রকম দোকানে বেঞ্চে বসে খাওয়া গজেনের বরাতে কখনো ঘটেনি। শুধু পারুলীকে খাওয়াবার জন্যেই নয় নিজে খেতে পেরেও কম আনন্দ নয় তার।

বেশি দামের জিনিস কেনার ক্ষমতা নেই। এক আনা দামের সিঙাড়া আর এক আনা দামের গজা কেনে অনেকগুলো। খুচরোর চেয়ে ওজন দরে নিলে সংখ্যায় বেশি হবে বলে একপো গজা কিনে নেয়। নিজের চেয়ে পারুলীকেই দেয় বেশি করে। তার ভাবখানা এই রকম যেন আমি পুরুষ মানুষ জীবনে এমন খাওয়ার সুযোগ কত পাব, তুমি তো পাবেনি। পারুলী সেগুলো গজেনের পাতে তুলে দেয়, গজেন আবার তুলে দেয় পারুলীর পাতে। ভদ্রলোক-খদ্দেরের চোখগুলো ওদের এই তোলাতুলির চাষাড়ে ভোজন ক্রিয়া দেখে কৌতুকে হাসে। ভদ্রলোকের জন্যেই পারুলী জোর গলায় কিছু বলতে পারে না। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলাটাকেই যত জোরে পারা যায় বলে। নতুন বৌয়েরা স্বামীর সঙ্গে যেভাবে লজ্জা-সরম বাঁচিয়ে মনের দ্বিধা প্রকাশ করে, পারুলীর চড়া স্বভাবের এই নরম-কোমল রূপান্তর গজেনকে ভারি উৎফুল্ল করে। দোকানের বাইরে এসে পারুলী তার সমস্ত রাগ প্রকাশ করে। গজেন পরিতৃপ্তির হাসি হাসে কেবল। একটু আগের লজ্জাবতী পারুলীর চেয়ে এই বদরাগী পারুলীকেও যেন তার আরো বেশি ভালো লাগছে। সারাটা পথ পারুলী কথা বলে না গজেনের সঙ্গে।

গজেন ভেবেছিল পারুলীকে তার মাসীর বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই সটান সে চলে আসবে। তা কিন্তু হল না। গজেনকে বাড়ির লোক আটকাল। আপত্তি সত্ত্বেও তাকে জোর করে খাওয়ালে। খাওয়াবার সময় পারুলী বললে, সবাই বলচে, রাতটাও এখানে থেকে যাও না। গজেন রাজী হল না কিছুতে।

দিন দুই পারুলীর আর দেখা নেই। গজেন ভাবলে সে বোধহয় বাড়ি চলে গেছে কিন্তু তৃতীয় দিন আবার তাকে একদল মেয়ের সঙ্গে মেলায় আসতে দেখে গজেন অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—তুমি যাওনি? ক-দিন আসনি, আমি ভাবলুম বুঝি চলে গেছ।

না যাইনি, যাবার ইচ্ছে ছিল। আমার এক মাসতুতো ভায়ের বৌ এল বাপের বাড়ী থেকে, সেইই জোর করে যেতে দিলো না। আজ আবার পুতুল-নাচ দেখতে টেনে নিয়ে এল।

গজেন মাথা চুলকে বলে—যদি রাগ না করো তো একটা কথা বলি।

কিসের কথা?

রাগ না করলেই বলি।

বলো না, রাগের কথা না হলে রাগ করবো কেন?

কাল একজনের সঙ্গে দেখা হল।

কার সঙ্গে?

মাণিক পধ্যানের সঙ্গে, আমার দোকানে এসেছিল, বিড়ি খাওয়ালাম, চা খাওয়ালাম, অনেকক্ষণ কথা হল। লোকটার সে চেহারা নেই। কেমন যেন হয়ে গেছে।

বাড়িতে নাকি খুব অসুখ-বিসুখ। শ্বশুর বাড়ির খোঁজ-খবর নিলে। ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলে। আমি তো বললুম ভালো আছে। তোমার কথাও জিজ্ঞেস করলে আঁচে-আন্দাজে। আমি একদম উল্টে-পাল্টে যা মনে এল বলে দিলুম। বললুম যে তার শরীরও হাড়-মাস-সার। দিনরাত খাটছে। আগে মনসা ছিল। সে চলে গেছে শ্বশুর বাড়ি। তারপর তোমার মায়ের কথা বলে দিলুম যে, তিনি বাতের রোগে শয্যাশায়ী। ভাগ্যিস তুমি কালকে আসনি।

কেন ? কাল এলে কি হত, আমাকে ছেলে ধরার মত ধরে নিয়ে যেত নাকি ?

না, তা নয়, আমি যে আরেকটা কথা একদম চেপে গেছি। তুমি দু-দিন আসনি আমি ভাবলুম বুঝি বাড়িতেই চলে গেছ। তাই তুমি যে এখানে মেলায় এসে মাসীর বাড়িতে আছ সেকথা একদম জানাইনি কিনা।

পারুলী গম্ভীর মুখে সবটা শোনে। গজেনের কথা শেষ হলে এমন একটা মুখ-ভঙ্গি করে ঠোটের পাতা ওল্টায় যেন এসব সংবাদে তার ঠোঁটের পাতা ছাড়া আর কিছুই ওল্টাবে না।

ওদিকে পুতুল নাচের বাজনা শুরু হয়ে গেছে। আজ হবে সীতার বনবাস পালা। পারুলী বলে, ওরা সব দাঁড়িয়ে আছে। আমি চলি।

সীতার বনবাস দেখে পারুলীর চোখে অনেকক্ষণ কান্নার জল জেগে রইল। সকলের চেয়ে তার রাগ হল রামের ওপর। তুমি এমন একটা রাজা, কত তোমার জ্ঞান বুদ্ধি, মনে তোমার কত দয়া মায়া, তুমি কিনা সীতার মত সতী-লক্ষী নারীকে শেষ পর্যন্ত বনে পাঠালে। যে প্রজাগুলো সীতার নামে কলঙ্ক রটাল তাদের মুখে নুড়ো জ্বালিয়ে মুখপোড়া হনুমান বানিয়ে দিতে পারলে না। তাহলে বুঝতুম একটা মন্দের মত মন্দ বটে। কৈকেয়ীর চেয়েও রামের ওপর তার বিক্ষোভ বেশি। কুঁজীবুড়ি, কৈকেয়ীদের তো ঐরকমই কাজ। যত রাজ্যের কুটিল মন্ত্রণা মাথায় ঘুরছে, কারুর কপালে সুখ দেখলেই তাদের বুক ঈর্ষায় ফেটে পড়ে। নিজের শাশুড়ীকে দেখেতো এ কথা বোঝা যায়। শাশুড়ীর চক্রান্তেই তো সে আজ দু-বছর হল স্বামীহারা, তার স্বামীও ঠিক ঐ রামের মত মানুষ। পাঁচজন বলল, তোর বৌটা পাজী, মুখরা, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর দুচ্ছা-হেনস্থা করে, তোর ভাই, ভাদ্র বৌদের চোখে দেখতে পারে না। সে মানুষটা অমনি বুঝলো নি। সত্যি মিথ্যার বিচার করলো নি, কোনটা কার চক্রান্ত ভাবলোনি, মারল চুলে মুঠি ধরে চড় চাপড়, তারপর গলাধাক্কা দিয়ে ঘরের বার করে দিলে। তা রামচন্দ্রের মত মানুষ যদি সীতাকে বনবাসে পাঠাতে পারে, আমার স্বামী তো রামচন্দ্রের 'র'-এর যুগ্যি নয় সেই বা তার বৌকে ঘর থেকে তাড়াবেনি কেন ?

আবার একদিন দুদিন তিনদিন গেল, পারুলীর দেখা নেই। গজেন নিশ্চিত হল পারুলী বাড়ি চলে গেছে ভেবে।

গজেন আরো ভাবলে মানিককে সে যে ভাবে বানিয়ে বলেছে তাতে আজ না হোক, কাল না হোক একদিন সে শ্বশুর বাড়িতে আসবেই।

দেখতে দেখতে মেলা শেষ হয়ে এল। গজেন যাবার দিন নিজের সংসারের জন্যে টুকিটাকি কেনা-কাটা করলে। মাছ কোটার বটি, চাল ধোয়ার ধুচুনি, কাঞ্চন নগরের ছুরি, প্রদীপ রাখার কাঠের দেরখো, বড় ছেলের জন্যে সাড়ে ছ-আনা দামের ফাউণ্টেন পেন, উর্বশীর জন্যে একটা রঙীন কাপড়ের সায়া-ব্লাউজ, নিজের জন্যে একটা কমদামের শাঁখের আংটি, আর আধসের গজা। এই সব ঝোড়ায় চাপিয়ে চাপিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলে।

মেলায় বেচা-কেনায় বেশ লাভ হয়েছে তার। মনটা স্বচ্ছন্দ খুশিতে পালকের মত হালকা। উর্বশী এই রঙীন সায়া ব্লাউজ পেয়ে কত খুশী হবে। পারুলী বাড়িতে ফিরে হয়ত একদিন উর্বশীর সঙ্গে দেখা করেছে। আমি যে তাকে নিজের পয়সায় ম্যাজিক দেখিয়েছি, দোকানে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছি সে-গল্পও করেছে নিশ্চয় উর্বশীর কাছে। উর্বশী মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েছে অন্য মেয়ের ওপর আমার এত আদর সোহাগ শুনে। কিন্তু যখন দেখবে উর্বশীর জন্যেও কত দামের জিনিস কিনে এনেছি, পারুলীকে যা খাইয়েছি তার জন্যেও সে খাবার কিনে এনেছি আধসের নিশ্চয় রাগ থাকলে তা জল হয়ে যাবে উর্বশীর।

কিন্তু পারুলী কি একা উর্বশীকেই বলেছে। নিশ্চয় তার মাকেও বলেছে। আরও দু-এক জনের কাছেও না বলে থাকতে পারেনি। যারা শুনেছে তারা মনে মনে ঈর্ষান্বিত হয়েছে আমার দু-পয়সা রোজগার করে অবস্থা স্বচ্ছল হওয়ার কথা ভেবে। পারুলী নিশ্চয় মনে মনে আমার ওপর খুব কৃতজ্ঞ হয়ে আছে। যাবার সময়ই হয়তো পুকুর পাড়ে দেখা হয়ে যাবে। খুব লজ্জা লজ্জা হাসবে। পারুলীর লজ্জা দেখা গেছে বটে সেদিন মিষ্টির দোকানে। ফিসফিস করে বলা তার কথা-গুলো যেন বসন্তের হাওয়ার মত স্পর্শ করছিল আমাকে। পারুলীর মাথায় সিঁদুর দেখে দোকানের ভদ্রলোকগুলো হয়তো ভেবেছিল স্বামী-স্ত্রী আমরা।

স্বামী-স্ত্রী? য্যাঃ, স্বামী-স্ত্রী কেন হতে যাব। না, ও সব কু-ভাবনা আমি ভাবি না। তবে পারুলী মেয়েটাকে বেশ ভালো লাগে আমার। বেশ আপন মনে হয়। জীবনে ঠিকমত স্বামী সহবাসের সুখ পেলোনি বলে দুঃখ হয়।

তবে দ্যাখ, গ্রামে তো এত লোক আছে, পারুলী নিজের অহংকারে কারুর সঙ্গে কথা বলে কি? অথচ আমার সঙ্গে তো বেশ ভাবসাব। কথায় কথায় খেঁচিয়ে ওঠে বটে, ওটা ওর স্বভাব। সোহাগের জনকেই মেয়েরা জ্বালা-কষ্ট দেয়।

চলতে চলতে গজেন নিজের গ্রামের বাজারে এসে পেঁছয়। বনমালী পরামানিকের দোকানে ঝোড়া নামিয়ে বলে, কিরে দাড়িটা কামি দিবি নাকি?

দাড়ি গোঁফ কামিয়ে দিতে দিতে বনমালী বলে—এই আসা হচ্ছে বুঝি।

হুঁ।

কি রকম হল ? বেশ ট্যাঁক মোটা মনে হচ্ছে।

গজেন সাবান মাখা মুখে লম্বা আয়নার দিকে তাকিয়ে হাসে।

মানিক পধ্যান তার শ্বশুর বাড়িতে এসেছিল জানো ?

কে ? মানিক মানে পারুলীর·····

হ্যাঁ গ, এই তো দু-দিন না ক-দিন আগে। এসে দেখে পারুলী নেই। সকালে এসে দুপুরে চলে গেল, সেই দিন বিকেলেই পারুলী এসে হাজির তার মাসীর বাড়ি থেকে। সে তোমার সঙ্গেই তো গেছল না ?

হুঁ তারপর·····

তারপর সকালে শুনি পারুলী তার ছেলেকে কোলে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে।

যাক বাবা, এত দিন পরে মেয়েটার বরাতে আবার স্বামীর ঘর জুটল।

আয়নার মধ্যে নিজের পরিচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে গজেন লক্ষ্য করলে তার মুখে কোথাও খুশির আভাষ নেই।

বাজার থেকে বাড়ি পর্যন্ত পথটুকু হাঁটতে গিয়ে শরীরটাকে বড্ড ভারী আর ক্লান্ত ঠেকল। আর মনের মধ্যে পারুলীর চলে যাওয়ার ঘটনাটা কেবলই ফিরে ফিরে এসে তাকে কি-রকম বিমর্ষ করে তুলল। অন্য ভাবনা চিন্তা দিয়েও সেটাকে সে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারল না।

অথচ-পারুলীর চলে যাওয়ায় আমার খুশি হওয়া উচিত। মিছি মিছি করে মানিককে সেদিন ঐ-সব কথা না বললে সে আসতো কি ? মানিকের কঠিন মনটাকে স্নেহে গলিয়ে দেওয়ার জন্যই তো আমি ঐ কাণ্ডটা করলাম। তাহলে আবার দুঃখ কেন ? উর্বশীর কথাই ভাববো বরং। উর্বশী গজা খেতে ভালবাসে। গজা পেয়ে খুবই খুশি হবে সে। আর গজার ওপর আবার যখন সায়া ব্লাউজ পাবে তখন ! উর্বশী আমার বৌ। তার পেটে আমার নতুন সন্তান। অথচ সেদিন গজার দোকানে ভদ্রলোকেরা নিশ্চয় ভুল করে ভেবেছিল পারুলী আর আমি স্বামী স্ত্রী। তা না হলে অমন ঘন হয়ে বসে খাবার তোলাতুলি করে কেউ। আবার সেই পারুলীর কথা ? হতভাগারে ! আচ্ছা, নিতায়ের জন্যে যে সাড়ে ছ-আনার পেনটা কিনেছিলুম সেটা পকেটে আছে তো। হ্যাঁ আছে। নিতায়ের ওপর বাগান ছেড়ে দিয়ে গেছলুম। সে আবার কি করল দেখো। পালঙ--টালঙ-গুলো বাজারে গিয়ে কি রকম বিক্রি করল কে জানে। পারুলী কি যাওয়ার দিন তার বাগান থেকে শাক-টাক নিয়ে গেলো নাকি ?

গজেন বাড়িতে পা দিয়েই চিৎকার করে উর্বশীকে ডাকে। উর্বশী-রান্না চাপিয়েছে উনুনে। সঙ্গে সঙ্গে উঠলে তরিকারীটা পুড়ে যাবে বলে সে উঠতে পারে না। রান্নাঘর থেকেই বলে—দাড়াওনা গ একটু, আসছি।

না। গজেনের আর সময় সয়না। এখুনি তাকে তার মনের মত জিনিসগুলো দেখাতে হবে। নয়ত স্বস্তি নেই। সে আবার চেঁচায়।

কই, এখনো হলনি ?

আরে জ্বালা! তরকারীটায় জল ঢেলে তবে না যাব। এই তো এলে। একটু জিরোবে তো আগে।

ছেলেগুলো গজেনের চারপাশে ঘুর্‌ঘুর্‌ করছিল কিছু খাবারের লোভে। ছোট ছেলেটা গজেনের ঘাড়ের ওপর চেপে বসার চেষ্টায় পিঠ থেকে গড়িয়ে মাটিতে আছাড় খাচ্ছিল বারবার। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছিল মুলো পালঙের গন্ধ। আর সেই সঙ্গে একটা নাকী কান্নার শব্দ। গজেনের মেয়েটা ভীষণ পেট-রোগা বলেই পেটের জ্বালাটা তার সর্বক্ষণের। যতক্ষণ উর্বশী রাঁধে সে রাঁধা তরকারীর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদে। কোন সময়ই তার পেটের খিদে আর নাকের কান্নার বিরাম নেই। ইতিমধ্যে সাহস পেয়ে মেজ ছেলেটা গজেনের ঝোড়া হাতড়াতে শুরু করে দিয়েছিল। গজেনের কি হল কে জানে—ছেলেটার পিঠে ঠাস্‌ করে একটা চড় সাঁটিয়ে সে দাবড়ি দিয়ে ওঠে। ঝোড়াটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরের মুখে সেটাকে আছড়ে রেখে উর্বশীর দিকে তাকিয়ে খেঁচিয়ে ওঠে গজেন। তখন থেকে ডাকতেছি, এখনো উঠবার সময় হলনি নাকি ?

উর্বশী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় গজেনের মুখে। মানুষটার হঠাৎ এমন মার-মুখো দশার কারণ কি বুঝে উঠতে পারে না।

উ মেয়েটা ওখানে ঘ্যান ঘ্যান করতেছে কেনে ?

কেন আবার! ওর যা চিরকেলে ব্যামো।

এই, উঠে আয় দিখি ওখান থেকে। মেরে ফেলব একেবারে, উঠে আয় বলছি। মেয়ে তবু কান্না থামায় না। গজেন রান্নাঘরে ঢুকে মেয়েটার একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে ওপর তুলে ফেলে।

দিনরাত তোমার পেটের জ্বালা। ভারী তোর খিদে, না। নে খা সব। খা দিকিন ইগুলো। রান্নাঘরের আনাজের চুপড়ি থেকে এক গোছা পালঙ শাক সে মেয়েটার মুখে গুঁজে দেয়। কাঁচা পালঙ-এর আবার স্বাদ কি! মেয়েটা আচমকা দারুণ ভয়ে মরার মত চুপ করে যায়। গজেন দপ দপ করে পা ফেলে বাগানের দিকে চলে যায়।

সবুজ পাতা, গোলাপী ডাঁটার পালঙ শাকগুলো দুলছে। শুকনো কটা পুঁই-এর গাছে বেগুনী রংয়ের অজস্র মেচড়ি ফুটে আছে। শিমের ফুলগুলো কী চমৎকার দেখতে। কিন্তু এসব খাদ্যবস্তু ছাড়াও জীবনে আরো যেন কিছুর প্রয়োজন। যার অভাবে গজেনের মনে কোথাও কোন সুখের স্বাদ নেই। বাগানে ঢোকার সময় সে বাঁশের আগলটার গায়ে ধড়াস করে একটা লাথি মারে।
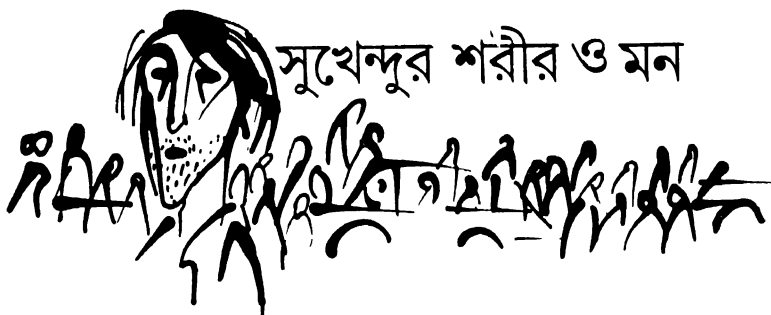
ডালহৌসি স্কোয়ারের কেরানী-পোষা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড
আপিসগুলোয় সুখেন্দু বই বিক্রি করে। জীবিকার্জনের
এই পথটা প্রায় তার নিজেরই আবিষ্কার।
সুখেন্দু নিজে বই পড়তে ভালবাসে খুবই। পড়ার
নেশায় পড়া নয়, জ্ঞানের নেশায় পড়া। কিন্তু
কিনে পড়ার আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে হয় লাইব্রেরি নয়
বন্ধুবান্ধবের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে থাকার
শ্লাঘাবোধ তার পাঠাভ্যাসকে কিছুকালের জন্য দমিত
করে রেখেছিল। চাকরির চেষ্টায় শরীরটাকে
আধখানা করেও যখন কোনো ক্ষীণতম আশার
ইশারা মিলল না, সেই সময়েই স্বাধীন জীবিকার্জনের
সিদ্ধান্তটা মাথায় আসে তার। এবং কাজটা যে বই
বিক্রিই হবে, সেটা স্থির করতে এক মুহূর্ত সময়েরও
অপব্যয় ঘটায় না সে।
যারা নিছক বই পড়ে তাদের কথা ভেবে নয়,
বই পড়াটা যাদের জীবনে প্রাণধারণের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ,
কিনে বই পড়তে চায় কিন্তু অর্থানুকূল্যে বঞ্চিত,
সুখেন্দু তার স্বাধীন জীবিকায় নেমেছিল তাদের কথা
ভেবেই।
পৃথিবীর কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে যে

সব দামী বই দামে নিতান্ত অল্প হয়ে এদেশে চালান আসে,—কাঁধের ব্যাগে সেগুলো বোঝাই করে প্রতিদিন আপিসপাড়ার একতলা দোতলায় ওঠা নামা করে সে। ক্রেতাও পেয়েছে প্রচুর। শুধু দামে সস্তা বলেই নয়, পৃথিবীতে যে সব দেশ সম্পদে সমৃদ্ধিতে মানুষের গড়া জীবন ও ঈশ্বরের তৈরী মৃত্যু এই দুয়ের মধ্যে অনেক দূরত্ব-সৃষ্টির গৌরব পেয়েছে, সে সব দেশকে জানবার গভীর কৌতূহল থেকেই ঐসব বই সম্পর্কে আগ্রহশীল একটা পাঠকশ্রেণী গড়ে উঠেছে। ফলে মাসান্তে বই বিক্রির কমিশন থেকে যে টাকাটা তার লাভ হয়, সেটা প্রায় সরকারী চাকুরের মাইনের মতোই।

প্রথম এক বছর খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে কাজ করেছে সে। এত উৎসাহে যে বড় বড় অট্টালিকার একহাত উঁচু সিঁড়ির ধাপগুলোকে এক সঙ্গে দুটো করে ডিঙিয়ে উপরে উঠেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বছরে পা দিয়েই সুখেন্দু অনুভব করল, বেশি সিঁড়ি ভাঙলে তার হৃৎপিণ্ড হাঁপায়। বেশি রোদে ঘুরলে তার গা-মুখ জ্বালা জ্বালা করে। বাড়িতে ফিরে স্নানের জলে স্নিগ্ধ হয়ে যখন অবসর যাপনের অবকাশ পায়, তখন তার শরীরের স্তরে স্তরে, কাঁধ আর পিঠের পেশীতে অবসাদ যেন পাথরের ভার হয়ে জমে। শারীরিক অক্ষমতা যার কাছে হার মানে, সেই আত্মশক্তির জোরেই সে নিজেকে খাড়া করে রাখে।

নীরদা উদ্বিগ্না হন। পুত্রের এই শরীরিক পতন তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। সুখেন্দুর উপার্জনই সংসারের সম্বল। সে যদি অসুস্থ হয়, সমস্ত সংসারটাই থাকবে উপবাসী। মাঝে মাঝে আকুলতাও প্রকাশিত হয় তাঁর। সুখেন্দুকে কাছে পেয়ে বলেন—

—হ্যাঁরে খোকা দিনকে দিন তোর চেহারাখানা হচ্ছে কি? তুই যে সারাদিন রোদে ঘুরে ঘুরে এত পরিশ্রম করিস্, কিছু কি খাস না নাকি?

—কে বলেছে খাই না? রোজই খাই।

—কি খাস?

—অনেক কিছু।

—কাপ কাপ চা তো? কেন চা ছাড়া কি আর কিছুই খাবার নেই তোদের?

সুখেন্দু হাসে। হাতের একটা অর্থনীতির বইয়ের পাতায় দৃষ্টি রেখেই তার হঠাৎ মনে হয় যে, মায়ের স্নেহ সমাজ ও অর্থনীতির তত্ত্বকথার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বের সম্পদ। কেননা এই স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর তো সেই মায়ের, সংসারে কেউ এক পয়সা অনর্থক নষ্ট করলে যিনি গলা ফাটিয়ে অনর্থ ঘটান।

নীরদা সুখেন্দুর জন্যে গরম রুটি ও বেগুন ভেজে আনেন। তার মুখের সামনে খাবারের পাত্রটা এগিয়ে দিয়ে বলেন

—খা তো পেট ভরে।

সুখেন্দু বলে, আমি খাবো না মা। এই তো চা খেলাম। ঝিণ্টু টুলু ওদেরকে

দাও।

—ওরা খেয়েছে। তুই খা-তো দেখি।

—মা, তুমি কি সত্যিই ভাবো যে সারাদিন আমি না খেয়ে ঘুরি? আমি যা খাই তোমরা তা খাও না। আপিসে আপিসে আমার অনেক বন্ধু আছে। সেখানকার ক্যান্টিনে সস্তাদামে অনেক ভালো খাবার পাওয়া যায়। কোনো কোনো দিন তারাও খাওয়ায়। আর আমি তো খাই-ই।

—খাস যদি তাহলে চেহরা এমন দড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে দিনদিন কেন বলতো? একবার না হয় ডাক্তার দেখা না।

—কিছু অসুখ হয়নি আমার। কি হবে মিথ্যে ডাক্তার দেখিয়ে। খুব গরম পড়েছে না এবছর। ১০৫-১০৬ ডিগ্রী এখন নর্ম্যাল টেম্পারেচার। শরীরটা শুকনো গরমের জন্যেই···

সুখেন্দু মাকে আশ্বস্ত করার ছলে নিজেকেই কি সান্ত্বনা জোগালো কিছুটা? যেন গ্রীষ্মের শেষে কোনো শীতল বর্ষা এসে তার জীবন-যন্ত্রণাকে সত্যিই ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়ে যাবে।

যাতায়াতের পথে পানের দোকানের লম্বা কাঁচের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করেছে সে বহুবার। কাঁচের মধ্যে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়েছে যেন কোনো দ্বিতীয় সত্তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সে। মুখাবয়বের এই পীড়াদায়ক আকৃতি, এ তার নয় কখনই। পরক্ষণে নিজেকে স্বস্তিবাক্য শুনিয়েছে সে—ও, দাড়ি কামানো হয়নি ক-দিন। দাড়ি কামিয়ে দেখেছে মুখটা পরিচ্ছন্ন। কিন্তু শীর্ণতা, রুগ্নতা! তার চোখের কোণে, চোয়ালের চার পাশে, মাংসহীন পাঁজরের কাঠামো আর গলার কণ্ঠকে ঘিরে যেন রচনা করেছে বহু শতাব্দীর প্রাচীন কোনো স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ। ক্রমে ক্রমে শরীর সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনতা একটা স্থায়ী ব্যাধির রূপ নিল তার চিন্তাপ্রবাহে। মাথায় কোনো রকমের একটা দুশ্চিন্তা এলে, মন কোনো কারণে উদ্বিগ্ন হলে, তার মনে হতে লাগল সে ক্রমশ রুগ্ন, জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ট্রাম ও বাসের ভিড়ের মধ্যে কাউকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলে সে ভাবে—তার এই মাংসহীন হাড়ের শরীরখানাই বোধহয় দর্শকের বক্রদৃষ্টিকে উপভোগ্য আমোদ জোগাচ্ছে। এইভাবে মানুষের সান্নিধ্য সম্পর্কে সন্দিগ্ধতা জাগল তার মনে। মানুষের খুশি, তৃপ্ত, পুষ্ট জীবনের সমারোহকে সে ঘৃণা করতে শিখল।

একদিন কোনো একটা সরকারী আপিসের সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠার সময় সুখেন্দুর পাশে এল একটি মেয়ে। নম্র কোমল গলায় সুখেন্দুকে বললে—আপনি আমার উপর খুব চটেছেন না?

বয়সের উত্তাপ এবং উজ্জ্বলতা-মাখানো সেই মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখটা নামিয়ে নিল সে। রঞ্জনা। সুনিপুণ সাজসজ্জায় সকলের থেকে পৃথক

এবং সবলের চেয়ে প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকার প্রবণতাটা যার খুবই উগ্র। মেয়েটির সম্পর্কে এই জাতীয় ধারণা খানিকটা চোখে দেখে, অধিকাংশটা লোকের মুখে শুনে শুনেই সুখেন্দুর মনে খাড়া হয়েছিলো। সুখেন্দু প্রশ্নের জবাবে বললে—
—কি করে বুঝলেন বলুন তো?
—বোঝা যায় বৈকি।
—আপনি এখানে প্রায়ই যাতায়াত করেন। আমাদের টিফিন রুমেও আপনাকে দেখেছি কতবার। আপনিও নিশ্চয়ই আমাকে দেখেছেন। অথচ আমার কাছে একটা বইয়ের দাম বাকি পড়ে আছে আপনার, একবারও তাগাদা দেননি।
—তাগাদা দিলে নিশ্চয়ই আপনি খুব খুশি হতেন না।
মেয়েটির গালে বুঝি অপমানের লাল রঙ্ ফুটে ওঠে সুখেন্দুর ব্যঙ্গোক্তি বা বক্রোক্তির ঘায়ে।
—আমাকে খুশি করার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ। অনুগ্রহ করে আপনি কি কাল আসবেন এখানে?
—কালকেই দামটা মিটিয়ে দেবেন?
—আগেই দিতে পারলে সবচেয়ে খুশি হতাম।
দ্রুত পায়ে রঞ্জনা দোতলার দিকে উঠে গেল। সুখেন্দু বুঝল, আহতা। কিন্তু সুখেন্দুর মনে সেজন্যে কোনো অনুতাপ অনুভূত হল না। যেন এক অবধারিত পরাজয়ের আত্মগ্লানির হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টায় সফলকাম হয়েছে সে। নিজের শরীরের কুরূপতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে ওঠার ফলেই সৌন্দর্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও সৌন্দর্যময়তার মুখোমুখি হলে তার মধ্যে বিদ্বেষপরায়ণতার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে বোঝা গেল।
রঞ্জনার কথাটা মনে ছিল সুখেন্দুর। কিন্তু সেটাকে কথার কথা মনে করেই খুব গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি সে। পরের দিনই টাকা মিটিয়ে দেবে বললেও কেউ কোনোদিন দেয় না। বলেছে বলেই গিয়ে হাত পেতে দাঁড়ানোটা আরো লজ্জাকর রকমের হ্যাংলামি, হীনতা। সুতরাং সুখেন্দু আপিসপাড়ার নিয়মিত এসেছে বটে, কিন্তু রঞ্জনার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেনি।
দুদিন পরে বাড়ি ফেরার সময় ট্রাম-স্টপেজের কাছে দেখা হয়ে গেল। অস্তগামী রোদের শেষ প্রখরতায় আকাশ তখনও উদ্ভাসিত। সেই প্রখর উজ্জ্বলতার পটভূমিকায় রঞ্জনা দাঁড়িয়েছিল মাটিতে লুটানো একটা গাছের ছায়ার নিচে। তার নাকের পাতায় ঘামের কয়েকটি বিন্দুর ওপর রোদের ঝলক।
সুখেন্দুকে দেখতে পেয়ে রঞ্জনাই এগিয়ে এল।
—আপনাকে আমি দু-দিন ধরে খুঁজছি।
যেন সুখেন্দুকে লজ্জিত করার অভিপ্রায়েই রঞ্জনা একেবারে তার মুখোমুখি এসে

দাঁড়িয়েছে। এত কাছে যে নাকের ডগায় ফুটে-ওঠা জলবিন্দুর মতো ঘামের দানাগুলো তার চোখে স্পষ্ট। সুখেন্দু নিজের দ্বিধান্বিত সংকোচকে আত্মস্থ করার আগেই বললে, কেন বলুন তো ?
—আপনার পাওনা টাকাটা মিটিয়ে দেব বলেছিলুম।
সুখেন্দু তার মলিন মুখে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করে।
—ও, আপনি সেদিন রাগ করে যে কথা বলেছিলেন !
—দেনাদারদের মহাজনের ওপর রাগ করা চলে না। আপনার টাকাটা কিন্তু আমি আজকেই মিটিয়ে দিতে চাই।
রঞ্জনা তার ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে এগিয়ে দিলে সুখেন্দুর দিকে। সুখেন্দু বললে—আমার কাছে চেঞ্জ নেই তো।
—চেঞ্জ নেই ? তাহলে .....
—ঠিক আছে কালই নোব না হয়।
—দেখুন এখন আপনার নেওয়ার চেয়ে আমার দেওয়ার তাড়াটা বেশি। কাল এই কটা টাকা আমার কাছে নাও থাকতে পারে। আর তা যদি হয় তাহলে আবার সেই নেক্সট মান্থের আগে টাকাটা মেটানো যাবে না। আপনি যদি কিছু মনে না কবেন, তাহলে ওপারে গিয়ে টাকাটা ভাঙিয়ে নিই। আমার সঙ্গে আসতে আপত্তি আছে আপনার ?
রঞ্জনার টাকা মেটানোব আগ্রহে সুখেন্দু লজ্জিত। রঞ্জনাকে অনুসরণ করে রাস্তাটা পার হয়ে এসে দাঁড়াল একটা পানের দোকানের সামনে। দশ টাকার নোটটা এগিয়ে দিল রঞ্জনা চেঞ্জের জন্যে। দোকানে তখন ছুটি-পাওয়া কেরানীদের ভিড়ের চাপ। ব্যস্ত দোকানদার টাকার দিকে না তাকিয়েই জানিয়ে দিল--চেঞ্জ নেই।
রঞ্জনা সুখেন্দুকে প্রশ্ন করলে—আপনি সিগারেট খান না ?
—মাঝে-মাঝে। নেশা নেই।
—এক প্যাকেট সিগারেট কিনলে হয়তো খুচরো মিলতো। আচ্ছা চলুন না কোথাও গিয়ে চা খাই।
—চা ? না থাক।
—না হলে অন্য কিছু খাওয়া যাবে। আসুন না।
রঞ্জনার আহ্বানের এই দৃঢ়তাব্যঞ্জক আন্তরিকতাকে উপেক্ষা করতে পারল না সুখেন্দু। গঙ্গার ওপারে ডুবন্ত বিকেলের সোনালী রোদের দিকে মুখ করে কিছুটা হেঁটে ওরা দুজনে গিয়ে ঢুকল একটা অন্ধকার রেস্তোরাঁয়।
মুখোমুখি বসলো দুজনে। যা আনতে বলার রঞ্জনাই বললে। সুখেন্দু প্রায় আড়ষ্টের ভঙ্গিতে বসে থেকে খেল কেবল। মাঝে মাঝে নিচু নজরে কেবল লক্ষ্য করল রঞ্জনার হাত দুটোকে। লক্ষ্য করে আবিষ্কারও করল যেন আশ্চর্য কিছু।

দূর থেকে সাজসজ্জার নিখুঁত পারিপাট্য যা স্বভাবতই মনে করিয়ে দেয়, রঞ্জনার গায়ের রঙ কিন্তু ততখানি উজ্জ্বল নয়। অবশ্য এমনও হতে পারে যে রেস্তোরাঁর অনুজ্জ্বল পরিবেশই তার দৃষ্টিতে বিভ্রম এনেছে। কিন্তু গায়ের রঙ যদি যথার্থ উজ্জ্বলই হয়, তাহলেও এটা নিশ্চয়ই তার অন্ধকারে ভ্রান্ত দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নয় যে, রঞ্জনার হাতের গড়ন—কাঠের টেবিলের ওপরে তার যে হাতখানা সমর্পণের ভঙ্গিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে রয়েছে—যথেষ্ট পুষ্ট নয়। কিন্তু তার মধ্যে কিছু আকর্ষণ আছে। যা দৃষ্টিকে ফিরতে দেয় না।

সুখেন্দু ভেবেছিল—রঞ্জনার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সে কিছু বলবে। বলবে—দেখুন, আপনি রাগ করে দিচ্ছেন বলেই টাকাটা আমি নেব না। ভেবেছিল, এই কথায় রঞ্জনা হাসবে। সেই হাসির দিকে তাকিয়ে সে আবার বলবে—আমার উপর রাগ করাটা উচিত হয়নি আপনার। আমাকে দেখেও কি আপনি বুঝতে পারছেন না যে, আমি অসুস্থ। অসুস্থ মানুষ স্বভাবতই ক্রোধী হয়, বিদ্বেষী হয়। পাঁক থেকে পোকা যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্ম নেয়, অসুস্থ মন বহির্জগতের কার্য-কারণের যোগাযোগ ছাড়াও তেমনি জন্ম দিতে পারে দুঃখ-তাপ-বেদনা-বঞ্চনার স্বতোৎসারিত বোধ বা ব্যাধিকে।

কিন্তু রঞ্জনা যখন টাকা কটা তার হাতের দিকে এগিয়ে দিলে, অন্তরঙ্গ সেসব কথার কোনোটাই বলতে পারল না সুখেন্দু। কেবল বললে—আচ্ছা চলি। যেন টাকা ক'টা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেনা-পাওনার দায় অবশিষ্ট রইল না তার। কানে কথাটা যেমনই বাজুক রঞ্জনা বললে—আচ্ছা।

সুখেন্দু দ্রুতপায়ে দূরের দিকে চলে গেল।

নিরিবিলিতে কাটানো সামান্য একটু অবসর-যাপনের মধ্যে সুখেন্দু আজ সম্ভবত তার ছককাটা জীবনের গণ্ডির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। আপিসের ছুটি হয়েছে বহুক্ষণ আগে। তবুও এখনও ট্রাম লাইনের ধারে চাপ বেঁধে থাকা মানুষের ভিড়ের উত্তাল দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আপন একাকীত্বকে উপলব্ধি করল সে।

সন্ধ্যেয় বাড়িতে ফিরে চুপচাপ নিজের শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল সুখেন্দু। অন্যদিন সে অনেকটা সময় বাইরে কাটিয়ে আসে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে। তাই তার এই না-বেরোনোটা বাড়ির লোকের চোখে প্রকট হল। দৃশ্যটা বোধহয় প্রথম লক্ষ্য করেছিল মিনতি।

—মা, দাদা এসেই বিছানায় শুয়ে পড়ল কেন?

নীরদা সুখেন্দুর ঘরে ঢুকে দেখল ঘরে আলো জেলে একটা হাতে চোখ দুটোকে ঢেকে শুয়ে আছে সে।

—খোকা!

—কি।

—এমন অসময়ে শুয়ে আছিস কেন?

—এমনি।
—কোনোদিন তো থাকিস না। শরীর খারাপ হয়নি তো?
—না কিছু হয়নি, তোমরা যাও।
কয়েক দিন আগে সুখেন্দুর ঘাড়ে সট্‌কা লেগে একটা ব্যথা জন্মেছিল। নীরদার মনে পড়ল সেটা।
—ঘাড়ের ব্যথাটা আবার দেখা দিয়েছে নাকি?
—বলছি না কিছু হয়নি আমার।
সুখেন্দুর তীব্র প্রতিবাদেও নীরদার মন সন্দিগ্ধ। তিনি এগিয়ে এসে সুখেন্দুর কপালে হাত রাখলেন। দেখতে চাইলেন জ্বর-টরের কোনো আভাস মেলে কিনা।
সুখেন্দু হঠাৎ বালিশ থেকে মাথা তুলে চেঁচিয়ে ওঠে—
—তোমরা আমাকে নিয়ে কি আরম্ভ করেছ বলো তো?
নীরদা সুখেন্দুর এই আকস্মিক উত্তেজনায় বিমূঢ় কিছুটা।
—কি করবো আবার?
—কি করবো! দিনরাত শরীর-শরীর রোগ-রোগ অসুখ-অসুখ। কানের কাছে ঢাক পিটিয়ে চলেছ। কথাগুলো বেশি করে বলে বেশি আনন্দ পাও বোধহয় তোমরা। কিন্তু শরীর ছাড়াও আমার একটা মন আছে। আমার একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে। আমি যদি দু-দণ্ড নিজের জীবনকে নিয়ে কিছু ভাবি, চিন্তা করি, অমনি চারপাশ থেকে ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসবে সবাই—কি হল কি হল করে। ঠিক আছে। আমার শরীরের ওপর যদি এতই দরদ তোমাদের, কাল থেকে ঘরেই বসে থাকবো। চালের পয়সা, তেলের পয়সা নিয়ে কেউ আমাকে কিছু বলবে না।
নীরদা আর কোনো কথা না বলে খানিকটা হতভম্বের ভঙ্গিতে রান্নাঘরে উনোনের কাছে গিয়ে বসেন। আগুনের লাল আভায় বয়সের জীর্ণতা-লাগা তার মুখ-মণ্ডলটাকে দগ্ধ মনে হয়।
পাশের ঘরে ঝিণ্টু টুলুরা চেঁচিয়ে পড়ছিল। মিনতির গলায় সর্বক্ষণ জড়িয়েছিল একটা অস্পষ্ট সুরের গুনগুনোনি। এখন সব স্তব্ধ। সমস্ত বাড়িটা থেকে হঠাৎ যেন লুপ্ত হয়ে গেছে জীবনের সাড়া। মৃত্যুর মতো নিথর নৈঃশব্দ্যের পটভূমিকায় কেবল সময়ের মৃত্যুহীন কণ্ঠস্বর টেবিলের ওপরে রাখা টাইম-পিসে।
আর ঘুরে ঘুরে নিজের কণ্ঠস্বরটা কানে আসছিল সুখেন্দুর। কী কর্কশ! কী কর্কশ! কী কুৎসিত!
আমি কি প্রতিদিনই এমন রুক্ষস্বরে কথা বলি? কেউ কোনোদিন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি, সে কি সৌজন্যের বশে? অথচ সকলের কানেই বেজেছে এমনি রূঢ়, রুক্ষ

উচ্চারণ।
রঞ্জনার কানেও? সেদিন সিঁড়িতে ওঠার সময় যা বলেছিলাম তার মধ্যেও কি ছিল এমনি অমার্জিত স্বর? তাই কি মার্জনা করেনি? ভদ্রতার অভিনয় করে শোধ নিয়েছে? আর মনে ভেবেছে সমাজ তার একটা স্তরের মানুষকে কত দীন করে গড়েছে? স্বাস্থ্যে দীন, সৌজন্যে দীন, শিক্ষায় দীন, শালীনতায় দীন, অর্থে দীন, আত্মপ্রত্যয়ে দীন?
ভাবনাগুলো তার মনে ঢেউ হয়ে ওঠার মতো আবেগের হাওয়া পেল। এবং উঁচু-নিচু এই অসংখ্য ঢেউ-এর উদ্দামতাকে কোথাও একটা উত্তাল প্রবাহে বইয়ে দেওয়ার জন্যে অস্থির বাসনা তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে তুলল ক্রমশ।
মা-এর কাছে সত্যপালনের তাগিদেই হয়তো সুখেন্দু পরের দিন সকালে সত্যিই কাজে বেরুল না। কিন্তু বিকেলের রোদ গাঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্গত কোনো এক অস্থিরতা তাকে টেনে নিয়ে এল ডালহৌসি স্কোয়ারের ট্রাম লাইনের দিকে।
এখনও আপিসের ছুটি হতে দেরি আছে। স্কোয়ারের চারপাশের অঞ্চলটা তাই ফাঁকা, যানবাহনগুলো খালি, মাথার ওপরে রোদের উজ্জ্বলতা খুবই প্রখর। ছায়ায় না দাঁড়ালে শরীরটা পুড়ে যাবে। গতকাল যে গাছের ছায়ায় রঞ্জনা দাঁড়িয়েছিল, সুখেন্দু সেইখানে এসে দাঁড়াল।
আকাশের বর্ণহীনতার দিকে তাকিয়ে সুখেন্দুর চোখে ভেসে এল একটা ছবি। রঞ্জনার নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল কাল। তার ফলে সে যেন অনেক কাছের মানুষ হয়েছিল। শিশুর সারল্য ফুটে উঠেছিল তার মুখে। গ্রামের বয়স্কা মেয়েদের নাকে কাঁচ-বসানো নাকছাবি তাদের মুখমণ্ডলে যেমন ফোটায় অনাড়ম্বর মাধুর্য। তার নিজের চোখ দিয়ে আবিষ্কার-করা এই অনুভবগুলোকেই সে চাইছিল রঞ্জনার কানে পৌঁছে দিতে। তার কণ্ঠে অনুতাপের কম্পন এল, কথোপকথনের শুরুতেই। সে মনেমনে রঞ্জনাকে বললে,
—আপনি কি কাল আমার ওপর রাগ করেছেন?
রঞ্জনা যেন তারই জবাবে,
—আমি? কেন বলুন তো।
—কাল আপনি টাকা কটা আমার হাতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি কোনো কথা না বলে অভদ্রের মতো চলে গেছলাম। হয়তো আপনার মনে হয়ে থাকতে পারে সৌজন্য ও শালীনতা সম্বন্ধে আমি সচেতন বা শিক্ষিত নই।
আপনি সে রকম ভেবে থাকলে তাকে যুক্তিহীন বলতে পারি না। কিন্তু যদি একথা বিশ্বাস করেন যে, মানুষের বাহ্যিক ব্যবহার সব সময় তার আত্মাকে উন্মোচিত করে দেখায় না, তাহলে জানবেন আমি সত্যিই অভদ্র নই।
রঞ্জনা যেন বিব্রতা।

—দেখুন। আপনার চলে যাওয়ায় কিছুই ভাবিনি আমি। আপনি অনর্থক অনুতপ্ত হচ্ছেন।
—সেটাও স্বাভাবিক হতে পারে। আমার এই কদর্য আকৃতি আর কর্কশ কণ্ঠস্বর যে মানুষকে সান্নিধ্য-দানের পক্ষে অনুপযুক্ত, সেটাও আমার অজানা নয়।
—আমাকে অপমান করাই কি আপনার উদ্দেশ্য ?
সুখেন্দুর অন্তর্গত আবেগ এতক্ষণে কিছুটা কোমল ও করুণ। যেন অনেক যোজন দূরে দাঁড়িয়ে রঞ্জনার কাছে এগিয়ে আসার অনুমতি প্রার্থনা করছে সে।
—না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আমার নেই। আমি শুধু আমার কয়েকটা ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথা আপনাকে জানাতে চাই।
—আপনার ব্যক্তিগত কথা আমাকে শোনাচ্ছেন কেন ?
—আপনি সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত।
সুখেন্দুর মনে হল রঞ্জনা যেন এই কথায় উৎকর্ণ হয়েছে। যেন রঞ্জনা কিছু বুঝেছে। এখন নিজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাইছে। এই ধারণা সুখেন্দুর চাপা আবেগকে উথলে উঠতে প্রেরণা দিল।
—দেখুন কালকের বিকেলটা আমার জীবনে একটা অপূর্ব আবির্ভাব ঘটিয়ে গেছে। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে—কালকের সেই রেস্তোরাঁটা, আমরা দুজনের মুখোমুখি বসেছিলাম যেখানে। চা, চপ, মিষ্টি যা হুকুম করার সব আপনিই করেছিলেন। আমি ছিলাম স্তব্ধ হয়ে বসে। কোনো কথা বলিনি। আপনি হয়তো কিছু ভেবেছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আমার জীবনে সূত্রপাত ঘটছিল এক অপূর্ব আবির্ভাবের।
প্রথমে দূরাগত অস্পষ্ট সুরের একটা ঝংকার কানে আসছিল আমার। আমার গলার স্বর কর্কশ তা আমি জানি। ভয় ছিল—পাছে সেই শব্দে ঐ সুরটুকু কাটে। কিন্তু ক্রমশ মনে হতে লাগল ঝংকৃত সুরটা দূরাগত নয়। বাজছে আমারই শরীরের অন্তর্গত কোনো তন্ত্রীতে। আর আমার যে শরীরটাকে কদর্য বলে চিনি তার কোনো গোপন অন্তরাল থেকে উত্থিত হয়ে একটা মুদিত পুষ্প ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছে আমার ভিতরে। রেস্তোরাঁর ময়লা দেওয়াল, মলিন বিবর্ণ আসবাবের সঙ্গে রাশীকৃত মানুষের জঠরের ক্ষুধা এবং ক্ষুধার্ত চোখের লুব্ধ দৃষ্টি আমাদের চারপাশের অন্ধকারকে গাঢ় করে তুলেছিল। সেই অন্ধকারেও কোথা থেকে আলোর কিরণ এসে লাগছিল আমার চোখে। তাকিয়ে দেখলাম, খুঁজলাম, শেষে বুঝতে পারলাম সেই কিরণ তোমার হাতের। কাঠের টেবিলে নিথর হয়ে যে হাতখানা পড়েছিল তোমার। মাথা নত করে সে দিকেই তাকিয়েছিলাম সর্বক্ষণ। অনুভব করতে পারছিলাম সেই কিরণেই নিদ্রিত একটা পুষ্পের জাগরণ ঘটেছে আমার রক্তপ্রবাহে।
তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম তোমার দীর্ঘ আঙুলের গড়ন। কী স্নিগ্ধ আর

সরল। অথচ কী গভীর ও প্রশান্ত। এক মুহূর্তে যেন উদ্দাম কৈশোরটাকে ফিরে পেলাম। সেই বয়স, যখন দীঘি দেখলেই সাঁতার দিয়ে পার হওয়া চাই। যখন গাছের সব ফলে, শাখার সব ফুলে আমার ছিনিয়ে নেওয়ার অবারিত অধিকার। বৃষ্টির পর গাছের পাতায়, ঘাসের শিষে জল। সেই গাছের নিচে মাথা, ঘাসের নিচে হাত পেতে বৃষ্টির জলকে ধরতাম দুহাতে। সে যেন কী বৃহৎ পাওয়া।

তোমার হাতের দিকে তাকিয়ে মনে হল আমি চিনতে পেরেছি আমার যথার্থ আমিকে। আমি রুগ্ন নই, এখুনি হয়ে উঠতে পারি অভ্রভেদী বিরাট পুরুষ। আমার কণ্ঠস্বর কর্কশ নয়। আমি পারি সুনিবিড় গানের ভাষায় কথা বলতে। বহুবার আমি বললাম রঞ্জনা, তোমার হাতটা আমাকে দাও। এখুনি বেঁচে উঠব আমি। আমার মধ্যে সব আছে, কিন্তু শুকিয়ে আছে। শিকড় হয়ে আছে। আমি ভালবাসতে পারি। আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছ কি তুমি?

জীবনের ব্যর্থতা শূন্যতা আমাকে জীবন-বিদ্বেষী করে তুলেছে। তোমার হাতটা পেলে আমি আবার মানুষের মধ্যে ফিরে আসি। মানুষের বন্ধু হই, সঙ্গী হই।

বইয়ের পাতায় পৃথিবীর বহু সংগ্রাম, সৃষ্টি, সমৃদ্ধি ও শান্তির কথা আমি পড়েছি। অনেক দেশের উত্থান পতনের ইতিহাস আমি জানি। আমি জানি সে-সব তত্ত্বের কথা যা দেশকে ইস্পাতের কাঠামো যোগায়। কিন্তু কি করে নিজের অতল-গর্ভ হতাশার হাত থেকে উদ্ধার পাবো জানতাম না।

তোমার কিরণময় হাতটুকু আমাকে দাও। আমি আর একবার বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখি সে কত সুন্দর!

দেবে?

আমি অযোগ্য নই।

একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় পড়ল সুখেন্দুর কাঁধে। সে পাশ ফিরে দেখলে নীতিশ বাগচী। তার কলেজ জীবনের সহপাঠী। ছাত্র-আন্দোলনের নেতা ছিল। কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিল, কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল, সারা বছর না পড়েও পাস করার কৌশল জানা ছিল অধ্যাপকদের আয়ত্ত করে। সেই নীতিশ বাগচীকে সুখেন্দু দেখছে প্রায় সাত বছর পরে। অনেক স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ হয়েছে সে।

সুখেন্দুর কাঁধে আবার একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—

হ্যাল্লো সুখেন্দু, কি খবর? কি করছিস এখানে দাঁড়িয়ে?

সুখেন্দুর বুঝি তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। সে যে কখন এসেছে, কেন এসেছে, জায়গাটাই বা কোথায়, এবং এখানে নীতিশ এলো কোথা থেকে,

এমনি কয়েকটা উত্তরহীন জিজ্ঞাসা তার মনে ঝাপ্‌টে উঠছে। কথা বলতে গিয়ে সে অনুভব করলে তার গলাটা শুষ্ক। যেন এখানে দাঁড়িয়ে অনর্গল চিৎকার করছিল সে। আড়ষ্ট স্বরে সে বললে—

—আরে নীতিশ!

নীতিশ এক মুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে উজ্জ্বল হেসে

—হ্যাঁ আমি রে। এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলি তুই? যে ভাবে দাঁড়িয়েছিলি মনে হল যেন রোদের কিরণ খাচ্ছিস। তোকে কিন্তু দূর থেকে চিন্‌তে পারিনি। কী সিলি রকমের রোগা হয়েছিস্‌ তুই!

সুখেন্দুর যেন নীতিশকে বলার মতো কোনো কথা নেই—এমন নৈর্ব্যক্তিক, নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে সে তাকাল নীতিশের দিকে। নীতিশ বললে,

—অনেক দিন পর দেখা হল, তাই না? পাঁচ-ছ বছর তো হবেই। কলকাতায় রীচ্‌ করেছি পরশু। পুরানো বন্ধুবান্ধব বলতে তোর সঙ্গেই দেখা হল প্রথম। কে কোথায় আছে, থাকে, কিছুই জানি না। সেই কলকাতা, আমার যৌবনের উপবন—নাউ ইট্‌স কম্‌প্লিট্‌লি আন্‌নোন্‌ টু মি।

—কোথায় আছিস তুই?

—ইউ, এস, এ।

—ইউ, এস, এ?

—ইণ্ডিয়ান এমব্যাসিতে।

—তাই নাকি? কত দিন?

—ফিফটি সেভেনের অগস্টে জয়েন করেছি।

সুখেন্দুর ইচ্ছে করল একটা প্রশ্ন করতে কীভাবে চাকরিটা পেল সে। ভারত-বর্ষের বাইরে কোথাও যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সুখেন্দুর মনের গোচরে অগোচরে অনেক সময়েই উঁকি দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা ছেলেমানুষী শোনাবে ভেবেই বিরত হল সে। তর্জনীতে একটা চাবির রিং ঘোরাচ্ছিল নীতিশ, যার লম্বা চেনটা তার প্যাণ্টের কোমরবন্ধের সঙ্গে বাঁধা। ঘুরন্ত চাবির গোছায় রোদ ঠিকরে যাচ্ছে। রোদ লেগেছে নীতিশের সিল্কের শার্টে। শার্ট ঠেলে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার প্রশস্ত স্বাস্থ্য।

—তুই কি করছিস?

—আমি?

সুখেন্দু নীতিশের চোখের দিকে তাকাল। কূপের গভীর তলদেশের কালো জলের মতো। আরেকটা সিগারেট ধরাল নীতিশ। সুখেন্দু ভাবল আলাপ-টাকে এখুনিই শেষ করতে হবে কোনো জরুরী কাজের অজুহাতে। নীতিশের এই উগ্র উজ্জ্বল উপস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার অস্তিত্বের বোধটা যেন সংকুচিত হয়ে আসছে। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সুখেন্দু ভাবল বলবে—

ব্যবসা করছি। স্বাধীন জীবিকা। চিরকাল বই পড়াকে ভালবাসতুম তুই জানিস। দশটা-পাঁচটার ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা কোনো অনিচ্ছাকৃত চাকরির দাসত্ব না করে আমি সেই বই-এর ব্যবসা করছি। কিন্তু মনে হল নীতিশ যদি প্রশ্ন করে দোকানটা কোথায়, তখন কি বলবে। বলতে হবে দোকান নেই। আপিসে-আপিসে বই বিক্রি করি। তখন এই স্বাধীন জীবিকাটার পুরো অর্থ দাঁড়াবে—ফিরিওলা। সুখেন্দু বললে—চাকরি করছি আর কি।

—কোথায় ?

—একটা ব্যাঙ্কে।

—বিয়ে করেছিস ? বাচ্চা-কাচ্চা ?

—বিয়ে ? না বিয়ে করিনি।

—তুই ?

—করেছি। তবে এ-দেশী নয়।

হাতের সোনালী রিস্টওয়াচটা দেখে নিল একবার নীতিশ।

—একমাস ছুটিতে আছি। একদিন আয় না আমার বাড়িতে। মিসেসের সঙ্গে আলাপ হবে। আমাদের নতুন বাড়িটা জানিস তো, নিউ আলিপুরে।

পকেটের চামড়ার ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট ভিজিটিং কার্ড বার করল নীতিশ।

—এটা রাখতে পারিস। আসবার আগে একটা রিং করে টাইমটা ফিক্স করলে সবচেয়ে ভালো হয়। আমার একটু তাড়া আছে। এখানে কারো জন্যে অপেক্ষা করছিস নাকি তুই ?

—না, অপেক্ষা নয়।

—ও। আচ্ছা। ট্যাক্সি, এ্যাই ট্যাক্সি, ট্যা···

একটা ট্যাক্সি মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে এল নীতিশের সামনে। ড্রাইভার গাড়ির দরজাটা খুলে দিলে। নীতিশ আরেকটা নতুন সিগারেট ধরাল গাড়িতে চাপার আগে।

—আচ্ছা, চলিরে। বাই বাই।

আপিসের ছুটি। মানুষের ভিড় বাড়ছে একটু একটু করে। এখনো ট্রামগুলো খালি। বসে যেতে পারা যাবে। সুখেন্দু একটা ট্রামে চেপে পড়ল। কোথা থেকে একটা সূক্ষ্ম বেদনা ওপরের দিকে উঠছে। বেদনা না বিষাদ ? বিষাদ না আত্মগ্লানি ? নীতিশের কাছে মিথ্যা পরিচয় দেওয়ার জন্যে ? না কি ভিত্তিহীন একটা দুরাকাঙ্ক্ষার গায়ে সারাদিন অনেক স্বপ্নের প্রলেপ মাখিয়েছি বলে ?

বাড়িতে ফিরে অকারণেই সুখেন্দু গলার স্বরটাকে কোমলতায় ভরিয়ে ডাকলে—মা !

নীরদা এগিয়ে এলেন।

—ডাকছিস ?

—আমাকে কিছু খেতে দাও।
—কি খাবি বল? গরম রুটি করে দেবো?
—তাই দাও। শরীরটা সত্যিই ভারী দুর্বল লাগছে। ডাক্তার দেখাবো।
—সে তো কতবার বলেছি তোকে। আমাদের কথা কি কানে তুলিস? তোর কাঁধে কি হয়েছে রে? অনবরত হাত দিয়ে ওখানটা টিপছিস কেন?
—কাঁধের এখানটা কি রকম টনটন করছে। বইয়ের ব্যাগ বয়ে বয়েই ব্যথাটা হয়েছে আর কি।
নীরদা চলে গেলেন। সুখেন্দু ভাবল—মা কী সরল। মা এ-প্রশ্ন করল না যে, তুই তো আজ বইয়ের ব্যাগ নিয়ে বেরুসনি খোকা। করলে কি উত্তর দিতাম। বলতে পারতাম কি আমার এক বিদেশ-বাসী সহপাঠী বন্ধু দীর্ঘ সাত বছর পরে দেখা হওয়ায় আনন্দে কাঁধে চাপড় মেরেছিল—ব্যথাটা তারই।
মায়ের কাছ থেকে শরীরের এই ব্যথার কারণটা গোপন করতে পেরে সুখেন্দু খুশি হল। ঠিক এই খুশির সময়েই আরও একটা ব্যথা কুয়াশার পর্দার মতো স্তরে স্তরে জমছিল তার মনের শূন্য জমিতে—যেটা তার নিজের কাছেই এখনো গোপন।
পৃথিবীতে সন্ধ্যা নামছে।
নিজের ঘরে একটু একা হওয়ার অবসর পেলে হয়তো কিছু গোপন থাকবে না আর।

আলো-হাওয়া-আকাশ
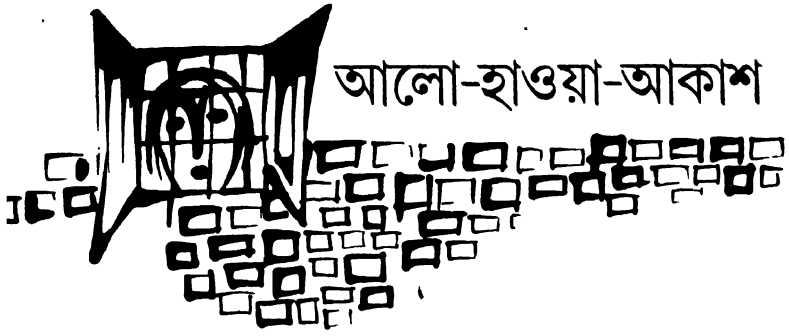
চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখে নমিতা। সুরেশ চোখ বুজে দেয়ালে পিঠ দিয়ে কি যেন ভাবছিল। চায়ের কাপের শব্দে উঠে বসল সিধে হয়ে। চায়ের কাপের দিকে একবার তাকিয়ে সে নমিতার দিকে দৃষ্টি ফেরালো। নমিতার দৃষ্টি ছিল অন্যদিকে। ঘরের এককোণে স্তূপীকৃত একরাশ জিনিসপত্র সব যেন ঘণ্ট পাকিয়ে। কবে আর কখন যে ঝাড়া-মোছার ফুরসত হবে কে জানে। কি ভেবে তার শরীরে চলে যাওয়ার ভঙ্গিটা ফুটে উঠতেই সুরেশ খপ্ করে হাত দুটো ধরে ফেললে তার। হাতের রোল্ডগোল্ডের চুড়িগুলোও নমিতার সঙ্গে চম্‌কে উঠল হঠাৎ।

—কি হোল? হাত ছাড়ো।

সুরেশ হাত না ছেড়ে বললে—আগে সত্যি করে বলো।

—হাত ছাড়ো। জানালাটা খোলা আছে না।

—থাক গে। এ তোমার শোভাবাজারের এঁদো গলি নয় যে একটা বাড়ির পেটের মধ্যে আরেকটা বাড়ি মাথা গলিয়ে বসে আছে।

—বাড়ি না থাক রাস্তা তো আছে। রাস্তা দিয়ে লোকজন যাচ্ছে-আসছে না?

—গেলে তো কি হয়েছে ? তুমি তো আমার বিয়ে-না-করা-বৌ নও।
—আহা ! কথার কী ছিরি ! হাত ছাড়ো তো দেখি ত্রিকাল সন্ধ্যের সময়। অনেক কাজ পড়ে আছে আমার। চা চা করছিলে। চা-টা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।
—যাক্। তুমি আগে সত্যি করে বলো তো তোমার মনের কথা।
—কি বলবো ?
—তুমি কি সত্যিই খুশি হওনি এই বাড়িতে এসে ?
—দিন রাত ঐ এক কথা। কতবার বলবো ! অনেকবার বলেছি।
—সে তো স্বামীর মন-রাখা জবাব।
—মিছে কথা বোলো না। কাল রাত্রের কথা মনে নেই ?
—কাল রাত্রে ? কি হয়েছিল বলো তো ?
—আহা ! কত ভালো মানুষটি যেন। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।
সুরেশ হাসল।
—কালকের কথা কালকের রাতের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। কই এখন একবার তেমনি গলা জড়িয়ে বলো তো দেখি। তাহলে বুঝবো—
—আর তোমাকে অত বুঝতে হবে না। আমার ওদিকে কয়লা পুড়ছে উনোনে। হাতটাকে ছিনিয়ে নিয়েই নমিতা চলে যায় রান্নাঘরে। সুরেশ চায়ে চুমুক দেয়। চা খাওয়া শেষ করে আবার সে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকে চোখ বুজে। যেন কী এক গভীর ধ্যানে নিমগ্ন—এমনই দেখায় তার নিশ্চল বসে থাকার ভঙ্গিটা। ঠোঁটের কোণে ফুটে থাকে মৃদু হাসির একটু আভাস। হাসি ছাড়া সেটা সুখের অনুভূতির আভাসও হতে পারে। সমস্তটা মিলিয়ে তাকে বেশ একটা তৃপ্ত মানুষের প্রতিকৃতি বলে মনে হয়।
নমিতা একসময় ঘরে ঢুকে দেখে সুরেশের মাথাটা দেয়ালকে আশ্রয় করে ঘাড় থেকে বিছানার দিকে ঝুলে পড়েছে। নমিতা ডেকে তার ঘুম ভাঙায়। সুরেশ লজ্জায় অপ্রস্তুত হয়ে বলে—'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝি। দেখেছো, বসে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি কখন। এই দেখ, এই হচ্ছে বাড়ির গুণ। আলো বাতাসের ধর্ম। জানলা খুলে দিলে এমন হুহু করে হাওয়া এসে ঘর ভরিয়ে দেয়—কলকাতা শহরে ক'টা বাড়ির ভাগ্যে তা জোটে। অবশ্য তোমরা তো আবার এসব চাও না।
কথাগুলো বেশ খানিকটা গর্ব ও আত্মপ্রসাদের উৎফুল্লতা এনে দেয় তার সদ্য-ঘুম-ভাঙা বোকা বোকা ভাব-লেশহীন মুখে। যেন নমিতা তার প্রতিপক্ষ। যেন মানুষের জীবনে আলো-বাতাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা নেই। যেন সে বোঝে না কলকাতা শহরে আলো-বাতাস-সংযুক্ত একটা বাড়ি বহনযোগ্য ভাড়ায় পেয়ে যাওয়া কী অবিশ্বাস্য রকমের সৌভাগ্য। শহরের মেয়ে বলে তার মনটাও যেন, ইঁট-কাঠ-কংক্রীট দিয়ে তৈরি।

অবশ্য নমিতার সম্পর্কে এ-অভিযোগ যে টেকে না সেটা সুরেশও জানে। নমিতা শহরে লেখাপড়া শিখে বড়ো হলেও তার জন্ম গ্রামে, যেখানে তার সারা শৈশবের স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে আছে। এ-সব জেনেও সুরেশ যে নমিতাকে তার এই সদ্য-ভাড়া-পাওয়া বাড়ি-সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে একটু করে বিদ্রুপের খোঁচা মিশিয়ে দেয়—তার কারণ সুরেশ নমিতার কাছ থেকে প্রত্যাশা করেছিল অবিমিশ্র প্রশংসা। নমিতা নতুন বাড়িতে এসে খুশি হয়েছে যথেষ্টই—সবই সে যেমন-যেমন চেয়েছিল তেমনিই পেয়েছে, কিন্তু জায়গাটা বড্ড ফাঁকা বলেই সে বলেছিল—এত ফাঁকা জায়গায় সারাদিন একা একা থাকবো কি করে? কথাটা যুক্তিসঙ্গত। জায়গাটা সত্যিই বড়ো বেশি রকমের ফাঁকা ও নির্জন। দূরে দূরে এক-একটা বাড়ি। বাড়িতে বাড়িতে যতখানি ঘনিষ্ঠতা থাকলে সেটা একটা পাড়া হয়ে ওঠে—এখানে তা নেই। সেই কারণে মানুষে-মানুষেও একটা বিচ্ছিন্নতা। সবই সত্যি। কিন্তু তবুও এক সঙ্গে সব সুবিধে এসে পায়ের তলায় পোষা বেড়ালের মতো লুটিয়ে পড়বে-এমন অদ্ভুত আবদার বা ইচ্ছা নমিতা কি করে ভাবতে পারল। কিংবা নমিতা একথা ভাবতে পারল না কেন যে, আজ যে জায়গাটাকে ফাঁকা তেপান্তরের মাঠ বলে মনে হচ্ছে ছ-মাস এক বছর কি দু-বছরের মধ্যেই সেখানে বিরাট বসতি গড়ে উঠবে। আসলে নমিতা তো পৃথিবীর খবর রাখে না বা জানে না। যদি জানতো যে এই জায়গায় এক কাঠা জমির কত দাম, মাসে মাসে সেই দাম কী রকম অগ্নিমূল্যে বেড়ে চলেছে, যদি খবর রাখতো এসব জমি যারা কিনছে তারা কারা এবং অদূর ভবিষ্যতে কাদের প্রতিবেশী হবে সে—তাহলে নিজের ভাগ্য ও স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করতো সে। আর নমিতার ওপর অভিমান বা কিছুটা ক্রোধ থেকেই সুরেশের ভেতরে একরকম একরোখা জেদ দেখা দিয়েছে। নমিতাকে একদিন সে স্বীকার করাবেই যে, এ-জায়গায় বাড়ি ভাড়া পাওয়ার সঙ্গে হাতে স্বর্গ পাওয়ার তুলনা করা চলে অনায়াসে।

একদিন আপিস থেকে ফিরে আসার পর নমিতা যখন চায়ের কাপ এনে তার টেবিলে রাখল, সুরেশ গম্ভীর মুখে বসে রইল চুপচাপ। চায়ের কাপ বা নমিতার দিকে তাকাল না। নমিতা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললে—চা দিয়েছি। খাবে না?

সুরেশ স্পন্দনহীন ও উত্তরহীন। নমিতা সম্ভবত কোনো রকম শারীরিক গণ্ডগোলের কথা চিন্তা করেই এগিয়ে গিয়ে একটা হাত সুরেশের পিঠে রেখে আরেক হাত দিয়ে তার কপালটা স্পর্শ করে বললে— শরীর খারাপ না কি গো?

সুরেশ নিষ্প্রাণ ভাষায় বললে—না।

—তাহলে কি হয়েছে। এমন শুকনো লাগছে কেন তোমার মুখটা।

—এমনি। ভাবছি আর কি।

—কি ভাবছো? ভাববার আবার কি হোল।

—নতুন কিছু নয়। পুরনো কথাই ভাবছি। পৃথিবীতে সবাই সব জিনিসের মর্ম বোঝে না।

নমিতা সুরেশের কথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইল তারপর সরলভাবে প্রশ্ন করল—কিসের জন্যে কথাটা বললে গো ?

—কাল আমরা একটা সিনেমা দেখতে গেছলাম না।

—হ্যাঁ।

—তার গল্পটা কার লেখা জানো নিশ্চয়ই।

—কেন জানবো না।

—কি নাম বলো তো ?

—পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়। তিনি কি খুব বড়ো লেখক ?

—বড়ো লেখক নয় ? আজকাল তো সিনেমায় কেবল ওঁরই বই তোলা হয়।

—তিনি কোথায় থাকেন জানো ?

—কি করে জানবো।

—আমাদের এই বাড়িটা থেকে দেড়শো হাত পিছনে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে। বুঝেছো। আর দুশো হাত দূরে—যেখানে ডবল ডেকারটা থামে—ঐখানে থাকেন কয়েকজন নামজাদা শিল্পী। শিল্পী-সাহিত্যিকদের ধ্যানী হতে হয়। তাঁরা তাই নির্জনতার মূল্য কি তা জানেন। তাই গাড়ি-ঘোড়ার কলরব আর মানুষের চিৎকার থেকে দূরে সরে এসে তাঁরা বাস করেন খোলা আলো-বাতাস-আকাশের নিচে। কিন্তু আমরা তার কি মূল্য বুঝি ? আমাদের হবে একটা এঁদো গলি, দরজার সামনে খোলা ডাস্টবিন আর পচা নর্দমা, একটা কল আর পায়খানা নিয়ে সাত ভাড়াটের সাত সাত্তে ঊনপঞ্চাশজন মানুষ দু-বেলা চেঁচাবে, দু-বেলা কয়লার ধোঁয়া ঢুকে ঢুকে ঘরের কোণে কোণে বাদুড়ের মতো ঝুলবে কালি-ঝুল, শীতে আর বর্ষায় দরজা-জানালা দিয়ে এক-চিমটে রোদের আলোও ঘরে ঢুকবে না—বেশ দিব্যি আরামে দিন কাটবে।

নমিতা চুপ করে শোনে। তার রাগ হয় না। হাসি পায়। সে বুঝতে পেরেছে এসব তার প্রতিই তিরস্কার। যেহেতু কবে সে যেন মাত্র একেবারের জন্যে বলেছিল—এত ফাঁকা জায়গায় সারা দিন কাটাবো কি করে একা একা।

নমিতা হাসতে হাসতে সুরেশের পাশে বসে পড়ে বলে—আচ্ছা, চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল, খেয়ে নাও তো। ধন্যি মানুষ তুমি। এত অভিমানী! কবে কি বলেছিলাম—এখনো তা ভুলতে পারোনি ? আমি তোমার বাড়িরও নিন্দে করিনি, জায়গারও নিন্দে করিনি। আমি বলেছি একা-একা থাকতে ভয় করার কথা। সেটা এখনও বলছি। তুমি খেয়ে-দেয়ে আপিসে চলে গিয়ে আবার যতক্ষণ না ফিরছো—ততক্ষণ কারো সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত না বলে ঘরে খিল দিয়ে চুপচাপ বোবা হয়ে বসে থাকা। আবার তুমি নেই বাড়িতে। হঠাৎ কেউ যদি এসে পড়ে—

সেও এক ভয়-ভয়। মেয়েমানুষ হলে তুমিও ঐ এক কথা বলতে। আচ্ছা বাবা, আমি দোষ স্বীকার করছি না হয়। তুমি চা-টা খাও তো।

সুরেশ নমিতার যুক্তি ও স্বীকারোক্তির সরলতার কাছে পরাস্ত হয়। রাগ জল হতে বিলম্ব ঘটে না। কিন্তু ওদিকে অধিক বিলম্বের ফলে কাপের চা-টি জল হয়ে গেছে। একটা চুমুক দিয়েই সুরেশ কাপ নামিয়ে রাখে।

—জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে যে একদম।

—হবে না। কখন করেছি—আর খাচ্ছ কখন। দাঁড়াও গরম করে আনি আবার।

গরম চা নিয়ে নমিতা ফিরে এলে সুরেশ বলে—ক-দিন হোল আমরা এই বাড়িতে এসেছি বলো তো? আজ নিয়ে বোধহয় দিন দশেক হবে। তাই না। এমন খোলা আলো-বাতাস-ভরা মাঠ পড়ে আছে বাড়ির সামনে। রাস্তার দুধারে গাছ। তবু একদিনও বেড়াতে বেরোনো হোল না আমাদের। তাড়াতাড়ি রান্না সেরে গা-ধুয়ে নাও তুমি। আজ বেরোব। সকালেও খুব ভোরে উঠে একবার বেড়িয়ে আসা উচিত। পায়ে ভোরবেলার শিশির লাগলে শরীরের উপকার হয়। ছেলেবেলায় বাবা আমাদের বলতেন। তাছাড়া সবুজ ঘাসের দিকে তাকিয়ে প্রতিদিন কিছুক্ষণ হাঁটলে চোখের দৃষ্টি ভালো থাকে। যে কোনো ডাক্তারই এ-কথা বলবে।

সেদিন রাত্রে নিবিড় আলিঙ্গনে নমিতাকে জড়িয়ে সুরেশ তার মনের অনুতাপকে আড়াল করতে গিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললে—সারাদিন তোমার একা-একা থাকতে খুব কষ্ট হয়—সত্যিই। আমার যে এখন একটু হাত-টান চলছে। হাতে টাকা জমলেই তোমার জন্যে একটা রেডিও কিনে আনবো। একেবারে একা থাকার চেয়ে তবু কিছুটা কষ্ট কমবে।

নমিতা বললে—না গো, এখনই রেডিও কেনার দরকার নেই। সংসারে ছোট বড়ো অনেক জিনিসের দরকার। একটা কাঠের আল্‌না কিনে দিও তো আমাকে সবার আগে। দেয়ালে পেরেক মেরে আর দড়ি বেঁধে কাপড়-চোপড় ঝুলিয়ে রাখলে ঘরটা যেন কেমন নোংরা হয়ে থাকে।

সুরেশ মুখে বলে—আচ্ছা। কিন্তু মনে মনে অঙ্ক কষে রেডিও আর কাঠের আল্‌না দুটো একই সঙ্গে সে কিনতে পারে কিনা!

* * * *

প্রত্যেক স্ত্রী-র মতো নমিতাও দরজার কড়া নাড়ার একটা বিশেষ ধরন দেখে বুঝতে পারে স্বামী এসেছে। কিন্তু সুরেশ কোনোদিন এমনভাবে কড়া নাড়ে না। তা ছাড়া এমন সময়েও বাড়ি ফেরে না কোনোদিন। তাহলে এই দুপুরে কে এল? কেই বা আসতে পারে। তার মা কিংবা বোন? তাদের খবর দেওয়া হয়েছিল। সত্যিই কি জায়গা চিনে এল তারা? আবার ভয় হোল, অচেনা কেউ নয় তো? বিছানা ও তন্দ্রা ছেড়ে খানিকটা আনন্দ ও খানিকটা আতঙ্ক নিয়ে দরজাটা খুলে

সামান্য একটু ফাঁক করতেই নমিতা দেখল—সুরেশ।
—তুমি! আজ এত তাড়াতাড়ি?
—ছুটি হয়ে গেল। আমাদের রাজ্যপাল মারা গেছেন—সেই জন্যে। তুমি কি ভেবেছিলে?
—আমার একবার মনে হয়েছিলো হয়তো মা এসেছেন।
ঘরে ঢুকে জামাকাপড় ছেড়ে সুরেশ নমিতাকে বলে—তোমার জন্যে একটা জিনিস কিনতে হোল।
—কি গো?
—কি হতে পারে বলো তো?
—কই দেখতে পাচ্ছি না তো কিছু। আমি তো কিনতে বলেছিলুম একটা কাঠের আলনা।
—বলতে পারবে না তুমি। এই দেখো।
—ওটা তো খবরের কাগজ। ওতে আমার কি হবে?
—খবর আছে একটা। মুখে বললে তো বিশ্বাস করবে না। তাই কাগজটাই কিনে ফেললাম। প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
—কি খবর আছে যা আমি বিশ্বাস করবো না।
—পড়ছি।
—নমিতা বিছানায় শুয়েছিল। সুরেশ তার পাশে শুয়ে খবরের কাগজ থেকে একটা সংবাদ পড়ে শোনাল। কর্পোরেশনের আলোচনায় স্থির হয়েছে সুরেশদের এলাকায় যে বিরাট ফাঁকা মাঠটা সুদীর্ঘ কাল ধরেই অব্যবহার্য অবস্থায় আবর্জনার পীঠস্থান হয়ে পড়ে রয়েছে সেখানে অদূর ভবিষ্যতেই একটি বিরাট পার্ক গড়ে তোলা হবে। শুধু পার্ক নয়। লেক-সংযুক্ত পার্ক। এমন কি কোনো দেশবরেণ্য মহাপুরুষের নামে নবগঠিত পার্কটিকে অভিহিত করা হবে—তাই নিয়ে কাউন্সিলারদের মধ্যে হাঁকাহাঁকি তর্ক-বিতর্ক পর্যন্ত হয়ে গেছে।
সংবাদ পড়া শেষ করে সুরেশ কিছুক্ষণ চুপ করে চোখ বুজে থেকে বলে—ভাবতে পারো কী কাণ্ডটা ঘটবে।
নমিতা বলে—কি কাণ্ড?
—কি কাণ্ড বুঝতে পারছো না। ডবল ডেকারগুলো যেখানে থামে—তারই দক্ষিণে ঐ যে বিরাট জায়গাটা নোংরা হয়ে পড়ে আছে—ওখানে যদি একটা পার্ক হয়—কী রকম চেহারা দাঁড়াবে আমাদের এই এলাকার। ঐ যে বলছ ফাঁকা ফাঁকা, মানুষ-জনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই—তখন দেখতে পাবে হাজার হাজার মানুষ সব সময় ভিড় করে রয়েছে চারপাশে। একদিন দু-দিনের আসা-যাওয়ায় কত লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে যাবে। রাতারাতি 'গোলাপ জল', 'মৌরী ফুল' পাতিয়ে বসবে কতজনের সঙ্গে তার কি ঠিক আছে। তারপর পার্কের ভেতরে যদি পুকুর

থাকে একটা, তুমি কি ভেবেছো আমি তখন চৌবাচ্চার জলে মগ ডুবিয়ে নাইবো। পুকুরের জল থাকতে চৌবাচ্চা! সাঁতার কেটে স্নান না করলে আবার স্নান! ছেলেবেলায় পুকুরে সাঁতার কাটা কি ভালো লাগতো। কত মার-বকুনি খেয়েছি তার জন্যে। তুমি কখনো পুকুরে সাঁতার কেটেছ?

নমিতার কাছ থেকে কোনো সাড়া আসে না। সুরেশ তাকিয়ে দেখে ঘুমিয়ে পড়েছে সে। একটু স্তব্ধ হয়ে শুয়ে থাকলে সেও ঘুমিয়ে পড়বে ভেবে সুরেশ যেন ঘুমকে আলিঙ্গন করার ভঙ্গিতে নমিতার দিকে ফিরে শুলো।

পরের দিন দুপুরে দরজায় আবার ঠিক তেমনি কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উঠল নমিতা। ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দেখতে পেল অপরিচিতা এক বয়স্কা বিধবা মহিলাকে। সঙ্গে নাতনীর বয়সী ছোট্ট আর একটি ফ্রক-পরা মেয়ে। নমিতাকে বিস্মিত বা বিচলিত হবার সুযোগ না দিয়েই তিনি তাঁর আত্মপরিচয় দিলেন। এ-পাড়ার এক তিনতলা লাল বাড়ির গিন্নী। পাড়ায় সেন-গিন্নী নামে পরিচিতা। আলাপ করতে এসেছেন নমিতার সঙ্গে। এদিকে নতুন কেউ ভাড়াটে এলেই তিনি স্বেচ্ছায় এসে আলাপ করে যান। এটা তাঁর নিছক অভ্যাস নয়, খানিকটা দায়িত্বও বটে। কেননা তাঁরাই এ পাড়ার প্রথম বাসিন্দা। সেন-গিন্নীর স্বামী প্রথম যখন এ-দিকে এসে নিজের বাড়ি তোলেন, তখন এটা ছিলো বনজঙ্গলে ভর্তি। সে বনের মধ্যে বাঘ পর্যন্ত ছিল। নিতান্ত দায়ে না পড়লে কেউ এ-পথ মাড়াত না। সন্ধ্যের পর মানুষ দেখা যেত না চোখে। এই যে এত সব বাড়ি, এত সব রাস্তা-ঘাট, গাড়ি-ঘোড়ার চলন, দোকান হাটের পত্তন—সবই ঘটেছে তাঁর চোখের সামনে। সুরেশ বাড়ি ফিরলে নমিতা সবিস্তারে সেন-গিন্নীর গল্প শোনায় তাকে। সুরেশ সব শুনে চিম্‌টি কেটে বললে—একেই বলে মেয়েমানুষ।

—কাকে?

—এই যে যারা একটুতেই অস্থির হয়ে ওঠে—হাঁপায়। ধৈর্য ধরে কোনো ব্যাপারকে বুঝতে চায় না।

— আমি আমার হাঁপালাম কিসে?

—হাঁপালাম কিসে? তুমি বাড়িতে পা দিতে না দিতেই, দুটো দিন যেতে না যেতেই মন্তব্য করেছিলে না যে—এমন ফাঁকা জায়গায় একা একা থাকবো কি করে সারাদিন? আবার এখন বলছো—যেচে এসে আলাপ করে গেছে লাল বাড়ির গিন্নী।

—আহা কী যুক্তি। একদিন কেউ এসে বেড়িয়ে গেলেই বুঝি একা থাকার কষ্ট দূর হয়ে গেল চিরজীবনের মতো!

—একদিন নয়, চিরজীবনের মতোই কষ্ট লাঘব হবে—দাঁড়াও না, একটা বছর কাটুক। তখন দেখবে কথা বলার লোকের অভাব হবে না আর।

নমিতার চোখ ও মুখের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎঝলকের মতো যে হাসির আলোকরেখাটি

বয়ে গেল—তা সুরেশের দৃষ্টির আগোচরে রইল না।
খেয়ে-দেয়ে বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সুরেশ। দুজনে একসঙ্গে খেতে বসলেও খাওয়ার পরও নমিতার আরও কিছু কাজ অবশিষ্ট থাকে। রান্নাঘরের নিকোনো-গোছানো ধোয়া-ধুয়ির কাজ। সে সব সারতে দেরি হয়ে যায় তার। সমস্ত কাজ শেষ করে নমিতা যখন শুতে আসে সুরেশের তখন নাক ডাকে। আজও তেমনি ডাকছিল। আর প্রতিদিনের মতো বুকের অবিরল ওঠা-নামা স্পন্দনের ওপরে লুটিয়ে পড়েছিল তার ডান হাতখানা। শোয়ার আগে দুটি অভ্যাস আছে নমিতার। সুরেশের ডান হাতখানা বুকের ওপর থেকে নামিয়ে রাখা। বুকে হাত রেখে ঘুমোলে মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে। আর দ্বিতীয় অভ্যাসটি হোল আলো নিভিয়ে দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সুরেশের মুখখানাকে অদ্ভুত এক কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করা।

আজও ঠিক তেমনি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে সুরেশের মুখের দিকে তাকিয়েছিল নমিতা। অন্য দিনের চেয়ে আজ যেন অন্য কিছু রহস্য খুঁজে পাচ্ছিল সে সেখানে। সুরেশের সন্ধ্যেবেলার একটা ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যের প্রতিধ্বনি তার কানে বাজছিল। তার বুকের মধ্যে কেমন একটা বিষাদের আবেগ জন্ম নিচ্ছিল ধীরে ধীরে।
আলো নিভিয়ে দিল সে।
এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদ্ভুত, অকল্পনীয় দৃশ্য উন্মোচিত হয়ে উঠল নমিতার চোখের সামনে। অন্য দিন আলো নিভিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুরেশের ঘুমন্ত শরীরটা অন্ধকারে মিশে যায়। তারপর সেই অন্ধকারেই স্বামীর পাশ্বর্বর্তিনী হয় সে। একটা কালো চাদরেই দুজনের দেহকে ঢেকে দেয় অন্ধকার। কিন্তু আজ তো তা হল না। সুইচটা নিভিয়ে দেওয়ার পরও সুরেশের মূর্তিটা নমিতার চোখের সামনেই ফুটে রইল। বৈদ্যুতিক আলোর চেয়ে ক্ষীণ কিন্তু অনুগ্র স্নিগ্ধতায় উজ্জ্বল এক ফালি জ্যোৎস্নার আলো জানলার গরাদ ডিঙিয়ে ঠিক সুরেশের ঘুমন্ত শরীরের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। নমিতার অভিভূত দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্যে অপলক হয়ে রইল দুধের সরের মতো জ্যোৎস্নার সেই স্বচ্ছ শুভ্রতার দিকে। নিমেষে তার মন ছুটে গেল শৈশবের স্মৃতির ভেতরে। সেখান থেকে তার ঘ্রাণের মধ্যে এসে মিশতে লাগল চাঁপা ফুলের গন্ধ। নমিতার গ্রামের বাড়িতে চাঁপা ফুলের গাছ ছিল একটা। ফুল ফুটলেই তার গন্ধ ছড়ায়। কিন্তু বিশেষ করে জ্যোৎস্নারাতগুলোতে ফুলের মধ্যে যেন গন্ধ ছাড়াও আর কিছু মায়া কিংবা মন্ত্র কিংবা মাদকতা এসে মেশে—যার ফলে খুশি হয়ে-ওঠা মনটা কিছুতেই শুধু খুশি হয়ে না থেকে অকারণে কান্নার মতো একটা করুণ অনুভবে আপ্লুত হয়ে অনির্দিষ্টের দিকে দিশেহারা হয়ে ছুটে যেতে চায়। বহু বছর পরে সেই গন্ধের স্বাদ তার নিশ্বাসে এসে মিশল। আর মনে মনে

কয়েকবার আক্ষেপের সুরে সে উচ্চারণ করল—এতদিন ধরে বেঁচে আছি—অথচ কখনো জ্যোৎস্না দেখার কথা মনে পড়েনি। কলকাতায় এসে কখনো কি জ্যোৎস্না দেখেছি ? নমিতা দু-হাতের ঠেলা দিয়ে সুরেশের ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করল।

—এই, ওঠো, ওঠো, শুনছো, ওঠো না। ঘরের ভেতরে কি এসেছে দেখো।

ঘুম ভেঙে ধড়ফড় করে উঠে বসল সুরেশ।

—অ্যাঁ—কে এসেছে বললে ? কে এসে...

ঘুমের মধ্যে সুরেশ কি-র বদলে কে শুনতে পেয়েছিল। শোনা মাত্র চোর-ডাকাতের কথা স্বাভাবিকভাবে মনে এসে যাওয়ার ফলেই হয়তো দ্রুত উঠে বসেছিল সে। নমিতা বললে—দেখতে পাচ্ছো না !

সুরেশ চারদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না।

—দেখতে পাচ্ছ না জ্যোৎস্নার আলো ঘরের ভেতরে।

সুরেশ এতক্ষণে বুঝল এবং দেখতে পেল। বিছানার ওপরে, ঘরের মেঝেয় তাদের দুজনের শরীরকে ছুঁয়ে টগর ফুলের মতো সাদা ধবধবে একরাশ জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে আছে। সুরেশ কোনো কথা না বলে শুধু থমকে চেয়ে রইল জ্যোৎস্নার শীতল শুভ্রতার দিকে। অনেকক্ষণ পরে নমিতা বললে—কি গো, তুমি যে একেবারে বোবা হয়ে গেলে।

সুরেশের তন্দ্রাভঙ্গ হল যেন এতক্ষণে। নমিতার কাঁধে একটা হাত রেখে বললে—জানো নমি, আমি আজ থেকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হলাম।

নমিতা হেসে উঠল।

—তার মানে তুমি এতদিন নাস্তিক ছিলে নাকি ?

—না, সে ভাবে বলছি না। নাস্তিকও ছিলাম না, আস্তিকও ছিলাম না। ঈশ্বরের থাকা-না-থাকা নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। কিন্তু ইদানীং আমি যখনই বাড়ির কথা ভেবেছি—তখনই আমার মনের মধ্যে একটা অনুচ্চারিত প্রার্থনা জেগে উঠতো আমার অজ্ঞাতেই। সে প্রার্থনা ছিল মুক্ত আলো বাতাস ও পরিবেশের জন্যে। চোখ মেললেই ঘাসের সবুজ চোখে পড়বে। দূরে কিংবা কাছে কিংবা বাড়ির ভেতরে ছোট্ট একটু উঠোনে ফুলের বাগান থাকবে। জানলার ধারে বসলে অনেক বিচিত্র পাখির, প্রাণীর, পোকামাকড়ের ডাক, তাদের ডানার রঙীন নকশা দেখতে পাবো। দিনের সময়টুকু যেভাবে এবং যেখানেই কাটুক না, রাত্রে যখন বাড়িতে ফিরে বিশ্রাম নেবো—তখন কোলাহল থাকবে না। কোথাও শহরের সরব চিৎকার, কুকুরের আর্ত কান্নার মতো শব্দ তুলে ডবল ডেকারের স্টপেজে এসে থামা, ট্রাম কিংবা ট্যাক্সির ড্রাইভার কিংবা পকেটমারকে কেন্দ্র করে মারমুখী উত্তেজনা আর ভিড়, এসব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক শান্ত শান্তির মধ্যে ডুবে থাকা কেবল। চতুর্দিক এত স্তব্ধ যে, গাছের পাতা-পড়ার শব্দের মধ্যে

তাদের চাপা গলার ফিসফাস সংলাপ কানে আসবে যেন। এসব প্রার্থনা যখনই মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে—তখন প্রতিটি বাক্যের শেষেই আমি নিজের অজ্ঞাতে উচ্চারণ করেছি—হে ঈশ্বর। অথচ তিনি যে কোনোদিনই আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করবেন না সে-বিষয়ে আমার বিশ্বাস ছিল নিশ্চিত। আমার স্বপ্ন যে এমন ভাবে সার্থক হবে কোনোদিন ভাবিনি।
নমিতা একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল সুরেশের মুখের দিকে। সুরেশকে আজ বড়ো অপরিচিত মনে হচ্ছিল তার। এত অন্তরঙ্গ হয়ে তার অন্তরের কথা সে কোনোদিন শোনায়নি নমিতাকে। জীবনকে কেন্দ্র করে এমন সব কাব্যময় স্বপ্ন সে যে কবে কিভাবে রচনা করেছে একান্ত গোপনে—নমিতা কোনোদিন তার খোঁজ পায়নি। নমিতা শুধু জানতো সে বাসা-বদলের চেষ্টা করছে। সুরেশের প্রতি ভালবাসার সঙ্গে আজ কিছু শ্রদ্ধাও যুক্ত হল নমিতার দৃষ্টিতে। বাইরে এই মানুষটাকে দেখে যত সাধারণ, আর দশজনের মত যতটা ছাপ-মারা কেরানী মনে হয়-ভেতরে সে যে এমন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—নমিতা আজই প্রথম অনুভব করল গভীরভাবে। অবসর পেলেই সুরেশকে প্রায়ই চোখ বুজে ধ্যানীর মতো সময় কাটাতে দেখেছে সে বহুবার। আজ সে বুঝল—সুরেশের ঐভাবে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকার কারণটা কি।
অদ্ভুত এক আবেগে নমিতা তার শরীরটাকে সুরেশের দিকে আরো এগিয়ে দিল। তার মাথাটা সুরেশের বুকের প্রশস্ত ছাতির ওপর লতার মতো ঝুঁকে এল।
সুরেশ বললে—নমি, এই আমি চেয়েছিলাম। তার কণ্ঠস্বর সরু তাবের ঝংকারের মতো কাঁপছিল। নমিতাও মৃদু কণ্ঠে বললে—কি ?
—এই আজকের রাতের মতো রাত। এই পূর্ণিমার আলোর ভেতরে গা ডুবিয়ে বসে থাকা দুজনে।
—শোবে না ?
—না, আমি ভাবছি আজ আর দুজনে কেউ ঘুমোব না।
—সারা রাত জেগে থাকবে ?
—হ্যাঁ, জেগে থাকবো সারা রাত। কি মনে হয় জানো, নমিতা। পৃথিবীতে সারা রাত জেগে থেকে কেউ কোনোদিন জ্যোৎস্নাকে দেখেনি। ভাবতে কষ্ট হয়। পৃথিবীর ওপরে প্লাবনের মতো ছড়িয়ে থাকা এমন অপূর্ব সৌন্দর্যকে অনায়াসে উপেক্ষা করে ঘুমোতে পারে মানুষ ?
—পৃথিবীতে সবাই তো আর তোমার মতো পাগল নয়।
নমিতা যেন জোর করেই খানিকটা কলহ জাগাতে চাইল। সুরেশ প্রত্যুত্তরে বিদ্রূপ করল তাকে।
—ভাগ্যিস দু-চারটে পাগল মাঝে মাঝে জন্মায় পৃথিবীতে। সবাই তোমাদের মতো কেবল উদরটুকু নিয়ে জন্মালে পৃথিবী থেকে গান, কবিতা, ছবি এসব

লোপ পেয়ে যেতো।

নমিতা কয়েকবার হাই তুলে বলে—দেখো বাবু, উদর-ফুদর বুঝি না। আমার ঘুম পেয়েছে। আমি একটু শোব। সারাদিন আজ খুব খাটুনি গেছে।

নমিতা সত্যিই শুয়ে পড়ে। সুরেশেরও শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু একরকম জেদের বশেই সে খোলা জানলার ভেতর দিয়ে সুদূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। চাঁদের চারপাশে ভাঙা-ভাঙা ধূসর মেঘের একটা গোল বূহ। যেন মেঘের সঙ্গে সংঘর্ষে জয়লাভ করেই চাঁদের মুখে আজ এত উজ্জ্বলতা। দ্রুতগামী এক আলোর রথে চড়ে চাঁদ যেন ছুটে যেতে চাইছে এই আকাশ-সীমা পার হয়ে অন্য কোনো এক দেশে। কিন্তু কিছুতেই আকাশের সীমা পার হয়ে যেতে পারছে না।

অনেকক্ষণ জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে সুরেশের চোখের দৃষ্টি আলোর নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। পৃথিবীতে আলো ছাড়া আর কিছু নেই, এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হল তার মনে। সমগ্র পৃথিবী তার দৃষ্টির সামনে একটা বিশাল প্রান্তরের চেহারা নিয়ে ভেসে উঠল। এবং জনমানবহীন সেই প্রান্তরের সীমাহীনতার মাঝখানে সে-ই একমাত্র জীবিতপ্রাণ মানুষ—যার দিকে বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে চাঁদ ক্রমশ নিচে নেমে আসছে। সম্মানিত অতিথিকে অভ্যর্থনা করার রীতি অনুযায়ী সুরেশও আকাশের দিকে এগিয়ে গেল খানিকটা দূর পর্যন্ত। ইতিমধ্যে প্রান্তর ভরে উঠেছে অসংখ্য মানুষের ভিড়ে। তারা প্রায় সকলেই সুরেশের পরিচিত মানুষ। প্রতিবেশী কিংবা আপিসের সহকর্মী। তারা পরস্পর সুরেশের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করে কি যেন বলেছে। মাঝে মাঝে হাসছে খিলখিল করে। সুরেশ বুঝল—ওরা ঈর্ষান্বিত হয়েছে ওর অসামান্য সৌভাগ্যে। সুরেশ তাতে খুশিই হল মনে মনে। গৌরবান্বিত বোধ করল নিজেকে। চাঁদ এখনও কিছুটা দূরে। দেখা হলেই ব্যাপারটা সে বুঝিয়ে বলবে চাঁদকে—স্থির করল।

মাঝরাত্রে নমিতার একবার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখতে পেল সুরেশ দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে ঘাড় কুঁজো হয়ে খোলা জানলার সামনে বসে ঘুমোচ্ছে। নমিতা তাকে যথাস্থানে শুইয়ে দিল। সুরেশের শরীরটা তখন ঘুমে অবশ ও আচ্ছন্ন।

প্রভাতে ঘুম ভাঙার পর সুরেশ তার রাত্রির স্বপ্নের বিবরণ ভুলে গেল বটে কিন্তু সারা স্বপ্নের নির্যাস হিসেবে বিচিত্র আনন্দের একরকম সূক্ষ্ম অনুভূতি তাকে সারা দিন উৎফুল্ল করে রাখল। মাঝে মাঝে সুগন্ধী কেশ তৈল মেখে স্নান করার পর নিশ্বাসের বাতাস সেই সুঘ্রাণে আমোদিত হয়ে উঠলে এমনি অভিভূত হয়ে পড়ে সে অন্তরে। সুরেশের কেবলই মনে হতে লাগল জীবনে এমন এক অনির্বচনীয় কিছু সে অর্জন করেছে কিংবা আবিষ্কার করেছে—যার অপরিমেয়

মূল্য আর কেউ বুঝবে না। সারা দিনের কাজের মধ্যে তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে সন্ধ্যার প্রতীক্ষায়। আকাশ ভরা জ্যোৎস্নার আলো যখন জানলা ডিঙিয়ে তার বিছানার ওপর গা এলিয়ে ঢলে পড়ে তখন বিছানাটাকে মনে হয় যেন রুপোলী এক সরোবর। সুরেশের ইচ্ছে করে তার জল গণ্ডূষ ভরে ক্রমাগত পান করতে। এক একদিন নমিতাকে টানতে টানতে এনে বসিয়ে দেয় জানলার ধারে। কড়া হুকুমের ভঙ্গিতে বলে—এক পা উঠবে না ওখান থেকে। ভারী গিন্নী হয়ে উঠেছ, না? কেবল রান্নাঘর আর ঘুঁটে আর কয়লা আর ডালের ফোড়ন আর লঙ্কাবাটা। শুধু পেটে খেয়ে বেঁচে থাকাটাই যদি জীবন হোত—তাহলে পঞ্চান্ন টাকা দিয়ে ঘর ভাড়া করে না থেকে বন-বাদাড়ে পড়ে থাকলেই চলতো।

নমিতা সুরেশের ব্যবহারে বিভ্রান্ত হয়ে বলে—আচ্ছা, কী সব ছেলেমানুষী হচ্ছে বলো তো। রান্না-বান্না-র পাট চুকিয়ে তারপর এসে বসছি না হয় নিশ্চিন্তে।

সুরেশ বলে—ছেড়ে দিতে পারি এক শর্তে। বলো আজ রাত্রে ঘুমোবো না।

আপাতত নিষ্কৃতি পাবার আগ্রহে নমিতা বলে—আচ্ছা, আচ্ছা।

আকাশ শুধুমাত্র শুক্লপক্ষের দাস নয়। কৃষ্ণপক্ষও তার আর এক প্রভু। জ্যোৎস্নার আলো দিনে দিনে কমতে কমতে একদিন ঘোর অমাবস্যায় আকাশ ভরে উঠল। সুরেশের শোবার ঘরের খোলা জানলার বাইরে থেকে লুপ্ত হল রাত্রির রূপবতী পৃথিবী। সারা রাত না হলেও গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকার মতো দৃষ্টি তার সজাগ থাকলেও তাকে জাগিয়ে রাখার মতো দৃশ্যের অভাবে নাক ডেকে ঘুমিয়ে আসন্ন রাত্রিগুলোকে নিছক অপব্যয় করার বেদনায় প্রতিদিনই তার মনে একরকমের বিরক্তি ও বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকলো। এবং নিজের ভেতরকার বেদনা ক্রমশ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে থাকলো এই ভেবে যে—পৃথিবীর মানুষ আলোর এমন স্বর্গীয় সৌন্দর্যকে বাদ দিয়ে অনায়াসে বাঁচছে কি করে। তার যেন মনে হলো—আলোর জন্যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যদি তার মত উগ্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেত—তাহলে বিধাতা বাধ্য হতেন তার এই প্রিয় পক্ষটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতে।

একদিন শোবার সময় সুরেশ মাথার ওপরে ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে রাখে। নমিতা শোবার আগে আলোটা নিভিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুরেশ জেগে ওঠে।

—আলো নিভিও না।

—সে কি। ঘুমোব তো এখন। সারা রাত কি আলো জেবলে ঘুমোব না কি?

—হ্যাঁ, জ্বলুক। অন্ধকারের মধ্যে শুয়ে থাকতে আর ভালো লাগে না আমার। তুমি পাশে শুয়ে থাকো। অথচ মনে হয় যেন পাশে নেই। নমিতার কাছে সুরেশের এই সব ছেলেমানুষী বাক্য ও ব্যবহার সম্পূর্ণ নতুন। পুরনো বাড়িতে কোনোদিন শোনেনি বা অনুভবও করেনি। নতুন বাসায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

বিবাহের পর থেকে তিন বছর ধরে চেনা মানুষটা যেন খোলস পাল্টে নতুন এক ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। নমিতা জানে—প্রতিবাদ বা যুক্তি দিয়ে সুরেশকে নিবৃত্ত করা যাবে না। মাথার ওপরে ঝাঁঝালো আলো জ্বালিয়ে রেখে চোখের পাতা এক করা যাবে না জেনেও নমিতা আলো নেভায় না। কেবল বলে—আলো জেলে যদি ঘুমোতেই হয়—সে কি এমনি একশো পাওয়ারের বাল্‌ব্‌ নাকি ?
সুরেশ বলে—জানি গো জানি। এ মাসের মাইনেটা পাই। তার পরেই দেখবে নীল হয়ে গেছে এ-ঘরের আলো।

* * *

একদিন সহসা অকাল বর্ষণ নামল। সারাদিন ঝিম ঝিম করে বৃষ্টির একটানা ছিঁচকাঁদুনেপনা রাত্রের দিকে সহসা যেন সান্ত্বনাহীন শোকের তীব্রতায় ঝম-ঝম করে বেজে উঠল। আপিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় সুরেশকে ভিজতে হয়েছে কিছুটা। সম্ভবত শরীরের ক্লান্তির জন্যেই আজ অন্য দিনের চেয়ে একটু তাড়াতাড়িই তন্দ্রা নেমে এসেছিল সুরেশের চোখে। নমিতার শরীরও ঘুমে ক্লান্ত। সহসা আধো ঘুমের মধ্যেই সুরেশ একটা বিচিত্র আওয়াজ শুনতে পেয়ে উঠে বসল। কিছুক্ষণ আওয়াজটার দিকে কান পেতে রেখে বুঝতে পারল সে যা ভেবেছে তাই-ই। হঠাৎ এক অদ্ভুত রকম খুশি ঢেউ-এর মতো দুলে উঠল তার মনের মধ্যে। দ্রুত ঠেলা দিয়ে সে নমিতাকে ডেকে তুলল।
নমিতা খানিকটা বিরক্তিসহ চোখ মেলে তাকালে সুরেশ বলে—শুনতে পাচ্ছ কিছু ?
—কি ?
—কিছু শুনতে পাচ্ছ না ?
—না তো।
—ব্যাঙ ডাকছে শুনতে পাচ্ছ না। কী অদ্ভুত ব্যাপার বলো তো কলকাতায় বসে কখনো ব্যাঙের ডাক শুনেছো এর আগে। ব্যাঙের ডাক শুনলেই আমার গ্রামের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। মনটা ভীষণ খালি খালি লাগে। জীবন থেকে যেন কত কি হারিয়ে গেছে মনে হয়।
কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে সুরেশ। নমিতা বলে—বেশ ঘুমটা এসেছিল—কোথায় কি ব্যাঙ ডাকছে বলে ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে। নমিতা পাশ ফিরে শোয়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর সুরেশ নমিতাকে ডাকে—ঘুমোলে ? নমিতা মোটা গলায় একটা অস্পষ্ট সাড়া দেয়। অনেক দিনের আবদ্ধ জীবনের গুমোট ভেঙে আজ হঠাৎ এমনভাবে কিছু স্মৃতির বর্ষা নেমে এসেছে তার অন্তরে যা সুরেশ ইচ্ছে করলেই রোধ করতে পারে না। নিদ্রিতা নমিতাকে জাগ্রত শ্রোতা ভেবে নিয়ে তাই সে অনায়াসে তাকে সম্বোধন করে—জানো নমিতা, ছেলেবেলায় কী ভীষণ চোর ছিলাম আমি। এমন ধূর্ত চোর ছিলাম যে কেউ কোনোদিন ধরতে পারেনি।

ছেলেবেলায় গাছ, ফুল আর বাগান ছিল আমার জীবন। আমার বাগানে যত গাছ এত রকমারী গাছ গ্রামের আর কারো ছিল না। আর আমি গাছের সংখ্যা বাড়িয়ে ছিলাম চুরি করে করে। বর্ষার দিনের সন্ধ্যেবেলাটি ঘনিয়ে এলেই গায়ে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়তাম ভিজে ভিজে। কার বাড়ি থেকে কোন গাছটি কোনখান থেকে কিভাবে উপড়ে নিতে হবে সে-সব জানা ছিল আমার। আমি এমনভাবে জড়ো-সড়ো পাকিয়ে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হতাম যাতে লোকের ভাবতে অসুবিধে হত না যে বৃষ্টিতে আটকে গিয়ে এইখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি। গ্রামের লোকজন সকলেই তো পরিচিত। তারা দেখতে পেলে ভেতরে ডাকতো। আমি যেতাম না। বৃষ্টিটা একটু কমলেই এখুনি চলে যাবো—এই বলে। তারপর পথের লোকজন একটু কমে এলে, ঘরের লোকজন ঘরের ভেতরেই ব্যস্ত হয়ে আছে বুঝতে পারলে, আমার প্রয়োজনীয় গাছটি যথাস্থান থেকে উপড়ে নিয়ে চাদরের আড়ালে লুকিয়ে কাদা-জল ডিঙিয়ে দৌড়ে পালাতাম। বাগানে একটা করে গাছের সংখ্যা বাড়লে মনে কী আনন্দই না হোত। আমি যেন এক রাজার মত ঐশ্বর্যশালী।

সুরেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে যায় আবার। বন্ধ ও অন্ধকার ঘরের ভেতরে আলোর মৃদু চমকের দিকে তাকিয়ে সে বুঝে নেয় আকাশে প্রখর বিদ্যুতের খেলা চলছে। ভিজে বাতাস কিছুটা শীতের আমেজ সৃষ্টি করেছে ইতিমধ্যে। সেটা অবশ্য শরীরের পক্ষে বেশ আরামদায়কই। কিন্তু এসব ছাড়াও সুরেশ যেন অতিরিক্ত আরও কিছু অনুভব করতে থাকে। ভিজে বাতাস তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করার জন্যে যেন কত দূরের থেকে বহন করে নিয়ে আসছে ভিজে ফুলের গন্ধ। সে গন্ধ রজনীগন্ধা কিংবা বেল যুঁই যে-কোনোটারই হতে পারে। ঠিক কোনটা সুরেশ বুঝতে পারে না। এবং বুঝতে চেষ্টা করে না যে এ-গন্ধ সত্যিই বাস্তবের না স্মৃতির।

সুরেশ আবার স্বগতোক্তির মতো বলতে থাকে—জান নমিতা, সবই আমি যা-যা চেয়েছিলাম তাইই পেয়েছি। ফাঁকা জায়গায় বাড়ি, খোলা আকাশ, আলো বাতাস, নির্জনতা, ঘাসে ঘাসে পা ফেলে হেঁটে যাওয়ার পথ সব কিছুই মিলেছে আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী। কিন্তু একটা বাসনা এখনো মেটেনি। কলকাতায় যখন প্রথম আসি তখন থেকেই আমি ভেবে রেখেছিলাম যে-বাড়িতে আমি যাবো—তার সামনে বাগান থাকবে ফুলের। শহরের সঙ্গে পরিচয়ের পর সে ইচ্ছার সাময়িক জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সেটা মরে যায়নি। নতুন বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সময় চেষ্টা করেছিলাম যাতে বাড়ির ভেতরে ছোট্ট একটু উঠোন থাকে। সেখানে ফলের গাছ লাগাবো মাটির টবে। কিন্তু সে-আশা মিটলো না। তবে একেবারেই যে মিটলো না তা নয়। বাড়িওলার সঙ্গে আমার কথা হয়ে আছে—তিনি যখন বাড়িটা দোতলা করবেন আমাকে দোতলাটা দেবেন। তখন আমি ছাদটা পেয়ে

যাব। ছাদ জুড়ে বাগান সাজাবো ফুলের। আমার সবচেয়ে প্রিয় ফুল হল—বেল। নমিতা ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শোয়। তার একখানা হাত সুরেশের বুকের ওপরে এসে পড়ে। সুরেশ সেই হাতখানাকে দুহাতে বুকে চেপে বলে—তোমার সবচেয়ে প্রিয় কোন্ ফুল, নমিতা?
নমিতার কাছ থেকে কোনো জবাব আসে না। কেবল শব্দ পাওয়া যায় নাক-ডাকার। এতক্ষণ ধরে নাক ডাকিয়েই ঘুমোচ্ছিল সে। সে-আওয়াজটাকেও সুরেশ ব্যাঙের ডাক মনে করেছিল কিনা কে জানে।

* * *

দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস পার হয়ে গেল। ইতিমধ্যে এ-অঞ্চলের আশপাশে কয়েকটি নতুন বাড়ি তৈরি হতে শুরু হয়েছে। বাড়ির ভিত দেখেই আন্দাজ করা যায় যাঁরা বাড়ির মালিক তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে ধনী। কেননা একবার খোঁজ নিয়ে সুরেশ জেনেছিল জমির দর প্রায় প্রতিদিনই এখানে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে বাড়তে কাঠা দাঁড়িয়েছে দশ হাজারে। এসব শুনে সুরেশ খুব খুশি হয় অন্তরে। এবং বাড়ির সংখ্যা যত বাড়তে থাকে—তার খুশির পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায়। তার নিজের বাড়িটা যতই ছোট হোক, ক্ষুদ্র হোক, স্থান মাহাত্ম্যকে তো ভোলা যায় না। তা ছাড়া এইসব ধনীরাই তো তাঁর প্রতিবেশী হবেন আজ বাদে কাল। চতুর্দিকে আরও বাড়ি উঠে উঠে যখন জায়গাটা একটা সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত অঞ্চল বলে গণ্য হবে—তখন এখানকার অন্যতম বাসিন্দা হিসেবে তারও তো গর্ব করার একটা অধিকার দেখা দেবে।
একদিন আপিস থেকে ফিরে সুরেশ শুনল তার পাশের ফাঁকা জায়গাটা নাকি কারা এসে আজ মাপ-জোক করে গেছে। সুরেশ উল্লসিত হয় শুনে। নমিতাকে ঠাট্টা করে বলে—বেল পাকলে কাকের কি?
নমিতা না বুঝে প্রশ্ন করে—তার মানে?
—তার মানে বাড়ি উঠলে তোমারই সুখ। তোমারই দুপুর-কাটানোর সঙ্গী জুটবে। এখন গল্প করো ঘুঁটেওয়ালীদের সঙ্গে, তখন করবে বড়লোকের বাড়ির-বৌ-ঝিদের সঙ্গে!
একদিন আপিস থেকে ফিরে বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে যে মহিলাটি এসে কপাট খুলে দিল সুরেশ তাকে চেনে না। ঘরের ভিতরে ঢুকে সুরেশ দেখল নমিতা বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। অপরিচিত মহিলাটি ফিরে এসে নমিতার শিয়রে বসে পাখার বাতাস করতে লাগল। সুরেশ কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো তাকিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত কিছু বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে ওর?
মেয়েটি জবাব দিলে—বমি করেছে দুপুর থেকে দশ বারো বার।
—বমি? কেন বদহজম হয়েছিল নাকি?
মেয়েটি হেসে ফেলল। হাসির ধরন দেখে খেয়াল হল সুরেশের ব্যাপার কি। তার নিজেরও হাসি পেল নিজেরই বোকামিতে। কিন্তু মনের আনন্দকে একেবারে

গোপন করেই সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিল। কয়েকবার দেখেছে সে বটে একে যাতায়াতের পথে। দুপুরবেলা পাড়ার যে ঘুঁটেওয়ালীটি রোজ গল্প করতে আসে এ নিশ্চয়ই সে। এরই নাম তাহলে রামকলিয়া। বেশ সুসভ্য মেয়েটি তো। চট্ করে কথাবার্তা শুনে সহজে বোঝা যায় না হিন্দুস্থানী বলে।

বিকেলের দিকে নমিতার ঘুম ভাঙল। শরীরটা তার একদিনেই বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছে। মন যতই খুশি হোক না কেন, সুরেশ খুব বিপন্ন বোধ করল নমিতার অসুস্থতায়। নমিতা অবশ্য মনের জোর দেখিয়ে বললে—অত ভাবছো কেন বলো তো। দু-চার দিন একটু কষ্ট হবে। বমি তো চিরকাল হবে না।

সুরেশ বলে—অন্তত ক-মাসের জন্যে একটা ঠিকে ঝি রেখে দিই।

নমিতা বলে—ঝি রাখার দরকার নেই। তার চেয়ে তুমি বরং মাকে খবরটা দাও। সবিতাকে পাঠিয়ে দিক কিছুদিনের জন্যে।

সবিতা সুরেশের ছোট শালী। সবিতা তার দিদির বাড়িতে কয়েকটা দিন থাকার পর বলে—আমার এখানে থাকতে ভালো লাগছে না দিদি। তুমি থাকো কি করে? এমন ফাঁকা জঙ্গুলে জায়গা। একটা সমবয়সী মেয়ে নেই—একি আবার একটা জায়গা। ঠিক যেন গ্রামের মতো।

নমিতা সুরেশকে বলে—তোমার ছোট শালী কি বলে শুনেছ? সুরেশ সব শুনে বলে—হ্যাঁ এ আবার একটা জায়গা। দিনরাত গাড়ি ঘোড়ার ঘ্যাড় ঘ্যাড় নেই, রাস্তায় পা বাড়ালে গাড়ি চাপা পড়ার ভয় নেই, এঁদো গলি, ঘুঁটের ধোয়া, পচা ডাস্টবিন নেই, দরজা জানলা খুলে দিলে ঘরের ভেতর এক ছটাকও অন্ধকার ঢোকে না, রকে রকে বখাটে ছেলেদের আড্ডা-গুলতানি নেই, রাত্রে গুণ্ডাদের সোডার বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি নেই—এ আবার একটা জায়গা।

সেই জন্যেই তো এখানে জমির কাঠা দশ হাজার বারো হাজার। সবিতা তবু তর্ক করে। বলে—শুধু খানিকটা আলো বাতাস আর গাছপালা থাকলেই মানুষ বুঝি সুখী হয়ে যায়। এখানে কাছাকাছি স্কুল আছে? সিনেমা আছে? ভালো একটা কাপড়ের দোকান আছে? সেদিন একটা দোকানে উল কিনতে গিয়ে পেলাম না। এই তো এখানকার দোকানের ছিরি!

সুরেশ বলে—সিনেমা থিয়েটার কিংবা কাপড় উল এসব মানুষের প্রত্যেকদিনের দরকার নয়। প্রত্যেক দিনের প্রয়োজন হল আলো-বাতাসটাই। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে প্রত্যেক শিশু যদি বড়ো হয়—তারা নিরোগ হয়। তা হয় না বলেই শহরে আজকাল যে সব ভয়ংকর রোগ দেখা দিয়েছে তাতে শিশুরাই আক্রান্ত হচ্ছে বেশি। কিছুদিন ধরে খবরের কাগজে একটা রোগের কথা নিয়ে খুব লেখালেখি চলেছে। কি যেন নাম রোগটার—পোলিও না কি যেন। তাতে একদিনের অসুখে শিশুরা মারা যাচ্ছে। ডাক্তাররা বলছে আলো-

বাতাসহীন অন্ধকার অপরিষ্কার পরিবেশ এই রোগের একটা প্রধান কারণ। অবশ্য পুষ্টিযুক্ত খাদ্যের অভাবটাও কারণ হিসাবে এর পিছনে রয়েছে, যেমন রয়েছে বড়লোকদের বাড়িতে অতিরিক্ত পরিমাণে খাদ্যের প্রাচুর্য। নমিতা আগে সুরেশের এসব কথাকে খুব একটা মূল্য দেয়নি। ভাবাবেগ ভেবে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু গর্ভে সন্তান আসার পর থেকে নমিতার স্বভাব পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে ক্রমশ। সুরেশের কথা সে কান পেতে শোনে। শিশুদের লালনপালনের পক্ষে এই জায়গাটা যে অনেক নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন এবং অবাধ উন্মুক্ত আলো বাতাসের প্রাচুর্য যে শিশুদের শরীর ও মনের পূর্ণাঙ্গ পুষ্টির পক্ষে পরম উপযোগী এবিষয়ে সুরেশের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে সবিতার সঙ্গে তর্ক করে। পশ্চিমের খোলা জানালার ধারে এসে বসলে খানিক দূরের একসার শিরীষ গাছের ছবি চোখে পড়ে। সবিতা মাঝে মাঝে দেখতে পায় যেন একটা সুন্দর ফুটফুটে ছেলে দুষ্টুমি করে ছুটে পালিয়ে ঐ সব গাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে লুকাচ্ছে। পূবের জানালা দিয়ে সকালের কাঁচা হলুদ রঙের রোদ ঘরের মেঝের যেখানটিতে লুটিয়ে পড়ে, নমিতার মাতৃত্ব-আকাঙ্ক্ষী মন মাঝে মাঝে সেখানে অপরূপ এক শিশুর শায়িত ও নিদ্রিত মুখের ছবি রচনা করে।

কিছুদিন থাকার পর নমিতার শরীরের দুর্বলতার ভার কেটে গেলে সবিতা চলে যায়, তার পড়াশোনা ক্ষতি হবে বলে। আবার আগের মতো রামকলিয়াকে নিয়েই দুপুর কাটে নমিতার। পাড়া প্রতিবেশীদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে এসে গল্প করে যায়। নমিতার মাও এসেছে দু-একবার। একদিন রামকলিয়া এসে গল্প করল কোথায় যেন ঘুঁটে বিক্রি করতে গিয়ে শুনেছে এক বাড়ির দুটি ছোট ছেলে ও একটি মেয়েকে নিয়ে বাড়ির ঝি ফিরছিল স্কুল থেকে। রাস্তা পার হতে গিয়ে তিনজন একদম গাড়ির চাকায় থেঁতলে মিশে গেছে পথে। বেঁচে গেছে কেবল ছোট মেয়েটা। শুনে শিউরে উঠল নমিতার সর্বাঙ্গ। মৃত শিশু দুটির জননীর কথা ভেবে তার অন্তর অশ্রুসিক্ত বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল কয়েকবার। সমস্ত শুনে সুরেশ তাকে সান্ত্বনা দিল ওসব কথা ভাবতে নেই এখন। মন হাসি খুশি রাখতে হবে সর্বদা। মায়ের চিন্তা-ভাবনার প্রভাবের ওপরই শিশুর প্রাথমিক বিকাশ বা গঠন নির্ভর করে।

মাসখানেক পরের এক সকালে সুরেশের বাড়ির দুইপাশ লোকজন কুলি-মজুর শাবল গাঁইতি ইঁট কাঠ বাঁশ ইত্যাদির সমারোহে সশব্দে জেগে উঠল। সুরেশ একদিন খোঁজ নিয়ে জানল দুই বন্ধু বাড়ি করছে তার বাড়ির দু-পাশে। একই ডিজাইনের বাড়ি। মাটির গর্ত করা পরিসরটা দেখে সুরেশ বুঝল যে বাড়ি দুটি হবে বিরাট। এবং কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই সুরেশ আরও বেশি করে অনুভব করতে পারল যে বাড়ির মালিকরা কী পরিমাণ অর্থবান। যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের বলে বাড়ি দুটো মাটির ওপর থেকে আকাশের

দিকে রাতারাতি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠছে। সুরেশ নানা জায়গায় গল্প করে বেড়ায় বাড়ি দুটির। নতুন বাড়ি এ-অঞ্চলে প্রত্যেকদিনই একটা করে গজিয়ে উঠছে, যে দিকে তাকাবে সেদিকেই। কিন্তু এ-রকম বাড়ি লাখে একটা হয়। এসব কথার মধ্যে সুরেশ তার নিজের সম্পর্কেও একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব প্রকাশ করে থাকে। যেহেতু বাড়ি দুটি তারই গৃহ-সংলগ্ন।

একদিন নমিতা আর্তকণ্ঠে সুরেশকে জানালে—একি হোল! বাড়িতে আর আলো ঢোকে না দেখেছো? আলো-আলো করে তোমার যে এত চেঁচামেচি, আহ্লাদ, অহংকার, সব তো গেল।

নমিতা অবাক হয় সুরেশের মুখে কোনো রকম ভাবান্তর না দেখে। সুরেশ বলে—তুমি কি ভেবেছ আমি আগে ভাবিনি দু-পাশে বাড়ি উঠলে ঘরের ভেতরে আলো ঢোকা বন্ধ হবে। আমরা কি চিরকাল এই একতলাতেই থাকবো নাকি। বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথাই হয়ে আছে—দোতলা উঠলে সেটা আমাকেই দেবে।

—কবে উঠবে দোতলা? আমার বাচচা হবার আগে তো আর নয়।

সুরেশ বলে—আমি গিয়ে দেখা করবো দু-একদিনের মধ্যে।

বাড়িওয়ালার বাড়ি শ্যামবাজারে। আপিস ফেরতা সুরেশ গিয়ে একদিন দেখা করে হরিপদবাবুর সঙ্গে। সাদর আপ্যায়ন করে হরিপদবাবু বলেন—আসুন সুরেশবাবু। আপনার সঙ্গে ক-দিন থেকেই দেখা করবো ভাবছি। যাক্ আপনি এসে পড়ে বৃদ্ধ মানুষের খানিকটা পরিশ্রম বাঁচিয়েছেন। বড্ড ভুগছি মশাই প্রেসারে। আর বয়সও তো হোল। স্ট্রাগল করছি মশাই সেই ছোটবেলা থেকে। মানুষের তো একটাই শরীর। কত আর সইবে বলুন। তারপর বলুন আপনার কি খবর?

সুরেশ বলে—খবর ভালোই। এই এসেছিলুম আপনার কাছে একবার। আপনি বলেছিলেন মাস পাঁচেকের মধ্যে দোতলাটা শুরু করবেন। তারই খোঁজ নিতে এসেছিলুম দেরি হচ্ছে দেখে। আপনার ঐ বাড়ির দু-পাশে দুটো বাড়ি উঠছে বিরাট—সেটা জানেন বোধহয়। তার ফলে আমার ঘরের একতলার আলো-বাতাসের পথটা একদম বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ কি জানেন—এই সময়েই আলো-বাতাসের দরকারটা বেশি হয়ে পড়েছে। আমি বাবা হতে চলেছি শিগগিরই।

হরিপদবাবু বলেন—বাঃ, এ তো খুবই সুখের কথা। আনন্দের খবর শোনালেন মশাই। স্বামী-স্ত্রী দুজনে ছিলেন। বাড়িতে নতুন একটি লোক আসছে। ছোট ছেলেমেয়ে না থাকলে বাড়ি মানায় না। ভালো। ভালো। হ্যাঁ, দোতলার কথা বলছিলেন না? সেটার একটা ব্যবস্থা করতেই তো আপনার কাছে যাব যাব করছিলুম কয়েকদিন থেকে। দেখুন মশাই একটু বিপদে পড়ে গেছি। মাস দুয়েক হল ছোট মেয়েটির বিয়ে দিয়েছি। ঐটি ছিল আমার শেষ কাজ। সেদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। কিন্তু টাকা পয়সা যা খরচ হয়েছে,

তাতে একদম সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। তা ধরুন কম করে হাজার তিরিশেক টাকা খরচ হয়েছে সর্বসমেত। মানে যাকে বলে কপর্দকহীন সেইরকম হয়েছে আমার অবস্থা। অথচ দোতলাটা করে ফেলা দরকার। আপনারও দরকার। আমারও দরকার। তা আমি একটা প্রস্তাব করছিলুম আপনার কাছে। আপনি যদি আমার এই দুদিনে হাজার তিনেক টাকা 'অ্যাডভান্স' করেন তাহলে কাজটা শুরু করে দিই। টাকাটা আপনার ভাড়া হিসেবেই মাসে মাসে বাদ যাবে। তা ধরুন দোতলার ভাড়া যদি মাসে আমি কম করে আপনার কাছ থেকে একশ টাকা নিই, তাহলে আপনি এখন আড়াই বছর ভাড়া দেওয়ার হাত থেকে নিশ্চিন্ত হচ্ছেন।

সুরেশের মুখ থেকে আর্তনাদের মতো একটা শব্দ বেরোয়।

— একশ টাকা ভাড়া বলছেন দোতলার ?

হরিপদবাবু বললেন — কম করেই বলেছি একশ টাকা। দোতলার দুখানা ঘর, কল-পায়খানা সব সেপারেট সিস্টেম — একশ টাকা তো আজকালকার বাজারে খুবই কম বলুন। গুজরাটি-মাদ্রাজীরা তো ভাড়ার জন্যে ঘুর-ঘুর করছে। দেড়শ টাকা এমনকি দুশো টাকা বললেও এখুনি এক কথায় নিয়ে নেবে। কিন্তু আমি মশাই বাঙালী ছাড়া কাউকে ভাড়া দেব না — তার জন্যে আমার যত ক্ষতিই হোক। দেশটা অবাঙালী গ্রাস করে নিতে বসেছে। টাকাটাই তো বড়ো কথা নয়। কি বলেন !

সুরেশ উঠে আসার আগে বলে — আমি একটু ভেবে আপনাকে জানাবো।

বাইরে বেরিয়ে প্রচন্ড রোদের তাপে তার সর্বাঙ্গ ঘামতে থাকে। এবং ঘামের বিন্দুর মতোই ছোট ছোট অশ্রুর দানা তার চোখের ভেতরে টলমল করছে মনে হল। এক অসহায় যন্ত্রণায় পথের ওপরেই সে ভেঙে পড়বে বোধ হলো তার। নিজেকে কোনোমতে টানতে টানতে সে বাড়ির দিকে এগিয়ে নিয়ে এল। নমিতাকে কোনো কথা এখন জানাবে না। নমিতা আঘাত পেলে তার গর্ভের সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সেদিন রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল সুরেশ। পূর্ণিমার চাঁদ তার জানলার কাছে নেমে এসে বললে — আমার কাছে থাকবি চল। অনেক আলো বাতাস পাবি। তারপর সুরেশের বাড়িটা আকাশের দিকে পাখির মতো ডানা ছড়িয়ে উড়ে চলল।

নিশীথের একটা খাপছাড়া দিন

সামনের মাসে অনেকগুলো বিয়ের তারিখ। সেই কথা ভেবেই দোকানের জন্যে নতুন কিছু আধুনিক বাংলা ও হিন্দি গানের রেকর্ড কিনতে কলকাতায় যাচ্ছিল নিশীথ। স্টেশনের কাছেই তার দোকান। নাম সুরমন্দির। বিয়ে, বৌভাত, ফুটবল ম্যাচ, পঁচিশে বৈশাখ, দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজো, ইলেকশান আর জনসভা উপলক্ষে মাইক ভাড়া দেওয়ার দোকান। আজকাল সস্তা দামের ট্রানজিস্টার রেডিও-ও বেশ বিক্রি হয়। মফঃস্বলেও ট্রানজিস্টার হাতে ঝুলিয়ে হাওয়া খেতে বেড়ানোর ফ্যাশান সংক্রামিত হওয়ায় নিশীথের ব্যবসা বেশ জেঁকে উঠেছে। আগে একাই ছিল দোকানের মালিক ও কর্মচারী। মাথায় রোদ-বৃষ্টি আর হাতে-কাঁধে ভারী ভারী লোহা-লক্কড়ের যন্ত্রপাতি নিয়ে ছুটোছুটি করতে করতে হাড়ে কালি পড়ে গিয়েছিল। এখন দু'জন কর্মচারী রেখেছে। ঘরে পুঁজি জমেছে কিছু। গায়ে মাংস। জৌলুস ঝিলিক দিয়েছে চেহারায়। নিশীথের বয়স অল্পই। সদ্য যুবক। তবে ব্যবসাদার হওয়ার ফলে কথাবার্তায় বেশ একটু ভারিক্কি চাল আছে। আজকাল পোষাক-আষাকেও বেশ শৌখিনতা

ফুটছে। বেশির ভাগ সময়ে গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবী আর চওড়া কালো পাড় ধুতি পরে থাকে। আঙুলে 'N' লেখা লম্বাটে একটা সোনার আংটি। হাতে সোনার অথবা সোনালি রঙের রিস্টওয়াচ। মাথার চুলে অনেকগুলো ঢেউ। সব সময়ে মুখে পান থাকে। কি একটা কোম্পানির বিশেষ জর্দা ছাড়া খায় না। কারো সঙ্গে কথা বলার আগে দোকানের বাইরে রাস্তায় এসে পিক্ ফেলে নেয়। কিছুদিন হল চশমা পরছে। চোখের অসুখের জন্যে নয়। চোখের অলংকার হিসেবে। গরম পড়েছে বলে, আজকাল চশমার কাচে কালো এ্যাটাচি এঁটে নেয়। তখন তাকে বেশ ফিল্ম স্টারের মত দেখতে লাগে। তাকে দেখে আশপাশের লোকজনের মনে যে ঐ রকম একটা ধারণা হতে পারে বা হয়, সে সম্বন্ধে নিশীথও অজ্ঞ বা উদাসীন নয়।

কলকাতায় যাবার জন্যে স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল নিশীথ। এই সময় বিনোদবাবু নিশীথের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর ভঙ্গিতে ব্যস্ততা।

—এই যে বাবা নিশীথ তোমাকে খুঁজছিলাম।

সদ্য একটা পান খেয়েছে জর্দা সহযোগে। এখুনি পিক্ ফেলবে না। তাই দুই ঠোঁট টিপে মুখের ভিতরে একটা অদ্ভুত অস্পষ্ট আওয়াজ করে নিশীথ বলে—বলুন।

—কোলকাতায় যাচ্ছ শুনলাম। যাচ্ছ যখন, আমার একটা উপকার করে দাও তবে। আনন্দবাজার কাগজের আপিসে পেঁছে দিয়ে আসতে হবে একটা বিজ্ঞাপন।

আবার নিশীথের বন্ধ মুখের ভিতর থেকে গোঙানির মত একটা আওয়াজ বেরোয়, যার অর্থটা প্রশ্নসূচক—কিসের? অর্থাৎ কিসের বিজ্ঞাপন। বিনোদবাবু কাপড়ের খুঁট দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে বলেন,—জুলির পাত্রের জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি। এছাড়া তো আর উপায় নেই। বিনোদবাবুর কণ্ঠস্বর বড় ক্লান্ত বিষণ্ণ। মানুষটিও বড় ক্লান্ত ও বিষণ্ণ। চেহারা দেখে বোঝা যায় বয়সের নিয়মে নয়, দুর্দশা ও দুশ্চিন্তায় তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন একটু অগ্রিম। সারা কপালে বলি রেখায় দীর্ণ। কোটরগত চোখ। চোয়াড়ে গাল। গালে দিন দুয়েকের না-কামানো গোঁফ-দাড়ি। নাটকে দুঃস্থ মধ্যবিত্ত কোন মানুষ দেখাতে গেলে যেমন সাজানো হয় ঠিক তেমনি। গায়ে ময়লা ফতুয়া থাকার ফলে সেটা আরও স্পষ্ট। ফতুয়ার পকেট থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বিনোদবাবু এগিয়ে দেন নিশীথের দিকে।

—এটা তাহলে রাখ।

তারপর ফতুয়ার গলার কাছের বোতাম খুলে ভিতর দিকের পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে সেটাও এগিয়ে দেন নিশীথের দিকে।

—নিশীথ তখুনি হাত বাড়িয়ে টাকাটা না নিয়ে প্ল্যাটফর্মের ধারের দিকে এগিয়ে

যায়। ফিচ করে একমুখ পিক্ ফেলে দেয় রেললাইনের উপর। আবার ফিরে আসে যথাস্থানে। এবার সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলে।
—ক'দিন আগে কারা যেন দেখতে এসেছিল না ?
বিনোদবাবুর ক্লান্ত ও বিষণ্ণ দেহটা কুঁজো হয়ে যায় এই সময়।
—ওসব কথা আর বোলো না। আসা-যাওয়া তো আছেই। আর সামলাতে পারছি না। আসে, মান-সম্মান রাখার জন্যে খাওয়াতে-দাওয়াতে হয় যতটা সাধ্যি। তারপর সবাই তো দেখি পান চিবোতে চিবোতে 'মেয়ে আমাদের পছন্দ হয়েছে মশাই, মিথ্যে কথা বলব না, আপনার সামনেই জানিয়ে যাচ্ছি, তবে দেনা পাওনার ব্যাপারটা যারা ঠিক করবেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলে চিঠি দেব।' এই বলে সবাই সেই যে যায়—ঐ যাওয়া। এই তো চলেছে বছরাবধি। কাঁহাতক আর সামলাই …বুঝলে না…কপালে আমার অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা লেখা-ছিল—সইছি বাবা…।
আরও কিছুক্ষণ কথা বললে বিনোদবাবু কেঁদে ফেলতে পারেন, এই বুঝে নিশীথ কথা থামিয়ে দেয়।
—ঠিক আছে, কাকা আমি দিয়ে আসব।
—টাকাটা রাখ।
—টাকা থাক। কত লাগবে তা তো জানিনা। যা লাগে আমি দিয়ে দেব। পরে নিয়ে নেবো আপনার কাছ থেকে। আপনি যান। আমি যদি পারি রাত্রে ফেরার পথে দেখা করে যাবে।
বিনোদবাবু চলে যান। নিশীথের মনটা কিছুক্ষণের জন্যে কেমন যেন নরম হয়ে থাকে। আরও একটু জর্দা মুখে দেয় পকেট থেকে ছোট্ট গোল রুপোলি একটা কৌটো বার করে।
জুলিটা সত্যিই বড্ড কষ্ট দিচ্ছে বিনোদ কাকাকে। হতচ্ছাড়া মেয়ে। নিজে ভুগছে। বাপ-মাকে ভোগাচ্ছে! দুর্নামের একশেষ।
জুলিকে নিয়ে নিশীথ আরও বিস্তৃতভাবে কিছু ভাবতে চাইছিল এই মুহূর্তে, কিন্তু দূরে ট্রেনের আওয়াজ পাওয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে হাঁটতে লাগল প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তের দিকে, ঐদিকে দাঁড়ালে খালি কামরা পাওয়া যায়।
খালি কামরা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু গাড়ি ছাড়বার সময় সেটা আর খালি রইল না। নিশীথের মত অন্য যাত্রীরাও তো খালি কামরার খোঁজে ছিল। ছোট্ট কামরা। এক মুহূর্তে সবকটা বসবার জায়গা ভরে গেল। তবু নিশীথ নিজেকে খুব 'লাকি' মনে করল। কারণ সে সব সময়ে কামরার যে কোন একটা কোণে বসতে চায়। এবং আজও সে সেটা পেয়েছে। নিশীথের পরিচিত অনেকেও উঠেছে কামরায়। অধিকাংশই ডেলি প্যাসেঞ্জার। নিশীথের মত দু একজন আছে যারা কলকাতায় যাতায়াত করে মাঝে মাঝে, ব্যবসার প্রয়োজনে।
কামরায় একটু পরেই তাস খেলা শুরু হয়ে গেল, মুখোমুখি চারটে হাঁটুর উপর

তোয়ালে পেতে। নিশীথ দর্শক। দর্শক হিসেবে সেও খেলার ভুল-চুক, ভাল-মন্দের উত্তেজনার মধ্যে ডুবে গেল নিমেষে। যেহেতু সেও একজন তাসুড়ে। গাড়ি হাওড়া স্টেসনে পেঁছিলে বন্ধ হল খেলা। নামতে হল গাড়ি থেকে। গাড়ি থেকে নামবার সময় নিশীথ অনুভব করল এবং দেখল তার বগল ও ঘাড়ে কাছে ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে এঁটে গেছে পাঞ্জাবির একটা বৃহৎ অংশ। স্টেসনে নেমে বুঝতে পারল আজ সৃষ্টিছাড়া গরম পড়েছে। ইস্ আসবার সময় কাঁধে তাকিস রুমালটা দেওয়া হোল না? নতুন একটা কিনতে হবে। স্টেসন পেরিয়ে বাইরে এসে নিশীথ একটু দাঁড়িয়ে ভেবে নিল কোন-কাজটা আগে করবে। মোট তার তিনটে কাজ। শিয়ালদা অঞ্চলের একটা দোকানে গিয়ে কিছু রেকর্ড পছন্দ করা। তারপর বৌবাজারে ওর একটা নির্দিষ্ট হোটেল আছে। সেখানে গিয়ে খাওয়ার পালা চুকনো। প্রত্যেকবার কলকাতায় এলেই দুপুরের শো-এ একটা সিনেমা, মাঝে-মধ্যে থিয়েটারও দেখে থাকে নিশীথ অনেকটা নিয়মমাফিক। সুতরাং আজও দেখবে! সিনেমা। কি সিনেমা? দিলীপ কুমারের কি একটা ছবি খুব 'হিট' করেছে। যদি টিকিট পাওয়া যায়, সেটাই। না হলে যাক্‌গে, আগে তো কলকাতায় যাওয়া যাক, তারপর দেখা যাবে। এখন তো মোটে দশটা।

নিশীথ একটা ট্রামে উঠে পড়লো। শিয়ালদায় নামলো। প্রায় বেলা একটা পর্যন্ত রেকর্ডের দোকানে বসে পঞ্চাশ-ষাটটা রেকর্ড শুনলো, বাছলো, গল্প করলো। তারপর খেতে যাওয়ার জন্যে বৌবাজারের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ল একটা জ্বলজ্বলে সিনেমার 'হোর্ডিং'। হিন্দি ছবির বিজ্ঞাপন। প্রায় নগ্ন নায়িকা শুয়ে আছে স্নানের পোষাকে। পাশে স্নানার্থী নায়ক। দূরে নীল উত্তাল সমুদ্র। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিশীথ সেটা দেখতে লাগল। আর ঠিক সেই সময়ে, তার মনে পড়ে গেল জুলির কথা, বিনোদবাবুর দেওয়া জুলির বিয়ের বিজ্ঞাপনের কথা।

নিশীথ আর দাঁড়াল না। হোটেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে অত্যন্ত বিরক্ত মনে সে ভাবতে লাগল, বিজ্ঞাপন পেঁছে দেবার ঝামেলায় আজ হয়তো তার সিনেমা দেখা হবে না। বিরক্তির কারণ অবশ্য শুধু বিজ্ঞাপন নয়। আজকের সহ্যাতীত গরমও কারণের অন্যতম। শরীরের ভেতরটা যেন পুড়ছে।

হোটেলে খেতে খেতে নিশীথ শেষ পর্যন্ত এমন একটা সিদ্ধান্তে পেঁছিল যাতে মনের বিরক্তি কিছুটা কাটল তার। আনন্দবাজারের আপিস তো এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে। ঐখানে বিজ্ঞাপনটা পৌঁছে দিয়েই মেট্রোয় চলে যাবে সিনেমা দেখতে। ইংরেজী বই দেখার অভ্যেস নেই। কিন্তু কে যেন তাকে এই কদিন আগে বলেছিল মেট্রোয় একটা ছবি দেখানো হচ্ছে—খুব 'নেকেড' সিন আছে তাতে, মেট্রোয় কখনো সে কোন ছবি দেখেনি।

ট্রামে চেপে নিশীথ আসছিল ধর্মতলার দিকে। মৌলালি পেরোতেই নিশীথ শুনতে পেল কে যেন তাকে ডাকছে সামান্য দূরে। নিশীথ তাকিয়ে কোন চেনা মুখ দেখতে পেল না। অথচ কে যেন ডাকছে। তারপর ভিড় ঠেলে একজন তার সামনে এগিয়ে এল।

—কি রে চিনতে পারছিস না ?

নিশীথের সত্যি একটু সময় লাগল মদনকে চিনতে। প্রথম দৃষ্টিতে চিনতে না পারার লজ্জা কাটিয়ে নিয়ে নিশীথ বলল, কি করে চিনবো বল্, তোকে তো কোনদিন এই কাপ্তেনি সাজে দেখিনি। তার ওপর কতদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

টাই-টেরিলিন-পরিহিত মদন বলল—

—তা ঠিক। তোকেও তো আমি চিনতে পারিনি একবার দূরে দাঁড়িয়ে ডেকে ডেকে দেখলাম। দেখলাম নাম শুনে তুই মুখ ঘোরালি। তখন বুঝলাম, হ্যাঁ ঠিক তুই। কলকাতায় আছিস ?

—না।

—তবে ?

—কাজে এসেছি।

—কি করছিস ?

—ব্যবসা।

—কিসের ?

—এই যা হোক্ একটা আর কি। তুই।

—আমি ?

মদন জবাব দেবার আগে গলার টাইটা ঠিক করে নিল।

—আগে তো ছিলাম বার্ড কোম্পানিতে। জানিস বোধহয়।

নিশীথ জানে না। ম্যাট্রিক পাশ করার পর মদন কলকাতায় চলে এসেছিল। তারপর এই পুরনো হয়ে যাওয়া সাত আটটা বছরে মদনের কোন খবরই রাখে না সে। বছর তিন চার আগে মদন একবার গ্রামে গিয়েছিল। সেই শেষ দেখা। তখন নিশীথের ব্যবসা কোনমতে চলছে বা চলতে শুরু করেছে। অল্প একটু সময়ের জন্যে রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল। তখন মদনের গায়ে আজকের মত এত দামী পোশাক ছিল না। নিশীথেরও ছিল না। কথাবার্তা হয়েছিল সামান্যই। ছেলে বেলার কথা। ফুটবল খেলার কথা। ছাত্র জীবনে ওদের দুজনের নাম ডাক ছিল ফুটবল খেলায়। মদন সেণ্টার ফরোয়ার্ড। নিশীথ হাফ ব্যাক। খুব রোগা ছিল তখন নিশীথ। কিন্তু পায়ে ছিল অসম্ভব জোর। বলের গায়ে যেন পাখা গজাতো ওর ঠ্যাঙের মার খেয়ে। নিশীথের শট্ মানেই বল মাঠ পার হয়ে ধানের ক্ষেতে পড়বে। এইরকম সব অতীত স্মৃতিরই চর্চা হয়েছিল বেশি। চাকরির কথা ওঠেনি।

তবু নিশীথ এমনভাবে ঘাড় নাড়ল যেন মদনের চাকরির ব্যাপারটা সে জানতো।
মদন খুব ধীরে ধীরে একটু চিবিয়ে, বেশ একটু মাতব্বরি চালে বলতে লাগল,
—বার্ড ছেড়ে দিলাম। পোষাল না। এখন আমি একটা ব্রিটিশ ফার্মে।
কথাবার্তা হচ্ছে—দেখা যাক কি হয়।
—কিসের ?
—আমাকে 'ফরেনে' পাঠাতে চাইছে।
হঠাৎ মদনকে এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মর্যাদাবান পুরুষ বলে মনে হল নিশীথের। এ যেন তার ছেলেবেলার এক স্কুলের বন্ধু ও সহপাঠী নয়। তারও চেয়ে বড়। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা দূরত্ব ওর জাগল মদন সম্পর্কে। নিশীথ অনেক কিছু বলবে ভেবেছিল। আর বলল না।
—কোথায় নামবি ?
—এ্যাসপ্লানেডে।
ও, আচ্ছা, চল আমিও নামবো।
দুজনেই ট্রাম থেকে নামল এ্যাসপ্লানেডের মোড়ে। মদন নেমেই নিশীথকে প্রশ্ন করলে, কোথায় যাবি ? হাতে সময় আছে ?
নিশীথ ভাবল বলবে, না সময় নেই। কিন্তু বলতে পারল না। মদনের সাহেবি সাজ, হাই পাওয়ারের চশমার ভেতরকার জ্বলজ্বলে চাউনি তাকে বলতে দিল না। নিশীথ নিজের গ্রামের পরিবেশে সবচেয়ে আধুনিক, স্মার্ট, তুখোড় ছেলে নিশীথ মদনের সামনে কি রকম গ্রাম্য হয়ে গেল। নিশীথ বললে, আছে কিছুটা সময়।
মদন তার পিঠে একটা চাপড় মেরে বললে, তবে চল্। অনেকদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল। দিন নয়, বছর। আজ একটু 'সেলিব্রেট' করা যাক্।
'সেলিব্রেট' কথাটার মানে নিশীথ বুঝতে পারল না। শব্দটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। বোধহয় স্কুলে পড়েছিল। কিন্তু মানেটা ঠিক মনে পড়ল না নিশীথের। নিশীথ বাধ্য শিশুর মত মদনের পিছন পিছন চলল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শীতল, অতি সুশীতল একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে যেন স্নান করিয়ে দিল নিশীথকে। ঘরের ভেতরে আলো কম। আলো দিয়ে যেন একটা আলোকিত অন্ধকার তৈরি করা হয়েছে। কি রকম একটা অদ্ভুত অপরিচিত সুস্বাদু গন্ধ সারা ঘরে। নিশীথ অনায়াসে বুঝতে পারল এটা একটা অভিজাত মদের দোকান।
মদনকে ঢুকতে দেখেই ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে দু-তিনটি কণ্ঠস্বর একসঙ্গে তাকে ডাকল। মদন সেই দিকে চলল। আলো-অন্ধকারের ভিতর দিয়ে নিশীথ চলল তার পিছু পিছু। এই রকম রহস্যময় পরিবেশ, উজ্জ্বল, উৎফুল্ল মানুষ, মদের সঙ্গে নানা রকম মাংসের ও সিগারেটের গন্ধে ভারী হয়ে ওঠা ঠাণ্ডা আবদ্ধ

বাতাস, নিশীথের মনে জাগিয়ে তুলল কি রকম একটা অকারণ ভয়, আশংকা, উদ্বেগ আবার কিছুটা অহেতুক চাপা আনন্দও।

মদন কারো সঙ্গে নিশীথের পরিচয় করিয়ে দিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই, অর্থাৎ মদনের অনুরোধে নিশীথের যখন প্রায় আধ গ্লাস বিয়ার খাওয়া হয়ে গেছে, সকলেই নিশীথের সঙ্গে এবং নিশীথও সকলের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। মদনকে দেখে অফিসার গোছের মানুষ সম্পর্কে নিশীথের মনে যে সম্ভ্রমজাত দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, মদনের বন্ধুদের দেখে তা কিন্তু মনে হল না নিশীথের। তারা অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রচুর মদ ও সিগারেট খেল। জোরে জোরে কথা বলল। গলা ফাটিয়ে হাসল। নানা রকম খিস্তি রসিকতা করল। দু-চারটে ইংরেজি কথার ভেজাল ছাড়া তাদের বাকি সব কথাই বেশ স্পষ্ট, নিশীথের বুঝতে কোন অসুবিধে হল না। মদনের বন্ধুদের মধ্যে যে ছেলেটি বা ভদ্রলোকটির গলায় মেরুণ রঙের টাই আঁটা ছিল, সকলের মধ্যে সেই একটু কম বাচাল। তাই সকলেই তাকে খোঁচা মারছিল নানা ভাবে। খোঁচা মারার উদ্দেশ্য মেরুণ-টাই পরা ছেলেটি নাকি খুব 'সিরিয়াসলি' প্রেম করছে। ওদের অবিরল ঠাট্টা ইয়ার্কির হাত থেকে কিছুটা নিস্তার পাবার জন্যে মেরুণ-টাই নিশীথের সঙ্গে কথা বলল নানা রকম। দেশ-পাড়াগাঁয়ে চাল-ডাল ব্যবসা-বাণিজ্য রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে এলোমেলো আলোচনা।

মদনের চার বন্ধুর দল যখন উঠে গেল, নিশীথের বিয়ারের পুরো বোতলটাই তখন নিঃশেষিত। মদন উঠল না। তার তিনদিন ছুটি। ছুটি থাকলেও প্রতিদিনের অভ্যাস মতো এই দোকানে লাঞ্চ-টাইমের আড্ডা দিতে এসেছে আজ। দোকানের ভিড়টাও পাতলা হয়ে এল এই সময়। মদন উঠে গিয়ে জায়গা পাল্‌টে নিশীথের মুখোমুখি বসল একটা সিগারেট ধরিয়ে। এতক্ষণ মদন নিশীথের সঙ্গে কোন কথা বলেনি। এবার সে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে নিশীথের দিকে তাকাল।

—বল, কি খবর?

নিশীথ নিজের ঘড়িতে দেখে নিল তিনটে বারো। ঘরের ভিতরকার ঘুম-পাড়ানো শীতলতা এবং বিয়ারের অল্প নেশায় নিশীথ তার সারা শরীরে অনুভব করছিল একটা সুখী, আয়েসী অবসাদ। বাইরে পৃথিবীটা পুড়ছে। এই রকম ঠান্ডা ঘরে, নরম সোফায় হেলান দিয়ে বসে থাকার আরাম কে না চায়। কিন্তু অনেকগুলো জরুরী কাজ আছে। নিশীথ বললে—

—কি আর খবর। এবার উঠবো।

—কোথায় উঠবি। বোস্, বোস্। আরেকটা বিয়ার খা। আজ বিয়ার খাবারই দিন। কি কাজ? নে, সিগারেট খা।

—না রে, আর বসা যাবে না। আনন্দবাজারের আপিসে যেতে হবে একটা

বিজ্ঞাপন দিতে। চারটের মধ্যেই বোধহয় দিতে হয়।
কিসের বিজ্ঞাপন? তোর ব্যবসার? কিসের ব্যবসা করছিস?
—রেডিও-মাইক এইসবের। বিজ্ঞাপনটা আমার ব্যবসার নয়।
—তবে?
—একটা বিয়ের বিজ্ঞাপন।
—সে আবার কার?
—বিনোদ ভটচার্যিকে তোর মনে পড়ে? বিনোদ কা। বাঁড়ুয্যেদের পুকুরের দক্ষিণ দিকে, আটচালার গায়ে---মনে পড়ছে?
–হ্যাঁ, হ্যাঁ। খুব মনে পড়ছে। জুলির বাবা।
–জুলিকে তোর মনে আছে?
–আছে বৈকি।
–তারই বিয়ের বিজ্ঞাপন।
–এখনো বিয়ে হয়নি জুলির?
–হয়নি। হবেও না।
–কেন? কেন? দাঁড়া।
মদন টেবিলে দেশলাই বাজাল। বেয়ারা এল। মদন আরও দুটো বিয়ারের অর্ডার দিল। বেয়ারা চলে গেলে মদন তার গলার টাইয়ের নট্-টা একটু আল্গা করে সামনের দিকে ঝুঁকে বসল।
–হ্যাঁ, বল্। বিয়ে হবে না কেন?
–আছে। একটা কেলেঙ্কারির ব্যাপার।
–কি রকম। লভ অ্যাফেয়ার?
এবারের ইংরেজি কথাটার মানে খুব সহজেই বুঝতে পারল নিশীথ।
–হ্যাঁ।
–কার সঙ্গে।
আমাদের হাই স্কুলে একজন ইতিহাসের টিচার এসেছিল। ব্যাটাচ্ছেলে কমিউনিস্ট, এসেই সাহিত্য-সভা, নাটক, রবীন্দ্রজয়ন্তী, ডিবেট এই সব নিয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিলে। নাটকের ক্লাব তৈরি হল একটা। 'বিসর্জন' নাটক হবে। চেহারা ছিল সমীরবাবুর, মানে ঐ ইতিহাসের টিচারের। তিনি নিজে সাজবেন জয়সিংহ। আর জুলি, জুলি তো চিরকালই স্মার্ট মেয়ে, ঠিক মাইরি বেছে বেছে জুলির দিকেই নজর পড়ল। জুলি করবে অপর্ণা। প্রথম দিকে আমরা শালা অত শত বুঝি নি। নাটক হচ্ছে, নাটক হবে, ভালোই তো। দেশ-পাড়াগাঁয়ে বিশেষ করে আমাদের অঞ্চলে, তুই তো অনেক দিন যাস নি, আমাদের ছেলেবেলাতেও যে-সব আনন্দ-উৎসব হৈ চৈ হোতো, এখন এমন হয়েছে মাইরি যে শালা দোলের দিনে রং খেলা পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম,

নাটক হবে, বেশ একটা সাড়া পড়েছে। সকলেই খুশী। হঠাৎ একদিন পাড়ার একটা ছেলে এসে আমাদের কানে খবর দিলে, নাটক খুব জমেছে মাইরি। আমরা তো তখনও কিছু বুঝি নি। আমরা বললুম, তুই বুঝি শুনে এলি? সে বললে, শুনবো কি রে? দেখে এলুম। দেখবি? তাহলে তৈরি হয়ে থাক। আমি যখন বোলবো আমার সঙ্গে যাবি।

নিশীথ থামল। বেয়ারা আরো দু' বোতল বিয়ার এনে টেবিলে রাখল। বেয়ারা চলে যাচ্ছিল। মদন তেরচা হয়ে বেঁকে পকেট থেকে একটা চামড়ার ম্যানি ব্যাগ বার করে তার থেকে একটা কড়কড়ে দশটাকার নোট বেয়ারাকে দিয়ে বললে—সিগারেট এক প্যাকেট। ক্যাপস্ট্যান। বেয়ারা চলে গেল। মদন আবার তেরচা হয়ে বেঁকে পকেটে ব্যাগটা রেখে সোজা হয়ে বসল।

—হ্যাঁ, বল।

—তারপর, আমরা সব উসখুস করছি। রাত প্রায় সাড়ে আটটা হয়েছে, পাড়াগাঁয়ে সাড়ে আটটা মানেই নিঝুম রাত, সেই ছেলেটা এসে ডাকলো—আয়। আমরা সবাই তার পিছু পিছু চললুম। নাটকের রিহার্সাল হতো হাই স্কুলেরই একটা ঘরে। ছেলেটা দেখি সেদিকে না গিয়ে চলল বোসেদের পুকুর পাড় দিয়ে বাঁশবাগানের দিকে। বোসেদের বাড়ির বাঁশবাগানের কথা তো তোর নিশ্চয়ই মনে আছে। আগে কোন ফাঁক-ফোঁকর ছিল না। বাঁশ বিক্রি করতে করতে ভিতরটা অনেকখানি পাতলা হয়ে গেছে। লোকজনের আসা-যাওয়ায় একটা শর্ট-কাট্ রাস্তা তৈরি হয়েছে ওর ভিতর দিয়ে। আমরা সেই রাস্তার থেকে খানিকটা দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলুম। ডেঁয়ো মশার মত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়াতে দাঁড়াতে হঠাৎ দেখি দূর থেকে দুটো মানুষ আসছে। তার একটা পুরুষ। আর একটা নারী। আরেকটু কাছাকাছি এলে দিব্যি চিনতে পারলুম মানুষ দুটিকে। একজন আমাদের সমীর মাস্টার, আরেক জন জুলি।

বেয়ারা এসে সিগারেট খুচরো টাকা পয়সা এনে মদনের টেবিলে রাখল। খুচরো টাকা পয়সাগুলো মদন টেবিলেই ছড়িয়ে রাখল। সিগারেটের প্যাকেটের পাতলা আবরণটা ছিঁড়ে একটা সিগারেট ধরাল তখুনি। টেবিলের ওপর একবার একটু ঝুঁকে বসল মদন।

তারপর? বাঃ, ইন্টারেস্টিং।

—তারপর আমাদের চক্ষুস্থির। তলে তলে এত কাণ্ড হচ্ছে কোন্ শালা জানতো। তারপর দেখি একটা জায়গায় এসে দুজনে একটু দাঁড়াল। দুজনে দুজনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। হাসল। কেউ কোন কথা বোলল না। সমীর মাস্টার হাতের একটা বই জুলিকে দিলে। জুলি হাত বাড়িয়ে নিল বইখানা। হাতে হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি হোল কি না কে জানে। আমরা ধরে নিলাম ছোঁয়াছুঁয়ি হচ্ছে। জুলিটা তখন দেখতেও ছিল ডাঁশা। মশার কামড়ের কি আর জ্বালা!

সে তো হাত পায়ের চামড়ার জ্বালা। কিন্তু ওদের দুজনের ঐ প্রেমের দৃশ্য দেখে বুকের মধ্যে জ্বালা শুরু হয়ে গেল। কোথাকার কোন সমীর মাস্টার এসে আমাদের পাড়ার অমন ডাঁশা ফলটিকে চুক্ চুক্ করে চাখবে, আর আমরা, ডব্‌কা ছোঁড়াগুলো তাই দাঁত বার করে দেখবো ?

ওরা দুজন চলে গেলে দুদিকে। আমরাও সে দিনের মত যে যার ঘরে ফিরে গেলাম। রাত্রে শালা চোখে ঘুম আসে না। সারা রাত ধরে হাত দুটো কেবল যেন নিসপিস করছে কিছু একটা ছোঁবার জন্যে।

পরের দিন থেকে শুরু হল আমাদের আন্দোলন। আমারা তিন চারজন মিলে প্ল্যান করলাম. সমীর মাস্টারকে তাড়াতে হবে। সে এক সাংঘাতিক, তোলপাড় কাণ্ড হয়ে গেল। সব কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। মোটমাট্ প্রথমে আমরা সমীর মাস্টারকে শাসালাম। পাঁড়াগাঁয়ে এসব শহুরে কাণ্ড-কারখানা চলবে না। সমীর মাস্টারও আমাদের শাসালেন। গালাগালি করলেন ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে। আমাদের মত ইয়ং ছেলেদের কাছ থেকে তিনি এরকম সংকীর্ণতা আশা করেন নি। লোকটার সাহস ছিল। আমাদের শাসানিতে একটুও না দমে রোজই নাটকের রিহার্সাল শেষ হলে জুলিকে বাড়ি পেঁছে দিতে বেরোয়। আমদের পিত্তি জ্বলতে লাগল। আমরা কি হেরে যাবো নাকি ? তখন আমরা গ্রামের মাথামাতব্বরদের কানে কথাটা তুললুম। মিথ্যে করেই তাদের কাছে বললুম, যে সব কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির দৃশ্য আমরা দেখেছি, আপনারা গুরুজন, আপনাদের কাছে কি করে আর বোলবো বলুন। আস্তে আস্তে নাটক জমতে লাগল। কানাঘুসো, ফিসফিস, ছিঃ ছিঃ, ছ্যা ছ্যা, হতে হতে এক দিন মাথা-মাতব্বররা গর্জন করে উঠল। স্কুলের হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে সবাই জানালে, সমীর মাস্টারকে ছাঁটাই করা হোক। হেডমাস্টার সমীর মাস্টারকে ভয় করতেন। কারণ সমীর মাস্টার লেখাপড়ায়, বলতে-কইতে, লিখতে পড়তে হেডমাস্টারের চেয়ে অনেক দরের লোক। তবু চাকরি বাঁচাতে তাই করতে বাধ্য করানো হোল। সমীর মাস্টার ইতিমধ্যে স্কুলের দুচারটে, পাড়ার দুচারটে ছেলেকে আধখানা-কমুনিস্ট বানিয়ে তুলেছিল। তারা ধুয়ো তুললে, আমরা সমীর মাস্টারকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাবো। আমরা সে গুড়েও বালি ছড়ালাম। চরিত্রহীনকে আবার সম্বর্ধনা কিসের ?

বেশ মনে আছে, সকাল নটা-দশটা হবে। আমার দোকানে আমরা জনা পাঁচ-ছয়েক খুব মশগুল হয়ে গরম জিলিপি আর কচুরি খাচ্ছি। একটা চামড়ার সুটকেশ হাতে নিয়ে সমীর মাস্টার গটগট করে আমার দোকানের সামনে দিয়ে স্টেসনের দিকে হেঁটে চলেছে। আমরা প্রাণভরে হাসতে লাগলাম। হঠাৎ হাসিটা থেমে গেল। দেখি জুলিও চলেছে স্টেসনে। সমীর মাস্টারের পিছু পিছু। তার চলা-হাঁটায়, চোখে-মুখে এতটুকু ভয়-লজ্জার লেশ মাত্র

নেই। বুক ফুলিয়ে হাঁটছে।
সমীর মাস্টার চলে গেল। আমরা ভাবলুম যাক, একটা ফাঁড়া কাটল। কিন্তু চলে গেলে হবে কি, যাবার আগে জুলিকে কমুনিস্ট বানিয়ে গেল। মাইরি, কানে কি ফুসমন্ত্র দিয়ে গেল জানি না, দিনকে দিন জুলি যেন অন্য মেয়ে হয়ে উঠতে লাগল। তাজা টুসটুসে কী গড়ন ছিল। বুক পাছা এ সবের দিকে চোখ পড়লে বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠতো। সেই জুলি রোদে শুকোতে লাগল। পাকা ফুটিকের মত গায়ের রঙে শ্যাওলা পড়তে লাগল। আগে ছিল যেমন লম্বা, তেমন চওড়া। মানানসই। এখন চেনা যায় না, এ যে সেই জুলি। রোগা, কাঠির মত। দড়ি পাকানো হাত পা। কর্কশ মুখ। কেবল চোখ দুটো সদা সর্বদা বাঘের মত জ্বলছে। হাটে মাঠে ঘাটে টইটই করে ঘুরে বেড়িয়ে কেবল বক্তৃতা, বক্তৃতা, রাজনীতি। কি বক্তৃতা যে দিতে পারে, কি করে শিখলো কে জানে? এর মধ্যে জেলেও কাটিয়েছে কিছুদিন। ত্যাঁদড় মেয়ে বটে একখানা!
বিনোদ কাকাকে আমরা কতবার বলেছি, ও মেয়ের বিয়ে হবে না, ও বিয়ে করার মেয়ে নয়। তবু সেকেলে মানুষ তো, মেয়ের বিয়ে না দিতে পারলে যেন তাঁর স্বর্গে যাওয়া আটকে যাবে, সব সময়ই চোখে মুখে এই রকম জ্বালা-যন্ত্রণার ভাব।
নিশীথ থামল। মদন নিশীথের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ খুব গম্ভীর গলায় বললে, এতো দারুণ মেয়ে রে। আমার তো ইচ্ছে করছে এখুনি গিয়ে জুলিকে কনগ্রাচুলেট করে আসি। মদনের উচ্ছ্বাসে নিশীথের মুখের যাবতীয় উচ্ছ্বাস আবেগ সহসা চুপসে এল। হাঁদার মত হয়ে গেল সে। অবাক হয়ে নিজের মনে মনে ভাবতে লাগল, কলকাতার কেতা দুরস্ত মদন জুলির প্রশংসা করছে? এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা।
মদনের চোখে ধীরে ধীরে কেমন একটা বিদ্রূপ ফুটতে লাগল।
—তোরা মেয়েটাকে ত্যাঁদড় বলিস্ কেন? ওতো তোদের কোন ক্ষতি করেনি। ব্যাটাছেলে, পাড়া গাঁ থেকে কলকাতায় এসে হিন্দি ছবির ন্যাংটা নাচ দেখবে, আর গ্রামে কেউ কাউকে ভালবাসলে তাদের পিছনে ফেউ লাগবে। ইয়ার্কি না? বেশ করেছে, তোদের গালে মেয়েটা ঠাস করে চড়টি মেরেছে, ঠিক করেছে।
হাঁদা গঙ্গারামের মত মুখ করেই নিশীথ বললে, আমাদের আবার চড় মারল কখন?
—তুই একটা হাঁদা গঙ্গারাম। রোজ চড় খাচ্ছিস, তবু বুঝতে পারছিস না। জুলি তো তোদের রোজই চড় মারছে। মগজে ঘি থাকলে বুঝতে পারতিস। তোরা কি ভেবেছিস সমীর মাস্টারের সঙ্গে ওর প্রেম তোরা নষ্ট করে দিতে পেরেছিস?

—তার মানে।

—নষ্ট হয়নি। সমীর মাষ্টারের সঙ্গে ও এখনও রেগুলার প্রেম করে চলেছে।

—তুই সমীর মাস্টারকে চিনিস ?

—তুই একটা সত্যি একেবারে গেঁইয়া রয়ে গেলি। কিছু বুঝিস না। সমীর মাস্টারকে আমি কস্মিনকালেও দেখিনি। দেখবোও না। এটা অন্য জিনিস। সমীর মাস্টার ওকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে গেছে। ঐ যে বললি জুলি গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা করে, রোদে-জলের মধ্যে দিনরাত ছুটে বেড়ায় ঐ ওরই মধ্যে দিয়ে ওদের প্রেম হচ্ছে। কেউ কাউকে চোখের সামনে দেখতে না পেলেও চিন্তা, কাজ, আদর্শের লড়াই-এর মধ্যেই ওরা পরস্পরকে ভালবাসছে। কিছু বুঝলি ইডিয়েট। আর চড় খাচ্ছিস তোরা।

টাই-টেরিলিন পরা মদনের গোঁফদাড়ি-কামানো পালিশ-করা যে মুখের মধ্যে থেকে এইসব কথাগুলো বেরিয়ে আসছিল, নিশীথ হাঁ করে তাকিয়েছিল সেই-দিকে। মদন যে এভাবে জুলির পক্ষ নিয়ে কথা বলবে নিশীথ ভাবতেই পারেনি। নিশীথের শরীরটা কুঁকড়ে আসছিল।

মদন তখন হাসছিল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে, ঝকঝকে সাদা দাঁতে।

—খুব টাইট দিয়েছে তোদের, জুলিটা, রাম টাইট।

মদনের কথাগুলো ঠিকমত মাথায় ঢুকছে না নিশীথের। দু বোতল বিয়ার খেয়ে শরীরের ভেতরে সামান্য যেটুকু উত্তেজনার তালগোল পাকানো শুরু হয়েছিল, মদনের এইসব ঘোরালো কথার ধাক্কা সামলাতে গিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী তালগোল পাকাতে শুরু করেছে তার চিন্তাগুলো। আর একটু খেলে হোতো।

ঠিক সেই সময়েই ওদের টেবিলের সামনে দিয়ে বেয়ারা যাচ্ছিল। মদন ডাকলে। মদন নিশীথের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়ে থেমে বাঁ হাতের সোনার মত জ্বলজ্বলে রিস্টওয়াচটা দেখে নিয়ে বললে, সাড়ে পাঁচটা। এবার একটু হুইস্কি হোক।

মদন বেয়ারার দিকে ফিরে বললে, দোঠো ব্ল্যাক নাইট। বড়া। বেয়ারা চলে গেল। মদন সিগারেট ধরাল। নিশীথকেও সিগারেট দিল। সিগারেট ধরিয়ে মদন ডান হাতের ওপর চিবুক রেখে নিশীথের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে, ধীরে ধীরে মদনের মুখে ঠাট্টার মত একটা হাসি ফুটে উঠতে লাগল।

—জুলিকে খুব ভালবেসে ফেলেছিলি, তাই না ?

নিশীথ হাসবার চেষ্টা করল। হাসিটা তেমন জমল না।

—সত্যি কথা বলবি। পুরুষমানুষ, লজ্জা কিসের ? আমি ওরকম ডজন খানেক মেয়েকে ভালবেসেছি।

হ্যাঁ।

এই তো বাবা, আসল কথাটি বেরুল। সমীর মাস্টারকে তাড়ানোর পিছনে তো উদ্দেশ্য ছিল এইটেই। সমীর মাস্টার চলে গেলে জুলিকে তুই পাবার জন্যে চেষ্টা করবি তাই না ?

হ্যাঁ।

চেষ্টা করিস নি ?

হ্যাঁ।

পাত্তা দিত না, তাই না। চাকর-বাকরের মত ব্যবহার কোরতো তাই না।

হ্যাঁ।

রাত্রে ঘুম হোতো না। ঘুমের মধ্যে রোজ জুলি সামনে এসে দাঁড়াতো। স্বপ্নে জুলি এসে তোকে আদর করতো। জুলিকে তুই চুমো খেতিস, আদর করতিস। জুলি তোর চুলের ওপর হাত বোলাতো নরম আঙুলে। জুলির নরম শরীরটাকে নিয়ে তুই যে কি করবি ভেবে পেতিস না। আনন্দে তোর কষ্ট হোতো, কান্না পেত। তারপর সকাল বেলায় ঘুম ভেঙে যখন দেখতিস জুলি তোর বিছানায় নেই, জুলি তোর জগতের থেকে বহু দূরে, হাত বাড়ালে কোথাও তাকে খুঁজে পাবি না, তখন বুকটা টনটন করতো। বুকের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা চাপা আক্রোশ ফণা তুলতো তারপর হাতের মুঠোটা শক্ত হোতো, দাঁতে দাঁত বসে যেতো, ইচ্ছে কোরতো এখুনি ছুটে গিয়ে জুলির গলাটা টিপে ধরি তাই না ?

—হ্যাঁ।

—মাথার চুল মুঠোয় চেপে বসে বসে এমন সব ভাবনা ভাবতিস, যার কোন উত্তর নেই।

বেয়ারা এসে হুইস্কি দিয়ে গেল। মদন বেশ শক্ত হাতে গ্লাসটা ধরে রইল কিছুক্ষণ, মুখে ছোঁয়াল না। সেই গ্লাসটার দিকে তাকিয়েই মদন কথা বলতে লাগল।

জুলির কি অপূর্ব সুন্দর স্বাস্থ্য, তুই দেখতিস চোখের সামনে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সে শুকিয়ে যাচ্ছে, রোগা হচ্ছে, রুগ্নর মত হচ্ছে, কর্কশ হচ্ছে, তবু সে যৌবন থাকতে থাকতে কাউকে তার শরীরটার স্বাদ নিতে দিচ্ছে না। তার শরীরটাকে রোদে খাচ্ছে, জলে খাচ্ছে, দমকা বাতাস ছুঁয়ে যাচ্ছে, শুকনো ডালপালা খোঁচ মারছে, ধুলো উড়ে এসে ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে, এসব তার সহ্য হচ্ছে। কিন্তু একটা মানুষের স্পর্শ তার কাছে অসহ্য। অদ্ভুত, অদ্ভুত।

মদন এবার এক চুমুকে গ্লাসের অর্ধেকটা খেয়ে নিলে। মাথাটা ঈষৎ ঝুঁকে রইল তার। নিশীথের তখনও কিছুই খাওয়া হয় নি। সেই সময় কোন একটা অদৃশ্য জায়গা থেকে মিষ্টি সুরেলা বিলেতি বাজনা শুরু হল। মদন

তার হাতের গ্লাসটাকে নিয়ে চুপ করে বসে রইল। নিশীথ কি বলবে কিছু বুঝতে পারল না। মদনকে তার বড় রহস্যময় লাগছে। মদন যেন তার চোখের সামনে একটা জীবন্ত হেঁয়ালি। জুলির প্রতি আজ আর কোন বিশেষ আকর্ষণ নেই সত্যি। কিন্তু একদিন সত্যি সত্যিই জুলিকে পাওয়ার জন্যে তার সমস্ত জীবনটা সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে-রাত্রি একটা রাস্তার ভিখিরির মত অবিশ্রান্ত হাত পেতে রেখেছিল, অবিশ্রান্ত একটানা কেবল কেঁদেছে। হাহাকার করেছে। মদন তার সেই সব দিনের অনুভূতিগুলোকে হুবহু বর্ণনা করে গেল। কি করে করল?

মদন হঠাৎ আবার একটু সোজা হয়ে বসল। নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে—

—তাড়াতাড়ি শেষ কর। আর একটু বলি।

—আবার? আর বেশি খাব না। আমার তো সব পণ্ড হয়ে গেল কাজকর্ম। বেশি খেয়ে শেষকালে স্টেসনে পড়ে থাকবো, বাড়ি ফেরাই হবে না।

—সব ঠিক হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। কতদিন পরে দেখা। একটু খাওয়া যাক প্রাণ খুলে।

মদন তার হাতের গ্লাসের বাকি অংশটুকু এক চুমুকে শেষ করে টেবিলের ওপরে গ্লাসটাকে ঠুকতে লাগল।

বেয়ারা এল।

—দো পেগ ব্ল্যাক নাইট, বড়া। বেয়ারা চলে গেল।

—নিশীথ আবার প্রতিবাদ করলে।

—আমার জন্যে কেন বললি আবার?

—খা, না। তুই অনেক দিন বড্ড কষ্ট পেয়েছিস নিশীথ। অনেক দিন ধরে একটা যন্ত্রণা বুকের ভিতরটাকে কুরে কুরে খেয়েছে। কাউকে বলতে পারিসনি। ক্যানসারের মত একটা পাঁজরের তলায়। দারুণ ব্যথা তার, ভীষণ কষ্ট।

নিশীথ হাসতে হাসতে বলল—নারে, এখন আর আমার কোন কষ্ট নেই। সব ভুলে গেছি।

—ভোলা যায় না। নিশীথ। এসব কখনো ভোলা যায়। লোককে বোলতে হয় ভুলে গেছি। আসলে ভুলি না। এসব ভুলে যাওয়া পাপ, অপরাধ। ভুলে গেলে আর রইল কি। মৃত্যু। মেয়েরা তাদের শরীর কাউকে ছুঁতে দেবে না। বেশ তো, দেবে না। আমরাও আমাদের দুঃখ কাউকে বুঝতে দেবো না। তুই যেমন গিলেকরা পাঞ্জাবি পরেছিস, আমি যেমন টেরিলিনের কোর্ট পরেছি, তুই জবাকুসুম মেখেছিস চুলে, আমি শাম্পু করেছি, তোর হাতে সোনার আংটি, আমার হাতে স্মাগলড রিস্টওয়াচ, এই সব দিয়ে এমন করে আমাদের কষ্টকে, ফুলশয্যার দিন যেমন করে বৌ সাজায়, তেমনি পরিপাটি করে সাজিয়ে বা। কোন বেটাচ্ছেলে, ধরতে পারবে না যে, বুকের মধ্যে ক্যানসার রয়েছে

আমাদের।
বেয়ারা এল। টেবিলে আরও দুটো-হুইস্কির গ্লাস রেখে চলে গেল। ক্রমশ লোকসংখ্যা বাড়ছে। ক্রমশ চাপা গুঞ্জনটা জোরালো হচ্ছে। ক্রমশ বাজনার সুরটাকেও মনে হচ্ছে ঝাঁঝালো। ক্রমশ মুখের রেখাগুলো বদলে যাচ্ছে মদনের। বাজনার তালে তালে মাঝে মাঝে দুলে উঠছে তার শরীরটা। এখন সে আর নিশীথের দিকে তাকাচ্ছে না। মাথাটা সব সময়েই নিচের দিকে ঝুকনো। আর তার মুখের ঠিক নীচেই যেন একটা চিতা জ্বলছে। সেই চিতার সমস্ত তাপ, আগুনের ফালি, এসে মদনের পরিষ্কার মাজা-ঘসা সুন্দর মুখখানা পুড়িয়ে কেমন যেন বিকৃত, ময়লা, ঘোলাটে করে তুলছে।
নিশীথের শরীরেও ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে একটা চাঞ্চল্য। মনে হচ্ছে উত্তেজনার বশে তারও এখুনি কিছু করা উচিত, পাশের টেবিলের লোকজনের মত হো হো করে হাসা উচিত, প্রাণ খুলে মদনের কাছে জুলির সম্পর্কে তার মনের লুকানো গোপন কথাগুলো বলা উচিত। কথা বলতে বলতে দু-একবার চিৎকার করে উঠতে পারলে আরো ভালো হয়।
কিন্তু মদনের দিকে তাকিয়ে নিশীথের উত্তেজনা ভোঁতা হয়ে আছে। মদন শুধু শুধু অকারণে কষ্ট পাচ্ছে আমার কথা ভেবে।
নিশীথ খুব আস্তে ডাকল, মদন। ওসব কথা তোকে ভাবতে হবে না। হুইস্কি দিয়ে গেছে, খা।
মদন মুখটা তুললো। টলমলে হাতে গ্লাসটা ধরল।
—নিশীথ আবার বললে, আমি নিজেই জুলির কথা ভুলে গেছি। তুই ওসব ভেবে কষ্ট পাচ্ছিস কেন? খা। খাওয়াটা শেষ কর। প্রায় সাতটা বাজে, আমি এবার উঠবো। আটটা পঁচিশে একটা ট্রেন আছে। ভিড় থাকে কম। ওটাতেই ফিরবো।
মদন কোন কথা বোলল না। যেমন একটা অসহায় চোখ করে নিশীথের দিকে তাকাল। যেন মদন কাঁদতে চায়, কাঁদতে পারছে না, এমনি অসহ্য করুণ তার চাউনি। মদন কোন কথা না বলে গ্লাসে চুমুক দিল। মাত্র দুটো তিনটে চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে টেবিলে এমন সজোরে সেটা রাখল যে ভেঙে গেল গ্লাসটা। আবছা আলো-ছায়ায় ঢাকা ঘরটার ভিতরে এতক্ষণ ধরে যে প্রাণের হুল্লোড় চলছিল, গ্লাস ভাঙার শব্দে হঠাৎ সব থেমে গেল। সকলেই তাকাল মদন ও নিশীথের টেবিলের দিকে। বেয়ারা ছুটে এল। মদন টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। বেয়ারাকে দেখে মদন বললে, বিল আনতে।
বেয়ারা চলে গেল। একটু থামার পর আবার কল টিপলে যেমন জল পড়ে তেমনি এক দমকে চারিদিকে কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা, চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল।

বিল নিয়ে বেয়ারা এল। বিলের দাম, গ্লাসের দাম, বেয়ারার টিপস সব মিটিয়ে দিয়ে মদন ও নিশীথ, অনেকগুলো চেয়ার টেবিলের পাশ দিয়ে এঁকে-বেঁকে টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এল। মাটিতে পা রাখতে গিয়ে নিশীথ বুঝতে পারল তার শরীরটা টলছে।
মদন একটা গ্যাসপোস্ট ধরে দাঁড়াল। নিশীথ বললে, মদন, এবার আমি যাই।
মদন তার হাতটাকে খামচা মেরে চেপে ধরল। দাঁড়া কোথা যাবি। আমরা একসঙ্গেই যাব।
—একসঙ্গে কোথায় যাবি? আমি তো যাব···
—জুলির কাছে।
—জুলি?
নিশীথের মনে হল এই একটা সুযোগ। এখন সে প্রাণ খুলে একটা অট্টহাসি হাসতে পারে। ভীষণ জোরে, মহাশব্দে, বিশাল গর্জনে তার একবার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে·করছে। কিন্তু সে পারল না। লোকে তার দিকে তাকিয়ে যদি মাতাল বলে হাসে। জোরে না হেসে নিশীথ আস্তে আস্তে হাসতে লাগল।
—জুলির কাছে যাবি কি রে। সে কি এখানে থাকে নাকি?
—একটা ট্যাক্সি ডাক। আমি তোকে জুলির কাছে নিয়ে যাব।
নিশীথকে ডাকতে হোল না, মদনই চিৎকার করে একটা ট্যাক্সি থামাল। মদন নিশীথের হাত ধরে তাকে ট্যাক্সিতে তুলল। ট্যাক্সিতে উঠে দুজনে পাশাপাশি বসলেও মদনের শরীরটা ঝুঁকে পড়ল নিশীথের ঘাড়ে।
ট্যাক্সিওলা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাবে।
মদন হিন্দিতে উত্তর দিলে, চিৎপুর।
ট্যাক্সি চলতে লাগল। নিশীথের মাথাটা অল্প অল্প পাক্ খাচ্ছে। বুকের মধ্যে একটা চাপ সৃষ্টি হচেছ। তবু সে নিজেকে খুব সংযত করে রাখার চেষ্টা করল,
নিশীথের ঘাড়ে মাথা রেখে মদন আড়ষ্টের মত শুয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে মদন বললে।
—নিশীথ, আমার কোর্টের পকেটে তিনশো টাকা আছে। হাতে এই রিস্টওয়াচটা আছে। তুই দেখিস। আমি আজ একটু ফূর্তি করবো। পৃথিবীতে এই জুলিগুলো আমাদের বড় কষ্ট দেয়। এই জুলিগুলো আমাদের কীট-পতঙ্গের চেয়েও অধম মনে করে। আচছা নিশীথ, আমরা কি মশার চেয়ে, মাছির চেয়েও নিকৃষ্ট। মেয়েদের গায়ে মশা মাছি বসে। আমাদের তো মশা মাছি ভেবেও বসতে দিতে পারে। তুই বুঝবি বলে তোকে বলছি নিশীথ।
—তুই জুলিকে পাস্নি। আমিও আমার জুলিকে পাইনি। আমাকে

ঠকিয়েছে। ভীষণ ঠকিয়েছে। ভীষণ ঠকিয়েছে। মদন হঠাৎ কাঁদতে লাগল। নিশীথ ভীষণ হতভম্ব হয়ে গিয়ে কি যে বলবে বুঝতে পারল না।
—মদন, কি হচ্ছে। মদন, এসব কি ছেলেমানুষী করছিস। চুপ কর।
হঠাৎ মদনের গলাটা আবার প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এল। মদন বললে,
—আমি কখনো প্রসটিটিউট কোয়ার্টারে যাইনি। আজ প্রথম যাচ্ছি। তুই আমার সঙ্গে থাকবি। আমি আজ খুব ফুর্তি কোরবো। তুইও কোরবি। আমার কোর্টের পকেটে তিনশো টাকা আছে।
আমি একেবারে ফতুর হয়ে যেতে চাই। আমি ছেলেবেলার মত ন্যাংটো হয়ে বাড়ি ফিরতে চাই।
নিশীথ কি বলবে বুঝতে পারল না। তার শুধু ইচ্ছে করতে লাগল এখুনি যদি হাতের সামনে একটা ঢাক পেলে সে প্রাণপণে বাজাতো। ঢাক এখন কোথাও পাওয়া যাবে না। অথচ প্রচণ্ডভাবে একটা কিছু করার জন্যে সে বহুক্ষণ ধরে ছটফট করছে।
বেশ কিছুক্ষণ চুপ করেছিল নিশীথ। তাদের ট্যাক্সিটা যখন মহাজাতি সদনের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে, হঠাৎ সে মদনের শরীরটা জাপটে ধরে ভীষণ বেসুরো, কর্কশ বিশ্রী শব্দে চিৎকার করে উঠল—
—চালাও ফুর্তি। চো—লু—উ—ক।

কে যাও গ? এ্যাঁ? কে?

উত্তর আসে না। সৈরভীর চোখে ছানি। তার নিজের
বয়স চার কুড়ি পেরোনো। ছানির বয়স অত না
হলেও কম নয়। অবশ্য এক কুড়ি এখনো পেরোয়
নি। কোনো কিছু দেখার জন্যে সৈরভী
চোখের চেয়ে কানটাকেই নির্ভর করে বেশী।

অনেকদিন পরে নেংড়ে নেংড়ে মাটিতে উবু-ঘসটানি দিয়ে,
বাইরের ভাঙা দাওয়াটায় এসে বসেছিল আজ। স্যাঁত-
সেঁতে, জ্বর জ্বর, নেতিয়ে পড়া শরীরটাকে
রোদে সেঁকতে। বসেছিল দুপুর বেলায়।

দুপুরের রোদ মাটির উপর আগুন নিয়ে যতক্ষণ খেলা-
খেলি করায় খেলে, এখন গাছপালার মাথায়। ডাল-
পাতার আড়ালে বাতাস খেয়ে নিজেকে জুড়োচ্ছে।
সন্ধ্যে হতে ঈষৎ দেরী।

তবু বাতাসে এসে গেছে হিমের স্বাদ। শীত
শীত গন্ধ। আলতো আলতো। এই আলতো শীতের
ছোঁয়াচে সহসা তার খালি-গা-এর ঘুমটা না ভাঙলে,
হয়তো সারারাতটাই কেটে যেতো সৈরভীর, ভাঙা
দেওয়ালে পিঠ রেখে।

ঘুম ভাঙতেই কানে এল বাঁশপাতার উপর শব্দ।

বাঁশপাতার উপর গরু-ছাগল হেঁটে গেলেও শব্দ। তবু সৈরভী বুঝে নিল শব্দটা গরু-ছাগলের নয়, মানুষের। এবং ভদ্র মানুষের। এমন ভদ্র যার পায়ে জুতো আছে। এমন জুতো, যা নতুন। এত নতুন যে মচ্‌মচানি মরে নি এখনো।

কে যাও গ? এ্যাঁ? ভগোমান মুখ দেয় নি বাবা? একটু জবাব দিলে কি মুখ পচে যাবে?

মুখ পচে যাবে কথাটা বলে সৈরভী নিজের মনে অসন্তুষ্ট হয়। ছিঃ। একটা কটু কথা কেন বেরিয়ে এল মুখ থেকে? যাকে বলা, সে যে ভদ্র ঘরের কেউ সেটা তো ছানিপড়া চোখেও আন্দাজ করতে পেরেছে সে। কোনো বাবুর বাড়ির ছেলে। শহরে থাকে। অনেকদিন পরে গাঁয়ে ফিরছে। গাঁয়ের নিত্যি দিনের মানুষের পায়ের জুতো মচমচায় না।

কে যাও, বাবা? কে গ? আমি কি সকোলের এত.পর হয়ে গেছি বাবা?

এবারের উচ্চারণে ভিজে চোখের মত সজল সরলতা ছিল। তাতে কাজ হল, উত্তর পেল সৈরভী।

আমি নোটন।

বেশ পরিণত, ভরাট কণ্ঠস্বরের জবাব। সৈরভীর ছানিপড়া চোখ দুটো কোটরের মধ্যে নড়ে-চড়ে উঠল।

—আগো নোটনবাবু তুমি। আহা-হা। এই এসেছ বুঝি? কোলকাতা থিকে? শহরে থাকো, লোকে বলে শুনি। ভাল আছ বাবা আমার?

—আছি।

—বেশ বাবা, বেশ। যাও, বাড়ি যাও। তমার মা অপিক্ষে করে বসে আছেন। হ্যাঁ বাবা, কত বড় হয়েছ আজকাল? খুব বড়সড় হয়ে গেছ? হবে নি। সে কি এজকের কথা। কত দিন চাঁদমুখ দেখিনি তমার। একটু কাছে আয় নারে বাবা। দেখি। সোনার বদোনখানি। মরার আগে শেষ দেখাটা দেখে নি বাবা। আর কি দিয়েই বা দেখবো। চোখের দিষ্টি তো তিনি নিয়ে নেছেন।

নোটনের অর্থাৎ নোটনবাবুর আদৌ ইচ্ছে ছিল না দাঁড়ানোর কিংবা কথা বলার। তার কারণ তাঁর দুহাতে দুটি ভারী ওজনের ব্যাগ। তিন মাস পরে দেশে ফিরছেন। ব্যাগ ভর্তি জিনিস। মায়ের ফর্দ, বাবার ফর্দ, বৌ-এর ফর্দ এবং পনেরো দিন পরে বাড়িতে যে লক্ষ্মীপুজো হবে তার ফর্দ, সব মিলিয়ে। তবু তিনি দাঁড়ালেন। কারণ ঠিক ঐ মুহূর্তেই তিনি নিজের পিছনে শুনতে পেলেন কয়েকজন গ্রাম্য মানুষের গলা। কথা বলাবলি করতে করতে এগিয়ে আসছে। ওরা সবাই তাঁকে চেনে। সৈরভীর অমন ব্যাকুল ডাকেও তিনি যদি সাড়া না দিয়ে চলে যান, ঐ লোকগুলির চোখে পড়বে। তারপর বলাবলি করবে

নিজেদের মধ্যে, দেখেছো হরিবাবুর ছেলে নোটনবাবু এখন কি রকম শহুরে বাবু হয়ে গেছেন। গরীব-দুখির দিকে ফিরে তাকান না।
নোটনবাবুর মনে সেই মুহূর্তে এমন একটা বোধ উথলে ওঠে, যাকে আলাদা আলাদা করে দয়া কিংবা করুণা কিংবা অনুকম্পা কিংবা মানবিকতা ইত্যাদি না বলে ন্যায় বলাই ভাল। ন্যায়টাই খাঁটি অনুবাদ। কারণ—
এই সৈরভী ধোপানির বাগান কি কম তছ্‌নছ্‌ করেছেন তিনি তাঁর শৈশবে? দেখবার মতো বাগান। আম, জাম, জামরুল, আমলকি কি নেই। স্কুলে যাবার প্যান্ট ইস্ত্রি করতে দিয়ে সেই ফাঁকে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মুঠো মুঠো থোকা থোকা আমলকি। সৈরভীর চোখে তখন ছানি ছিল না। সে জানতো কার ঢিল, কার খিদে। ভদ্র ঘরের ছেলেদের সে কোনদিন গাল পাড়ে নি। নোটনকে তো কোনদিনই না। সে যে নোটনের মায়ের মেয়ে। পেটের মেয়ের চেয়ে বেশী আদর আবদার তার শতদলবাসিনীর কাছে।
নোটনবাবু এগিয়ে গেলেন সৈরভীর ভাঙা দাওয়ার দিকে। এবং দেখেও নিলেন এক ঝলক চারদিকটা। কোথাও আর বাগান নেই। সবুজ গাছপালার চিহ্ন পর্যন্ত শেষ। গতবারে, মাস তিনেক আগে, যখন এসেছিলেন তখনও চোখে পড়েছিল বিরাট তেঁতুল গাছটা। এবারে সবটাই ফাঁকা। গতবারে দেখেছিলেন ভিটে বাড়িটা কোমর ভেঙে আড় হয়ে গেলেও, মাথায় খড়ের চালটা মজুত আছে। এবারে দেখলেন মাটির দেয়ালের উপরে আকাশ।
—তুমি ভাল আছ?
এই বাক্য কানে যাওয়া মাত্র সৈরভীর চোখ দুটো সাপের ফণা তুলে কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। তার ছানির ধবধপে সাদা অংশটা থরথর করে কিছুক্ষণ কাঁপল কেবল, মনের অন্তর্গত আবেগে।
—আমাকে বলতেছ বাবা? আছি এখনো। মরি নি। হেগে মুতে পড়ে আছি। কেন যে আছি, কেন যে তিনি না নিয়ে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন, তিনিই জানেন। খেতেও দিবেন নি, আবার প্রাণপাখিটাকেও পুষে রাখবেন, তেনার রহস্যো তিনিই জানেন। হ্যাঁ বাবা, অনেকদিন পরে মায়ের কোলে ফিরতেছ, তাই না?
—না। অনেক দিন পরে নয়। এই তো মাস তিনেক আগে এসেছিলাম।
—এস্‌ছিলে? কই দেখা তো পেনুম নি। হ্যাঁ বাবা, বিয়ে-থা করেছ? তমার মা ঘরে লাল টুকটুকে একটা বৌ এনেছেন তো তমার জন্যে?
নোটনবাবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। হাতের ভারী ব্যাগ দুটোকে মাটিতে নামিয়ে রাখতেও পারেন না। নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। ক্রমশ যেন তার ব্যক্তিত্ব ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ হতে থাকে। আর ঠিক এই সময়েই, একটা কালো ছাগল, সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে, তাই শেষ বেলার শেষ খিদেটুকু মিটিয়ে নেবার জন্যে

একটা সদ্য গজানো ভেরেণ্ডা গাছের একগুচ্ছ কাঁচ পাতা চিবোতে চিবোতে নোটনবাবুর একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। ব্যাগের গন্ধ শুঁকল। পছন্দ হল না। দু তিন বার মুখ উঁচু করে নোটনবাবুর চশমা পরা মুখটা দেখে নিল। কিন্তু একবারও সৈরভীর দিকে তাকাল না। তারপর একদম স্থির দাঁড়িয়ে আরাম করে পান চিবোনোর ভঙ্গীতে ভেরেণ্ডা পাতার স্বাদ নিতে লাগল।

—বিয়ে হয়েছে বাবা?

—তোমার মনে নেই? তুমি খেতে গিছলে। তারপর মায়ের কাছ থেকে একটা কাপড়···

নোটনবাবুর মুখে এসে গিয়েছিল, বাগালে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেটা শুধরে নিয়ে বললেন,

—নিলে।

—তাই হবে, বাবা, তাই হবে। তাহলে তমার বিয়েতে খেয়েছি। কার যেন বিয়েতে খেতে ডাকল নি বল তো? খুব ইচ্ছে ছিল, এক পেট খেয়ে এসবো। হ্যাঁ, বাবা, ছেলেপুলে হয়েছে তমার?

—হয়েছে। মেয়ে।

—মেয়ে হয়েছে। বাঃ। ধনে পুত্রে লোক্ষ্মীলাভ হক তোমার বাবা। সি যেন এই সিদিনের কথা। আঁতুড়ে এলে। সারা রাত জেগে বসেছিনু বাইরে। ভোর রাতে জন্মালে। সেই থিকে কত কোলে নিয়েছি, তেল মাখিয়ে চান করিয়েছি, গু-মুত কেড়েছি। কতদিন মা-জননী মোর কোলে ফেলে দিয়ে পাড়া বেড়াতে গেছে। কি কান্না তমার। থামাতে কি পারি? খুব দাস্যি-দামাল ছিলে বাবু তুমি ছেলে বয়সে। এখন কত বড়টি হয়েছ। সেই তমার আবার মেয়ে হয়েছে। ভগোমানের কি খেলা! তা হ্যাঁ বাবা, তমার যে মেয়ে হল, আমাকে কিছু দিবে নি? বুড়ো মানুষ, আজ আছি, কাল নেই। কখন যাই, কখন থাকি ঠিক নেই বাবা। না-খেয়ে না-দেয়ে পড়ে আছি। বাগান উঠোন জমি-জিরেত সব পেটে পুরেছি। পেটের খিদে বড় খিদে। ভিক্ষে মাঙবো, সে শক্তিও ভগমান কেড়ে নেছেন। কি করি বল তো বাবা।

নোটনবাবু দেখতে পেলেন সৈরভীর চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে। আঁচলে চোখ মুছল সৈরভী। সরু কাঠির মত হাত। চামড়া কুঁচকে শরীরে থলথল করে ঝুলছে। কী লম্বা গড়ন ছিল একদিন। এখন বেঁটে হয়ে গেছে।

—বড়বাবু!

চেনা গলার সম্ভ্রমপূর্ণ ডাক শুনে নোটনবাবু ঘুরে তাকালেন। শশী দাঁড়িয়ে, তাদের প্রজা। নোটনবাবু ঘুরে তাকাতেই শশী ঢপাস করে প্রণামটা সেরে নিল।

—এই এসতেছেন বুঝি !
—হ্যাঁ।
—ব্যাগ দুটো দিন। পৌঁছে দিয়ে আসি।
—নেবে ? নাও। বাড়িতে বলে দিও, যাচ্ছি।
—আচ্ছা।
ব্যাগ দুটো নিয়ে চলে যেতে পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়ায়।
—বেশী কথা বলবেন নি বাবু। পেয়ে বসবে। দিনরাত ওর মুখে শুধু ঐ এক কথা। খাবো খাবো। ইদিকে পেটেও তো সহ্যি হয় না। খাচ্ছে আর হাগতেছে।
—আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি যাও।
শশী চলে যায়। বাঁশপাতার উপর আবার পায়ের শব্দ। ভিজে চোখ দুটো মোছার সময় অন্যমনস্ক হয়ে গিছল সৈরভী। হঠাৎ বাঁশপাতার উপর পায়ের শব্দে সজাগ হয়ে উঠল।
—চলে গেলে নাকি বাবা ?
—না, যাইনি। বলো।
—কি আর বলবো বাবা, বল। সবই দেখতে পাচ্ছ। গায়ে বস্ত্র নেই। পেটে ভাত নেই। দুমুঠো চাল জুটলো যদি তো ফুটিয়ে খাবার তাকত নেই। সিদিন পুকুরপাড়ে কলমী শাক তুলতে গিয়ে জলে পড়ে গেনু বাবু। সিদিনই তো মরণ নেখা ছিল কোপালে। কত ভালো হতো। সি তো হবার নয়। উপারের ঘাটে চান করতেছিল মান্নাদের বাড়ির বৌ-ঝিরা, ছুটে এসে বাঁচি দিলে। কি দরকার ছিল বাবা এমন করে একটা মরা মানুষকে বাঁচানোর। বাঁচার সুখ তো ফুরি গেছে কবে।
ঠিক এই সময় কালো ছাগলটা হেসে উঠল। ছাগলের হাসি কেউ কখনো দেখেছে কিনা জানা নেই নোটনবাবুর। তবু তাঁর মনে হল ছাগলটা হেসে উঠল। ফ্যাঁচ কিংবা ফিঁচ জাতীয় একটা শব্দ করে। নোটনবাবু অবশ্য ঘুরে তাকিয়ে হাসি দেখতে পেলেন না। কারণ ছাগলটা তখন একরকম নিরাসক্ত এবং উদার ভঙ্গিতে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাঁশবনের অন্ধকার দিকটায়। মানুষের জীবনের বাঁচা-মরা ক্ষুধা তৃষ্ণা সম্পর্কে তার যেন নতুন করে কিছু শোনার কৌতূহল নেই। এবং সম্ভবত এ-জাতীয় আলোচনার একঘেয়েমিতে সে ইদানীং বিরক্ত।
নোটনবাবুও মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত। কাঁহাতক এভাবে দাঁড়িয়ে বুড়ির বিড়-বিড়োনি শোনা যায়। তবু চলে যেতেও পারেন না, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। কারণ তাঁর শহুরে মনে হঠাৎ ন্যায় বোধটা মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে। সৈরভীর কথাগুলো তো সত্যি। গ্রামের মধ্যে . শতদলবাসীনীর সঙ্গেই তার

ছিল সবচেয়ে প্রাণের সম্পর্ক। দিনরাত খুটখাট ফাইফরমাস খেটেছে মায়ের। এ কথাটাও সত্যি, তার ছোটবেলার অনেকখানি গড়ন-গঠন ঘটেছে এই সৈরভীর হাতে।

তবু বিরক্ত হন নোটনবাবু। অন্য কোন কারণে নয়। বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে।

—ও সব তো জানি। কি বলার আছে বল।

—ঐ তো বননু বাবা। গায়ে বস্ত্র নেই। এক-খান থান কাপড় কিনে দে বাবা আমাকে। আর আমার মা-জননীকে গিয়ে কানে কানে বলবে, সৈরভী একদিন মা-জননীর হাতের মহনভোগ খেতে চেয়েছে। বললেই তিনি শুনবেন। দেশ থিকেন সুজিটা এগদম উঠে গেলো বাবা? উঠে কোথাকে গেল বল দিকনি। আহা! কত খেয়েছি একদিন মা-জননীর হাতে মহনভোগ। কিছমিছ দিয়ে, বড়ো এলাচ লবোঙ্গ দিয়ে করতেন, যেন অমৃতি। মা জননীকে বলবে বাবা, একদিন সুজির মহনভোগ খাবাতে।

—আচ্ছা বলবো।

নোটনবাবু আর দাঁড়ান না। চলে আসেন। সৈরভী বসে থাকে। বাঁশপাতার উপর পালিশ করা জুতোর মচমচানি ক্রমশ দূরে হারিয়ে যায়। বাতাসে হিমেল ভাবটা বাড়তে থাকে। সৈরভী চিন্তা করে তার যে একটা গামছা ছিল, সেটা এখন কোথায়। এই অন্ধকারে কি করে সে ঠাওর করবে, কোথায় পড়ে আছে। এখন সে দাওয়া ছেড়ে, উবু-ঘষটানি দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শোবে, ঐ গামছাটা পরে, পরনের থানটি হবে তার গায়ের চাদর।

সকাল বেলায় এক কৌটো খুদ আর মুঠো খানেক ডাল আর দুকুচি কুমড়ো নিয়ে খিচুড়ি রেঁধে খেয়েছে। এবেলা আর খিদে নেই।

—এত দেরী হল কেন তোমার?

প্রণাম করতেই প্রশ্ন করলেন হরিবাবু।

—ঐ একটু দাঁড়িয়েছিলাম। বুড়ি সৈরভীর সঙ্গে কথা বলছিলাম। অনেকদিন দেখিনি।

—শুনলাম। শশী বলছিল।

—দেখলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। সেবারে তেঁতুল গাছটা দেখলাম। এবার তো আর দেখলাম না? কি হল?

—দেখবে কোথ্যেকে। বেচে দিচ্ছে সব এক এক করে, তো আর দেখবে কি? নিজের কর্মফলে নিজে দুঃখ পাবে, আমরা ভেবে কি করবো তার! অতবড় একটা তেঁতুল গাছ, কত টাকায় বেচেছে জান? মাত্র ষাট টাকায়। শুধু কাঠই বেরোবে ওটা থেকে শ পাঁচেক টাকার, তা তোর যখন এতই পয়সার টান, বেচার

আগে তো গাঁয়ের দু-চারজনের সঙ্গে পরামর্শ করবি। সে সবে নেই। সেই জন্যে আমি আর ওর ওসব নাকে কান্নায় কান দিই না। বুঝলে, আর বুঝেই বা কি হবে বল। গাঁয়ে তো গরীব-দুখির সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। তুমি আমি একা একা কতজনকে কি সাহায্য করতে পারি বল? যা দিনকাল পড়েছে চোখ বন্ধ করে থাকাই বেস্ট।

—তামাক পেয়েছেন?

—তামাক? ও, হ্যাঁ। এখনো খাইনি। জল-খাবার খেয়ে খাবো। বড়বাজারের ঐ দোকানটা থেকেই কিনেছো তো? হ্যাঁ। তাহলে ঠিক আছে। আর এ পেলে নাকি? সুজি? সুজি, ময়দা এসব তো দুর্মূল্য হয়ে উঠল গ্রামদেশে।

—পেয়েছি। ব্ল্যাকে কিনতে হলো আর কি।

—সে আর কি করবে। যস্মিন দেশে যদাচার। আত্মীয় কুটুম্ব এলে কিছু করে খাওয়াতে হবে তো। সেবারে তোমার বড়মামা হঠাৎ এসেছিলেন। কোথা থেকে যেন সুজি জোগাড় করেছিলেন সের কয়েক। তাতেই চলছিল এতদিন। যাও, হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম নাও গে।

নোটনবাবু হাত মুখ ধুয়ে জলখাবার খেতে বসে বিরক্ত হয়ে উঠলেন মা শতদল-বাসিনীর ওপর।

—এটা কি করেছো?

—কেন? মোহনভোগ। ভাল ঘিয়ের তৈরী। বাড়ির ঘি। দালদা-ফালদা নয়।

—আমি যে এত কষ্ট করে কাঁধে করে এসব জিনিস বয়ে নিয়ে এলাম সে কি নিজে খাবার জন্যে? আমরা শহরে থাকি। পাঁচ রকমের পাঁচটা জিনিস খাই। তোমরা পাও না বলেই এত কষ্ট করে জোগাড় করা। বুঝতে পার না কেন বল তো?

—আচ্ছা ঠিক আছে, আজকের মত খেয়ে নে। আর দুবোনি বাবু। শতদল-বাসিনী ছেলের খাবারের কাছে বসে। কোলে নাতনী মিতুল। ডাকনাম মিতুল। ভাল নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। তার মুখে এখন দিন-রাত কথার ফুলঝুরি। এবং তার সমস্ত কথাই নিজের বানানো। ঠাকুমার কোলে বসেও সে যখন বাঁ হাত বাড়িয়ে নোটনবাবুর গরম লুচি আর মোহনভোগ দিয়ে সাজানো সাদা প্লেটটার দিকে ব্যগ্র হয়ে ঝুঁকে পড়ে অবিরত বলতে থাকে, কিচাকিচ, তখন সকলেই বোঝে সে কি চাইছে। নোটনবাবু মোহনভোগ থেকে বেশ পুরু দেখে একটা কিস্‌মিস্ বেছে নিয়ে মিতুলের মুখে তুলে দেন। মিতুল খিলখিল করে হেসে ওঠে। শতদলবাসিনীও নাতনীর দিকে তাকিয়ে হাসেন। এই সময় কল্যাণী, নোটনবাবুর স্ত্রী, মাথায় অল্প ঘোমটা চাপিয়ে চায়ের কাপ এনে

রাখল। মিতুল মাকে দেখে, নিজের জিভ বের করে চিবোনো কিসমিস দেখিয়ে বললে—কিচ্ মিচ্।
কল্যাণী কিছুটা স্নেহের সঙ্গে কিছুটা তিরস্কার মিশিয়ে বললে—আবার খাচ্ছো? জানেন মা, রান্নাঘরে বায়না করে পাঁচ ছটা কিসমিস খেয়েছে এই একটু আগে।
—হ্যাঁরে। তুই তো খুব পাজী।
শতদলবাসিনীর গলা জড়িয়ে মিতুল আরো জোরে হাসে। আপনা থেকেই হাসি ফুটে ওঠে নোটনবাবুর চোখে মুখে। এরকম হাসি-খুশীর সংসার দেখলে কার না খুশী বাড়ে। মনের খুশীতে সবটা মোহনভোগই খেয়ে নেন তিনি। খেতে সুস্বাদুও লাগে খুব। কলকাতায় মোহনভোগ নেই। যদি থাকতোও তাঁর মায়ের হাতের তৈরি মোহনভোগ কোথাও মিলতো না।
—জানো মা, আজ সেই বুড়ি সৈরভীর সঙ্গে দেখা।
—হ্যাঁ, শশী বলছিল।
—খুব মনটা খারাপ হয়ে গেল বেচারীকে দেখে। কি অবস্থা হয়েছে। শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে একদম। মা-জননী, মা-জননী করে কতবার তোমার কথা বলল। তোমার হাতের তৈরী মোহনভোগ খেতে চায় একদিন। কতবার করে বলল কথাটা। একদিন খাইয়ে দেবে? শতদলবাসিনীর চোখে মুখে সৈরভীর কথায় একফালি স্নিগ্ধ সস্নেহ আভা ফুটে ওঠে। কিন্তু তাঁর বাক্যে সে আভা থাকে না।
—তুই থাম্ তো। ওর এখন ঐ রকম একটা খাবো-খাবো ব্যামো দেখা দিয়েছে। হজম করার ক্ষমতা নেই। অথচ খাই-খাই রব শরীরে। তারপর খেয়ে যা সব ঘেন্নার কান্ড করে। সেবার তোর সেজকাকার বাড়িতে ঘণ্টের পৈতে-য় খেয়ে ও বুড়ি-র যাই-যাই হল না? তবে?
নোটনবাবু আর কোন কথা বললেন না। চায়ে চুমুক দিলেন। তাঁর মনের মধ্যে একটা অন্য কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল। একটা পরিণত মানুষ কত কিছুর কাছে কৃতজ্ঞ। কেউ তাকে আঁতুড়ঘরে মানুষ করে। কেউ মরণের অসুখ থেকে বাঁচায়। কেউ সাঁতার শেখায়। কেউ লেখাপড়া। একটা মানুষের বড় হয়ে ওঠা কি বিশাল ব্যাপার। কত মানুষ, কত লোকজন, কত চোখের দৃষ্টি, কত মনের টান, কত রোদ, জল, বাতাস, গাছের ফল, আলো, আগুন লাগে তার জন্যে। সৈরভী তাঁর কেউ নয়। অথচ ঐ সৈরভী ধোপানীর কত দিনের কত আদর-যত্নের ছোঁওয়া রয়ে গেছে তাঁর জীবনে। হঠাৎ মনে করিয়ে দিল বলেই মনে পড়ল নইলে···
রাত্রে কল্যাণী যখন শুতে এল নোটনবাবু বললেন, তোমার কোনো ছেঁড়াখোঁড়া শাড়ি আছে?
—কি হবে?

—আছে কিনা বল না।
—কি হবে বলবে তো।
—দেবো একজনকে।
—ওঃ। বুঝেছি। সৈরভী বুড়িকে তো?
—হ্যাঁ।
—হ্যাঁ। দিতে পারি। তবে তোমার মেয়ের জন্যে কলকাতা থেকে কাঁথা কিনে এনে দিয়ো ডজন খানেক।
নোটনবাবু প্রথম দফায় কল্যাণীর বিদ্রূপটা বুঝতে না পেরে হেসে বললেন—কলকাতায় আবার কাঁথা কিনতে পাওয়া যায় নাকি?
—তাহলে আকাশ থেকে পেড়ে এনো। তোমার মেয়ের রোজ ছটা আটটা করে কাঁথা লাগে। এই তো পাশে শুয়েছ। দেখবে রাত্রে কবার উঠতে হয় কাঁথা পাল্টাতে। কত শাড়ি কিনে দিয়েছ যে রাশি রাশি ছেঁড়াখোঁড়া শাড়ি থাকবে?
নোটনবাবু আর বেশী কথা বাড়ান না। তিনমাস পরে বাড়ি এসে বৌ-এর সঙ্গে মেলামেশার প্রথম রাতটাকে তর্ক-বিতর্কে তিতো হতে দেওয়ার মতো নির্বোধ নন তিনি। তাই শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত একটি কথা খরচ করে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন।
—আলোটা নেভাবে না?

—ও বুঁচি। বুঁচি। আলো ও বুঁচি। আ মোলো। কানে পোকা পড়ল নাকি সকলের। কেউ সাড়া দেয় না যে।
বুঁচিদের বাড়ির পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে সৈরভী চীৎকার করে। হাতে লাঠি। লাঠির উপর ভর দিয়েও তার সারা শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।
সৈরভীর ডাক কারো কানে যায় না তার কারণ বুঁচিদের পাশের বাড়িতে ধানভানা চলেছে ঢেঁকিতে। তার আওয়াজে বাতাস গমগম।
সৈরভী পুকুরপাড় ছাড়িয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে যায়। আবার ডাকে। সাড়া পায় না কারো। রাগে সৈরভীর শরীরের কাঁপুনিটা বেড়ে যায় আরো। সেই সময় কে যেন ডাকে তাকে।
—ও পিসী, ইখেনে কি গ তমার।
—কে তুই র‍্যা?
—আমি মানিক গ, মানিক।
—অ। রস্‌কে তাঁতির ছেলে। শুনে যা তো বাবা একবার ইদিকে। এই বুঁচিটাকে একবার ডেকে দে তো। ডেকে ডেকে হদ্দ হয়ে গেলাম। কেউ একটা সাড়া দেয় না।
দিচ্ছি।

বুঁচি শ্রীনিবাস মান্নার ছোট মেয়ে। বছর দশেক বয়স। ভারী চালাক চতুর। কাজেও দড়। ঐটুকু মেয়েকে দোকান করতে পাঠালেও একেবারে কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে জিনিস কিনে আনে।

সৈরভীর প্রতি বুঁচির কি করে যেন একটা আঁতের টান গড়ে উঠেছে। ডাকলে না-ডাকলেও রোজ একবার করে ছুটে আসে সৈরভীর ভিটেয়। বললে না-বললেও নিজের খেয়ালে অনেক কাজ করে দিয়ে যায়। রান্নাও করে দিয়েছে কতদিন। গা-ভাত জ্বর, কি পেটের ব্যামোয় কাপড়চোপড় ঘরদোর একশা। বুঁচি এসে বাঁচিয়েছে। অন্ধকারে ঘরবার থৈ থৈ। কে পাড়ে পিদিম। কোথায় বা তেল। কেই বা পাকায় সলতে। বুঁচি ছুটে এসে সব জোগাড়-যন্তর করে প্রদীপ জ্বেলে তুলসীতলায় প্রণাম করে শাঁখ বাজায়।

সেই বুঁচিকে আজ বড় দরকার পড়েছে সৈরভীর। সে যাবে নোটনবাবুর বাড়ি। তার মা-জননীর কাছে। সেই যেদিন নোটনবাবুর সঙ্গে কথা হল, তারপর থেকে সৈরভী রোজই আশা করেছে, মা-জননীর ডাক এল বুঝি এইবার। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু করতে করতে কতদিন হয়ে গেল। রাগে অভিমানে সৈরভী মনে মনে কেঁদেছে। ভদ্রলোকের ঘরের ছেলে। নিজে মুখে বলে গেল, ডেকে একদিন মোহনভোগ খাওয়াবে। আর কিনা সাড়াশব্দ নেই। কদিন ধরে গায়ে হাতে পাষাণের মত ভার ছিল। বাতিক জ্বর। কাল থেকে একটু কম।

আজ দুপুরবেলায় উঠোনের রোদে চাটাই পেতে শুয়ে ছিল। শুয়ে ঘুমিয়েও পড়েছিল। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে সে যেন শুনতে পেল তার মা-জননীর গলা।

—আর একটু খাবি? দেবো?

সে খাচ্ছে। আর তার মা-জননী তাকে পাশে বসে খাওয়াচ্ছে। ঘুম ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৈরভীর সারা শরীরটা আইঢাই করে উঠল খিদেয়। তার দাঁত, জিভ, টাকরা, হাড়, মাস, গ্রন্থি, সমস্ত কিছুর ভিতর গর্জন করে উঠল একটা প্রচণ্ড হাহাকারের ধ্বনি। খিদে, খিদে।

স্বপ্নে পাওয়া খাবারের স্বাদ যত চোখ থেকে মন থেকে হারিয়ে যেতে লাগল, সৈরভীর সমস্ত অন্তরাত্মা ততই ব্যাকুল হয়ে উঠল খিদের তাড়নায়। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করল বেরিয়ে পড়বে। এ তো স্বপ্ন নয়। স্বপ্নের মধ্যে সে যখন তার মা-জননীর অবিকল স্নেহময় গলার স্বর শুনেছে, এ তো স্বপ্ন নয়। স্বপ্নের ভিতর দিয়েই তাকে ডাক পাঠিয়েছে মা-জননী।

ঘরের কোণা হাতড়ে হাতড়ে লাঠিটা খুঁজে সে বেরিয়ে পড়েছে তাই বুঁচির খোঁজে। বুঁচি যদি সঙ্গে না থাকে, একা একা সে যেতে পারবে না। খাবার নিমন্ত্রণে বেরিয়ে সে যদি পুকুরে পড়ে মরে যায়, মা-জননীর খাবারটাই নষ্ট হবে।

—সৈরদিদি, ডাকতেছিলে ? কেন গ ?
বুঁচি এসে দাঁড়ায় সৈরভীর সামনে। দু হাতে ধুলোর মত ডালের গুঁড়ো লেগে।
—অ। বুঁচি এসেছু। চল্ না একবার মোর সাথে।
—কোথাকে ?
—হরিবাবুদের বাড়ি।
—আমি ডাল ভাঙতে বসেছি যে।
—চল না মা। সোনা মা আমার। ফিরে এসে আবার বসবিখন। মোর নিমতন্নো রয়েছে যে। তুই না সঙ্গে গেলে মোর আর যাবা হবে নি।
—তুমি দাঁড়াও। মাকে জিজ্ঞাসা করে এসি।
যেমন ছুটে এসেছিল বুঁচি তেমনি ছুটে ঘরে চলে যায়। মানিক ছেলেটা বুঁচিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে শিস দিতে দিতে। সৈরভী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মাটিতে বসে পড়ে। মিনিট সাত আট পরে বুঁচি বেরিয়ে আসে।
—চল গো সৈরদিদি।
সৈরভী লাঠির ওপর ভর দিয়ে টলমল করতে করতে এগোয়। বুঁচি পিছন পিছন। কখনো কখনো হাত ধরে তার বেতাল চলাকে সামলায়, খানিকটা গিয়েই হঠাৎ বুঁচির মনে একটা খটকা জাগে।
—হ্যাঁ গো, সৈরদিদি, এখনতো দুপুর বেলা। এখন কিসের নিমন্তন্নো গো ? কি খাওয়াবে তমাকে ?
—সে তুই বুঝবিনী। আমার মা-জননী ডেকে পাঠিয়েছে মোকে। কি খাওয়াবে তোকে বললে তুই বুঝবি ? তরা জোম্মে কখনো খাউনি। তরা জন্মেছিস আকাল-অকালের সময়। উ সব জিনিস চোখে দেখেছু নাকি ? সুজির মহনভোগ খেয়েছু কখনো ?
—মহনভোগ ? না তো। কি দিয়ে বানায় গো ?
—সে অনেক কিছু। সুজি থাকে, ঘি থাকে। বড় এলাচ থাকে। লবোঙ্গ থাকে। তেজপাতা, ডালচিনি, কিসমিস থাকে। তবে আমার মা-জননী যেমনটি বানায়, তাতে যেন আরো কিছু থাকে। কি থাকে কে জানে। কতো হাতেরই তো মহনভোগ খেয়েছি। অমন স্বাদটি আর পেলুম নি।
হঠাৎ যেন সত্যি সত্যি মোহনভোগের গন্ধটা নাকে এসে লাগে সৈরভীর। প্রথমে মৃদু। তারপর উগ্র। যেন গরম মোহনভোগের পাত্র কেউ সামনে এনে রেখেছে তার এইমাত্র। এখনো ধোঁয়া উঠছে। ধীরে ধীরে সেই গন্ধ সৈরভীর শরীরের মধ্যে ঢুকতে থাকে। ধীরে ধীরে যেন মাংস গজাতে থাকে তার শরীরে। চোখের ছানি তার দৃষ্টির সামনে কুয়াশার মত যে সাদা পর্দাটা টাঙিয়ে রেখেছিল

এতদিন, সরে যেতে থাকে ক্রমশ। নিশবাসে প্রশবাসে অনেক বেশী জীবনশক্তি তাকে সহসা অভিভূত করে তোলে।
যদিও পরনে ছেঁড়া কানির ময়লা টুকরো, গোড়ালি থেকে হাঁটু, বুক থেকে মাথা পর্যন্ত সবটাই নগ্ন, তবু তার মনে হয় দেহটা যেন আগাগোড়া শাড়িতে মোড়া। তার মাথায় সিঁদুর। পায়ে আলতা। হাতে শাঁখা চুড়ি। চোখে লজ্জা। শরীরে কাঁচা বয়সের যৌবন। তার প্রত্যেক বারের পদক্ষেপে মাটির উপরে শব্দ হচ্ছে রুপোর তোড়ার ঝমঝম।
—আরে অ বুঁচি কতটা এনু রে?
—কতটা আবার? এই তো মোটে সাঁতেদের পান বরোজ। এরপর মড়লদের বাড়ি। তারপর চন্দনপিঁড়ির মাঠ। তবে তো বামুনপাড়া।
—ও মা, বলিস কি? তাড়াতাড়ি পা চালা।
—তুমিই তো হাঁটতে পারতেছনি। আমি পা চালিয়ে কি করব।
সৈরভীর ধাঁধা লাগে। সে এত জোরে হাঁটছে, এবং শুনতে পাচ্ছে তার পায়ের তোড়ার ঝমঝম উল্লাস, তবু পথ কেন শেষ হয় না। জোরে যদি না হাঁটতো সে, তাহলে গায়ে ঘাম ঝরতো নাকি এত?
—হ্যাঁলা বুঁচি, তোর ঘাম দিচ্ছে?
—ঘাম। কই না তো?
—মোর এত ঘাম দিচ্ছে কেন বলতো? একটু ছাবায় ছাবায় চলতো।
ছাবাতেই তো চলতেছি। রোদ কই?
—রোদ নেই? তবে সামনে অমন ধু ধু কি জ্বলতেছে?
—কই? কোথায়। সামনে?
—তর চোখ গেছে বুঁচি, বুঝলি! কিছু কি দেখতে পাউনি চোখে, না কি?
—সামনে তো চন্দনপিঁড়ির মাঠ।
—মাঠে আগুন জ্বলতেছেনি? লাল লাল হলুদ হলুদ?
—কই। মাঠে তো পাকা ধান।
—পাকা ধান? এবার ধান উঠবে বুঝি? লক্ষ্মী এসতেছেন?
—হ্যাঁ গো।
—খুঁব পিঠে খাবি এবার। পৌষ পিঠে। তর মাকে বলবি তো, মোকে যেন ডাকে এগদিন।
—বোলবোখন।
—নতুন গুড় দিয়ে খাবো। বলবি। বুঝলি।
—আচ্ছা খাবেখন। তুমি অত টলতেছ কেন?
—দাঁড়া। একটু জিরোই তবে। হাঁপি গেছি। পেটে কিছু থাকলে তবে তো জোর থাকবে। সেই যে তুই সিদ্ধ করে দিয়ে এলে, সেই শেষ খাবা। তবে?

বসবে ? ও সৈরিদিদি, আগো ওখেনটায়। উঠে উঁদিকের গাছতলাটায় বোসো
া।
তুই থাম বাবু। মাথাটা ঝিমঝিম করতেছে মোর। দেহটা আঁক-পাঁক করতেছে
যন। একটু জল খাবাতে পারু ?
জল ? পুকুর তো আছে। আনি কিসে করে ?
দেখ না মা। কি করে আনতে পারু। বড় তিষ্টে।
দেখি থালে।
ঁচি জলের খোঁজে ছুটে যায়। সৈরভী দুহাতে লাঠি ধরে রাস্তার গোবরের
পর বসে থাকে। তার মাথাটা ক্রমশ ঢুকে যায় টাগরার ভিতর। এত ভিতরে
য গরম মোহনভোগের থালা সামনে এনে ধরলেও, জিভটাকে টেনে বের করা যাবে
া।
মোহনভোগ নয়, এক গণ্ডূষ জলের জন্যে সৈরভীর সমস্ত অন্তরাত্মা ছটফট করে
ঠেছে এখন।
বঁচি, জল পেলু ?
যতান্তই ক্ষীণ একটি আওয়াজ বেরুল সৈরভীর গলা দিয়ে। সৈরভী বঁচির
ায়ের সাড়া শুনতে পেল না। ধপাস করে একটা শব্দে সে বুঝতে পারল তার
রীরটা লাঠি সুদ্ধ ডান দিকে হেলে মাটির ওপর শুয়ে পড়ল।
াঁতেদের বাড়ি থেকে একটা কাঁসার গেলাস জোগাড় করে ঘোষেদের বাড়ির পুকুর
থকে জল আনতে বেশ একটু দেরি হয়ে গেল বঁচির। ছুটতে ছুটতে সে যখন
সরভীর সামনে এসে দাঁড়াল, তখন তার হাঁ-করা মুখে মাছির হাট।

হেমন্ত ছাদে। মুখে সিগারেট। চুলে ঝোড়ো হাওয়া সমুদ্রের। কপালে ঝাঁপানো চুলের লুটোপুটিতে ঝাপসা তার চশমার কাঁচ। ঘরের ভিতর থেকে ডাক এল শ্যামলীর।

—এই, শোনো একবার।

বিরক্ত হলো হেমন্ত। একটু আগে ফিরেছে বাজার করে। বাজার তো নয়, কেনা-কাটার পাহাড়। একটা গোটা মুদিখানাই বলা যেতে পারে। ক'মিনিট হল দাঁড়িয়েছে ছাদে। এর মধ্যেই তিনবার ডাক। হেমন্তর ভাল লাগে না। পাশের ঘরের ভদ্রলোকেরা ভাববেন, লোকটা বুঝি স্ত্রৈণ। স্ত্রী ডাকলেই দৌড়চ্ছে। সেটাও বড় কারণ নয়, বিরক্ত হওয়ার। কলকাতা থেকে এতগুলো মাইল দূরে, এত ঝড়-ঝাপটা পুইয়ে আমরা কেন ছুটে এলাম এখানে? ঘর সাজাতে? চলো কোথাও যাই, চলো কোথাও যাই, দিনরাত শ্লোগানের মত কানের সামনে বাজিয়ে চলেছিলে কি এই জন্যে? সমুদ্রের তীরে এসে সেই সংসারের খানা-ডোবায় ডুবে থাকবে বলে? হোল্ড-অলটা না হয় দুপুরেই খোলা হোতো! কিংবা খাওয়ার পর। এখুনি বিছানা পাতার কী দরকার? আমরা এখুনি

ুচ্ছি ? ট্রেনের ময়লা-জামাকাপড়গুলো আজ না কেচে কাল কাচলেও চলতো। আমরা তো পলাতক প্রেমিক-প্রেমিকার মত এক কাপড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে আসি নি।

প্রায় চার ঘণ্টা হল আমরা এখানে এসে পেঁৗচেছি। শ্যামলী, এই চার ঘণ্টায় তোমার একবারও ইচ্ছে করল না সব ছেড়ে ছাদের এইখানে ছুটে আসতে? একটু াসতে? একটু মুগ্ধ হতে? সমুদ্র তোমার পায়ের তলায়। অনুগতের মতো। একই দৃশ্য, তবু বারে বারে নতুন। একই ধ্বনি। তবু বারে বারে নতুন ুর। নতুন সংলাপ। তোমার আর সমুদ্র হতে ইচ্ছে করে না শ্যামলী? নিজেকে বদলে-বদলে নতুন করতে?

ঘরের ভিতর থেকে আবার ডাক এলো শ্যামলীর।

—এই, শুনে যাও না একবার।

হেমন্ত ঘাড় না ঘুরিয়েই উত্তর দিল, যাই।

সে কথা সম্ভবত শ্যামলীর কানে গিয়ে পেঁৗছল না। সমুদ্রেব গরগরে গর্জনে। য়তো শীত-মাখানো ঝোড়ো হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গেছে অন্য দিকে। পাশের রের অর্থাৎ মিঃ হালদারের ছেলে-মেয়েরা দৌড়-ঝাঁপ করে চলেছে ছাদের উপর। য়তো তাদেরই তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেছে অন্য দিকে। মিঃ হালদারের ছেলে মেয়েগুলো অসম্ভব মোটা। থপথপে। যেন মনে হয়, ওদের পাঁয়ের তলায় কোথাও একটা ফুটো আছে। সেই ফুটোয় মুখ রেখে বেলুনের মত ওদের ফুলিয়ে দিয়েছে কেউ। মিঃ হালদারও মোটা মানুষ। কিন্তু ওদের মত বেঢপ য়। মিসেস্ হালদার কিন্তু আশ্চর্য ব্যতিক্রম। যদিও মাত্র এক পলকের দেখা, তবু মনে হয় যেন মিঃ হালদারের চেয়ে লম্বা। এখনো বেশ সুশ্রী। রালো। তিনটি সন্তানও ধ্বস নামাতে পারে নি শরীরে। হাতের সিগারেট ুড়ে গেছে। সেটা বাতাসে ছুঁড়ে দেয় হেমন্ত। বাতাসে যেন পাল্টামারে, সটাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয় হেমন্তের দিকে। আবার একটা সিগারেট ধরাতে চ্ছে করে হেমন্তর। কিন্তু সে জানে এখানে দাঁড়িয়ে ধরানো যাবে না। দেশ-াইটাও স্যাঁতসেঁতে।

শ্যামলী ঘরের ভিতর থেকে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এবার। শাড়ির াঁচল কোমরে জড়ানো। খোঁপা ঘাড়ের উপরে উঁচু এবং শক্ত করে বাঁধা। চোখে বিরক্তি। মুখে ব্যস্ততা। হাতে মস্ত লম্বা সাদা টোন দড়ি।

—কি হল, ডাকছি তখন থেকে, শুনতে পাচ্ছ না।

হেমন্ত ছাদের প্রান্ত থেকে ঘরে আসে।

—কি আবার?

—এই সব এক রাশ জামা-কাপড় কোথায় রাখবো বলতো? না আছে আলনা, া আছে একটা আলমারী।

—দেয়ালে পেরেক নেই ?

পেরেক থাকলে কি হবে ? এত জিনিসপত্র একটা-আধটা পেরেকে রাখা যাবে নাকি ?

—যাক গে, এখন কি করতে হবে বল।

—দড়িটা টাঙাবো। কি করে টাঙাই বলতো, এদিকে একটা ওদিকে একটা পেরেক না মারলে।

—আচ্ছা সে হবে খন। এখন রাখো। চলো বেরোই।

—কোথায় ?

—সমুদ্রে। স্নান করে আসি!

—বাঃ বাঃ, বেশ কথা বলতে পারতো। এই বিছানা-টিছানা, জামা-কাপড়, জিনিসপত্র ডাঁই হয়ে পড়ে থাকবে এই রকম ? নীচে গিছলাম। বিবিজী বলল, একটা ঝি-এর ব্যবস্থা করে দেবে। এখনো তো কেউ এল না। চৌবাচচায় যেটুকু জল ছিল, শেষ। সকালবেলায় কাপ-ডিস শুকিয়ে খড়খড়ে। মাছি বসছে এইসব নোংরা দেখলে আমার গা ঘিন ঘিন করে।

—সমুদ্রে চলো। গা ঘিন ঘিন করবে না।

—কানের কাছে অত সমুদ্র সমুদ্র কোরোনা তো। আমার ভাল লাগে না। সমুদ্র কি পালিয়ে যাচ্ছে নাকি ? তুমি কি দুটো পেরেকের ব্যবস্থা করবে ?

— কার কাছে পেরেক খুঁজতে যাবো আমি ?

— তবে থাক্। পড়ে থাক সব যেমন আছে!

শ্যামলী হাতের দড়িটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দেয় মেঝেয়। হেমন্ত বুঝতে পারে শ্যামলী সমুদ্র হয়েছে। এখন আর কিছু বললে ঢেউ এর ছোবলে আছড়ে মারবে পেরেকের সন্ধানে উঠে পড়ে সে।

ছাদে-ওঠা সিঁড়ির দু-পাশে দুখানা ঘর। বাঁ দিকেরটায় তারা, ডানদিকেরটায় মিঃ হালদারেরা। হেমন্তরা পৌঁচেছে আজ সকালে। ওঁরা এসেছেন চারদিন হল। হেমন্ত মিঃ হালদারের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মিঃ হালদার একটা ইংরেজী পত্রিকা পড়ছিলেন। গায়ে সাদা হাফ শার্ট। পরনে রঙীন লুঙি। একটা ইজি-চেয়ার পেয়ে গেছেন কিভাবে। তাতেই পা-এলানো ভঙ্গী। হেমন্তকে দেখে খানিকটা সিধে হয়ে বসলেন মিঃ হালদার।

—আরে আসুন, আসুন। বসুন।

—না, বসবো না। একটা জিনিসের খোঁজ করতে এলাম। যদি থাকে—

— কি বলুন তো ?

— পেরেক। একটা কি দুটো।

— ওঃ বুঝেছি। দড়ি টাঙাবেন। আমাদেরও মশাই এইরকম সমস্যা হয়েছিল আমরাও আনিনি। নীচে গিয়ে মিঁয়া সাহেবের কাছ থেকে জোগাড় করলুম

মিঁয়া সাহেবের কাছে গেলে, পেয়ে যাবেন।

—ধন্যবাদ। বিরক্ত করলুম —

—না, না। বিরক্তের কী আছে। বসুন বসুন। চা খান। মানু-উ, ভানু-উ, ঝুম-পা-আ-আ, তোমাদের মা কোথায় ডাকতো-ও। একটু চা হোক।

—মিঃ হালদার, এখন থাক। পরে এসে খাবোখন।

—পরে কেনো? তাড়ার তো কিছু নেই। আপনার মিসেসকেও ডাকুন না। ওঁর সঙ্গে তো এখনো ভাল আলাপ হোলো না। খুব ব্যস্ত বুঝি ঘর-সংসার গোছাতে?

হেমন্ত হাসে, রঙীন বিজ্ঞাপনের মতো।

—হ্যাঁ, ঐ আর কি। এখন আসি।

হঠাৎ বোকার মত নমস্কার করে নীচে নেমে যায়। খানিক পরে উপরে উঠে আসে। হাতে হাতুড়ি আর পেরেক। শ্যামলী বাথরুমে। দরজাটা খোলা। এঁটো কাপ ডিস ধুচ্ছে। হেমন্ত শ্যামলীকে শুনিয়েই বলে।

—জানো, খুব জোর টাইমে এসে গেছি আমরা। নীচে গিয়ে দেখি, একটা নতুন ফ্যামিলি এসেছে। কোথাও ঘর পাচ্ছে না। এবছর নাকি হঠাৎ খুব ভীড়। একদিন দেরী করলে ছাদের ঘরটা আর পেতুম না।

শ্যামলীর কাছ থেকে কোনো সাড়া আসে না। হেমন্ত দেয়ালে পেরেক পোঁতায় মন দেয়। প্রথমে বাথরুমের দিকের দেয়ালে পেরেক মারে। তারপর বাইরের দরজার দিকের দেয়ালে। পেরেক মারাটা যখন মাঝপথে, ঠিক সেই সময়েই তার চোখে পড়ে যায় একটা দৃশ্য। দৃশ্য নয়, দেওয়ালের গায়ের কিছু লেখা। মোটামুটি বড় হরফের।

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থী।

আমরা দুজনে চলতি-হাওয়ার পন্থী।

লেখার পাশেই একটা ছবি। নারীর মুখশ্রী। কয়েকটা সরল, সবল টানে চোখ, চুল, নাক, ঠোঁট, কান। চোখের তারায় যেন হাসি। ঠোঁটের ভাঁজে যেন লেখা আছে, আমি সুখী।

হেমন্ত চোখ ঘোরায় ছবিটার লেখাটার উপরে নীচে। আরো কিছু আছে কিনা খুঁজে নিতে। আর ঠিক সেই সময়ে তার চোখে পড়ে দুটো নাম। হেমন্ত আর নন্দিতা। একি, তোমরা এখানেও? ঠিক এই ঘরেও? আশ্চর্য।

গেলাসে সোডা ঢাললে তলা থেকে যেমন অজস্র বুদবুদ ঠেলে উপরে উঠে আসতে চায়, ঠিক তেমনিভাবেই তার বুকের ভিতর থেকে কিছু যেন ঠেলে উপরে উঠে আসতে চাইছিল। যেন অজস্র বুদবুদ তৈরী হয়েছে তার রক্তে। হেমন্তর মাথা ঘুরতে থাকে।

আও কয়েকটা ঘা মারার দরকার ছিল পেরেকে। হেমন্ত হাতুড়ি চালায়।

হাতুড়ীটা ছিটকে গিয়ে লাগে তার পেরেক-ধরে থাকা বুড়ো আঙুলে। কঁকিয়ে ওঠে হেমন্ত, মুখের মধ্যে বুড়ো আঙুলটা পুরে দিয়ে।

– উঃ, অঃ, আঃ। গেলাম।

শ্যামলী বাথরুম থেকে ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করে

কি হল আবার।

–গেছি একদম। হাতুড়ি মেরে বসে আছি নিজের আঙুলে। ডেটল্ আছে ?

–আশ্চর্য মানুষ বটে। একটা পেরেক মারবে, তাতেও…

হেমন্ত বুড়ো আঙুলটাকে দেখে। নখের ভিতরটা লাল। কাটে নি। থেৎলে গেছে।

–ডেটল নেই ?

–শ্যামলীর মধ্যে কোনো ব্যস্ততা নেই।

–দাঁড়াও দেখছি।

শ্যামলী বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে। সুটকেশ খোলে। এদিক ওদিক উলটে-পালটে খোঁজে। ডেটল পায় না।

–কি জানি, দেখতে তো পাচ্ছি না।

হেমন্ত হঠাৎ গরম হয়ে ওঠে।

–পাবে কি করে, এনেছো কি যে পাবে ? এসব দরকারী জিনিস তো তোমার মনে থাকবে না। মনে থাকবে সাবান, সেণ্ট, পাউডার, চা, চিনি, কৌটো-বাওটা, ন্যাকড়া, দড়ি-ই-ই।

–বাজে কথা বোকো না। কত বস্তা-বস্তা স্নো-সেণ্ট-পাওডার এনে দিয়েছো তুমি ? আমি রাখি, তাই থাকে। তোমাদের সংসারে কেউ কোনো জিনিসের যত্ন করে ? এসব কথা বলতে গেলে, দিয়ে তারপর বলতে হয়। নিজের বৌকে দেবার বেলায় তো তোমার হাত সরে না। মা কি ভাববে, বাবা কি ভাববে, বোন কি ভাববে, তাতেই অস্থির। এই যে দুদিনের জন্যে সমুদ্রে বেড়াতে এসেছি, আমি কি, আর জানি না, এর জন্যে কত রকম খোঁটা খেতে হবে।

হেমন্ত চুপ করে শোনে। প্রতিবাদ করে না। পঞ্চানন্দকে ধুনোর গন্ধ দিতে নেই। কিন্তু মনে মনে কথা বলে সে।

আমাকে তুমি ছোট করতে চাইছ শ্যামলী ? যে কোন কথাকাটাকাটিতে তুমি কী অনন্তকাল ঐ একটা কথাই বলে যাবে, কিছু দিইনি। হ্যাঁ দিইনি। কিন্তু সেটা কৃপণ বলে নয়। দিতে পারার মত সম্বল নেই বলে! কিন্তু আমাদের সুখের সবটুকুই কি নির্ভর করছে শুধু কিছু সামগ্রীর উপর ? আকাশ থেকে, বাতাস থেকে, গাছ থেকে, ফুল থেকে কিছু নিতে পারি না আমরা ? সেদিন মেজমামার মেয়ের বিয়েতে যখন শ্যামবাজারে নেমে বাস বদলাচ্ছিলাম, তোমাকে

যে কতবার করে বললুম, একটা বেলফুলের মালা কেনো, কেন কিনে জড়ালে না খোঁপায় ? অভিমানে ? যেহেতু তোমার অনেক গয়না নেই, মেজমামাদের বাড়ীর বৌদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো ? আমারও তো অনেক কিছু নেই, অনেকের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত। গাড়ি নেই, বাড়ি নেই, টেরিলিনের স্যুট নেই, পাঁচ জোড়া জুতো নেই, গ্রীষ্মের গগল্‌স্ নেই, রিস্টওয়াচটা পুরনো। এ্যাটাচি ব্যাগটা ফাটা। জীবনে কখনো সোনার বোতাম পরিনি আমি। তবু তো আমার মৃত্যু হয়নি। আমার ভিতরে অন্য একটা হেমন্ত, যে স্বপ্ন দেখতে জানে, বেঁচে রয়েছে এখনো। এখনো তো অনেক কিছু ঘটতে পারে শ্যামলী। আমি ডক্‌টরেটের জন্য তৈরী হচ্ছি। আর তিনবছর বাদে আমার সাত হাজার টাকার লাইফ-ইন্সিওরেন্সটা ম্যাচিওর করবে। শম্ভুকে বলে রেখেছি, জমির কথা। বিরাটির দিকে জমি এখানো সস্তা। কিনতে পারি। চাকরীতে প্রমোশন ঘটে যেতে পারে। প্রফেসর ভটচাযি্যর হয়ে নোট বই লিখছি। লাগতে পারে। আমি তো নিজেকে শুকোতে দিইনি।

॥ ২ ॥

—কি মশাই, একা কেন ? মিসেস কই ?

উঁচু বাঁধের ঢালু বেয়ে গরম বালি ঠেলে সমুদ্রে নামছিল হেমন্ত। দেখতে পেল সপরিবারে মিঃ হালদারকে। সঙ্গে নুলিয়া। নুলিয়ার হাতে ভিজে কাপড় আর একটা প্লাসটিকের ব্যাগে পাঁচ জোড়া জুতো।

—স্নান হয়ে গেল বুঝি আপনাদের ?

—হ্যাঁ। আপনার স্ত্রী এলেন না ? একা যাচ্ছেন যে ?

—না। ট্রেন জার্ণিতে শরীরটা খারাপ। কাল থেকে আসবে।

—সেকি মাশাই ? সমুদ্রে এসে বালতির জলে স্নান ?

মিঃ হালদার হেসে উঠলেন। খুব জোরে নয়। তাঁর হাসি সংক্রামিত হল অন্যদের মুখে। তাঁর গাবদা-গোবদা ছেলেমেয়েগুলোও হেসে উঠল।

মিঃ হালদারকে এই প্রথম খালি গায়ে দেখল হেমন্ত। বুকের মাঝখানে ঝোপ-ঝাড়ের মত ঘন চুল। পরনে সাদা হাফ প্যাণ্ট। সেটার সারা গায়ে বালি।

—শুনুন মশাই, আপনি তখন এলেন। চা না খেয়ে চলে গেলেন বলে উনি রাগ করছিলেন।

মিঃ হালদার তাঁর মিসেসের দিকে ঘুরে তাকালেন। হেমন্তও এই ফাঁকে একবার তাকিয়ে নিল। ভদ্রমহিলার চুল থেকে, শাড়ি থেকে, গা থেকে টস্‌ টস করে জল গড়িয়ে পড়ছে বালিতে। বালি যেন প্রকৃতির ব্লটিং পেপার। জল শুষে নিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে।

—আজ সন্ধ্যায় কিন্তু আপনাদের আসা চাই। একটু চা খাবেন।

হেমন্ত বিনীত হাসার চেষ্টা করল। মিসেস হালদার বললেন,

—আসবেন কিন্তু। আপনার মিসেসকে আমি গিয়ে বলবো।

—এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমরা তো আছি।

—তা হোক। সেই যে বঙ্কিমচন্দ্র না সজনীকান্ত কে যেন লিখেছিলেন না, বঙ্গের বাহিরে বাঙালী মাত্রেই সজ্জন, সেই আর কি। কদিন ছাদের ওপরে আমরা একা একা ছিলাম। একটু ভয় ভয় করতো। যতই হোক বিদেশ। কি বলতে কি ঘটে। আপনারা আসায় বেশ ভাল লাগছে এখন। বাঙালী বড় কম এখানে। দেখছেন তো?

—খুব কম বলবেন না। আজ সকালেই বেশ কিছু এসেছে।

হেমন্তর ইচ্ছে করে এই সঙ্গে মিঃ হালদারের ভুলটা·ভেঙে দেয়। কথাটা সঞ্জীবচন্দ্রের, কিন্তু ভাঙে না।

—তাহলে আসছেন তো?

হেমন্ত ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

মিঃ হালদারেরা চলে যান। হেমন্ত সমুদ্রের দিকে নামে। কিন্তু সমুদ্রে নামে না। সমুদ্রের আছড়ে-পড়া ঢেউ-এর সাদা ফেনায় পা ডুবিয়ে হাঁটে কিছুক্ষণ। কিছুক্ষণ মুঠো ভর্তি করে ঝিনুক কুড়োয়। মুঠো ভরে উঠলে সেগুলোকে ফেলে দেয়, আবার ভরে।

বুকের ভিতরে একটা টসটসে ব্যথা হেমন্তর। ঠিক যে ভাবে সে জীবনটাকে গড়তে চেয়েছিল হোল না। শ্যামলীর কাছ থেকে সে যা প্রত্যাশা করেছিল, পেল না। কেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল এ-রকম? শ্যামলীর জন্যে? না আমার দোষে? শ্যামলীর বদলে নন্দিতা এলে কি অন্য রকম হতো? নন্দিতা তাহলে এল না কেন? জন্ম মৃত্যু বিবাহ নিয়তির লেখা বলে?

হেমন্ত বালি খুঁড়তে থাকে পাঁচ আঙুলে। দেখতে দেখতে বেশ একটা গর্ত তৈরী হয়, বড় মাপের। তার মনের ভিতরের চাপা অভিমান আর আক্রোশ তাকে উৎসাহ জোগায় এই কাজে। সে দাঁতে দাঁত চিপে রাখে। যেন দাঁতের কোন কিছুকে সুপুরির মত চিবিয়ে গুঁড়ো করতে চায়। সমুদ্রের একটানা শব্দটা তার কাছে যেন হাসির মত বাজে। কার হাসি? নিয়তির না নন্দিতার?

খুব হাসছো তুমি নন্দিতা, তাই না। হেসে হেসে ঘুরে বেড়াচ্ছো সারা ভারতবর্ষ! আমাকে ঠাট্টা করার জন্যে। নাকি প্রতিশোধ নেবার জন্যে। বেছে বেছে হেমন্ত নামেরই একজনকে বিয়ে করলে? এখন খুব সুখী হয়েছ তাই না? তুমি সুখী হয়েছ দেখে আমিও সুখী। আমার কাছে এলে এতো সুখ পেতে না। ছাত্রজীবনে আমাদের সকলের চোখ একরকম। সব চোখেই স্বপ্নের কাজল। সকলেই জানে, আগামীকালের স্বর্গ তার হাতের মুঠোয়। তারপর, কালো গাউন পরে হাতে ডিপ্লোমা নেবার পর বদলাতে থাকে রঙ। কেউ হতে থাকে ঐ গাউনের মত কালো। কেউ কফির মত ঈষৎ লাল। কেউ সিগারেটের

মত সাদা। কেউ এগ টোস্‌ট বা ফ্রেঞ্চ টোস্‌টের মত সোনালী।

আমার চোখে আকাশ দেখেছিলে তুমি একদিন। ওরই আরেক নাম, সর্বনাশ। একবার একটা চিঠিতে লিখেছিলে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত লাইন, 'তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।' তার উত্তরে আমিও চিঠির শিরোনামায় বসিয়ে দিয়েছিলাম, রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।' এসব কথা কি এখন তোমারও মনে পড়ে? মনে পড়ে ডায়মণ্ডহারবারে আমাদের পিকনিক। তোমার অনর্গল কবিতা পাঠ। আমাদের কোরাস। তারপর সন্ধ্যে নামল। অন্ধকারের আড়ালে আমরা হারিয়ে গিয়েছিলাম। সেই প্রথম তুমি আমাকে ছুঁতে দিলে। সেই প্রথম তোমার চুলের গন্ধ, ঠোঁটের গন্ধ আমার রক্তে ঢুকে শুরু করে দিয়েছিল রাহাজানির মত তুমুল তোলপাড়। এখনও কি তোমার মাথায় সেই অপর্যাপ্ত চুল। আমরা যাকে বলতাম, বিদিশার নিশা। আছে সেই শ্রাবস্তীর কারুকার্য তোমার মুখে? তুমি বদলাওনি। ঠিক তেমনিই আছো, সোনালীর ডানার চিলের মত? গত বছর না, তারও আগের বছর আমরা রাজগীরে গিয়েছিলাম বেড়াতে। তুমি যে গেস্ট হাউসে উঠেছিলে, সেখানেই উঠেছিলাম আমরা। দেওয়ালে দেখলাম তোমার লেখা। 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে।' কেউ ভালোবাসেনা নন্দিতা। তবু স্মৃতি বড় সাংঘাতিক। শরীরের বদ রক্তের মত। কখনও না কখনও ফুঁড়ে বেরোবেই হয় ফুসকুড়ি, নয় ফোঁড়া, নয় কার্বঙ্কল হয়ে। তোমার চুল পেকেছে নন্দিতা? একটা কি দুটো? তোমার দাঁতের মাড়িতে ব্যথা হয়? তুমি গ্যাস ট্রাইটিসে ভোগ না? তোমার চশমা কি বাই-ফোকাল? তুমি এখনো কোনো আনন্দের কথায় লাফিয়ে উঠে হাসো? আমি বোধহয় বুড়ো হয়ে গেছি। প্রথম যেদিন চোখে পড়ল, চুল পেকেছে, প্রায় কেঁদে উঠেছিলাম আমি। আমাদের কোনদিন চুল পাকবে, হিসেবের মধ্যে ছিল না। তোমার স্বামী, স্বামীই তো, নাকি এখনো বিয়ে করনি, তিনি কি আর্টিস্ট? যেখানেই তোমার কবিতা সেখানেই তার ছবি।

আমি একবার তারাপীঠে গিয়েছিলাম শ্যামলীকে নিয়ে। তারাপীঠ শুনে হেসো না। আমি এখনো সেই নাস্তিকই রয়েছি। তাগা তাবিজ ধরিনি। আমার কলেজের সমস্ত কলিগের হাতে, অথবা গলায় সাঁইবাবা। এখনো ধরিনি আমি। ভয় হয়, জানো, কোনও দিন না হেরে গিয়ে ধরে ফেলি। তারাপীঠে গিয়েছিলাম, আমার জন্যে নয়, শ্যামলীর জন্যে। ওর মানসিক ছিল। শ্যামলী আমার স্ত্রী। আমাদের প্রথম সন্তান নষ্ট হয়ে যায় গর্ভেই। সেই সময় আমরা উঠেছিলাম, বোলপুর গেস্ট হাউসে, এক রাত্তিরের জন্যে। ২১ নম্বর ঘর। সেখানেও দেয়ালে তোমার কবিতা। আর আরেক হেমন্তর ছবি। তুমি কবে গিয়েছিলে ওখানে? আর কোথায় কবিতা লিখেছো? জানো তো, আমি পাড়া-

গাঁয়ের ছেলে। স্কুলের বেঞ্চে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নিজের নাম লিখেছি কতবার। বাড়ি থেকে আসা-যাওয়ার পথে পড়তো এর ওর বাগানের বেড়া। তার মধ্যে কোনো কোনোটায় বাজবরণের গাছ। বাজবরণ তুমি নিশ্চয় কখনো দেখো নি। এক ধরণের ক্যাকটাস। সবুজ। চ্যাপটা নাকের মত তিনটে চারটে করে শিরা তার গায়ে কাঁটা। সেই বাজবরণের গায়ে সামান্য একটু খোঁচা দিলেই দুধের মত রস গড়িয়ে পড়ে। ঐ বাজবরণের গা চিরে চিরে আমরা কত রকমের কথা লিখতাম। তুমি কি শুধু দেওয়ালে অথবা পাথরেই কবিতা লেখো? কখনো কোন গাছের গা চিরে লিখেছো কি? কার্শিয়াঙের পাইনে কিংবা…। যদি যাই ওদিকে কখনো খুঁজে নেবো। হয়তো কোনদিন যাওয়া হবে না। সামর্থ্য বড় কম, নন্দিতা। দু বছরে একবার বেরোই। তাও খুব দূরে নয়। পুরী, গোপালপুর, হাজারীবাগ, ঘাটশীলা, রাজগীর এই আমাদের দৌড়। এইটুকু আসতেই দম ফুরিয়ে যায়। বন্ধু বান্ধবের কাছে ধার করি। শ্যামলী কিংবা বাবা কিংবা মা সে সব জানে না। তাদের বলি, একটা টাকা পেয়ে গেছি, বই লেখার এ্যাডভান্স হিসেবে। আমি কী ভাবে বেঁচে আছি, ভীষ্মের শরশয্যার চেয়ে আরো কত ধারালো কিংবা আরো কত ভোঁতা…না, তোমাকে আমার দুঃখের কথা শুনিয়ে লাভ নেই। তুমি সুখী হও নন্দিতা। সুখে থাকো। আমার চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক সুপুরুষ, অনেক ভালো, অনেক বিত্তশালী তোমার ঐ হেমন্ত। আর্টিস্ট? না ইঞ্জিনিয়ার? নাকি কোন বিগ ইন্ডাস্ট্রীর টপ একসিকিউটিভ? আমি? আমি মনোমোহন কলেজের বাংলার অধ্যাপক।

॥ ৩ ॥

মাথা এবং গা ভর্তি বালি নিয়ে হেমন্ত যখন ঘরে ফিরল, শ্যামলীর তখন স্নান হয়ে গেছে। হেমন্ত ভেবেছিল বাথরুমে জল নেই। কিন্তু এসে দেখল বাথরুমের চৌবাচ্চা ভরা।—জল দিয়ে গেল কে?

শ্যামলী সুটকেশ গোছাচ্ছিল। সম্ভবত স্নানটা সেরে মাথাটা ঠান্ডা। তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে—ফুলমণি।

হেমন্ত মনগড়া ভাবে বুঝে নিল ফুলমণি কে। মিঁয়া সাহেব আর বিবিজী বলেছিল জল তোলার সাধারণ কাপ ডিস মেজে দেওয়ার আর ঘর মোছার জন্যে একজন মেয়ে জোগাড় করে দেবে। সেইই তাহলে ফুলমণি। ফুলমণিকে দিয়ে শ্যামলী ইতিমধ্যে চৌবাচ্চা ভরিয়েছে। ঘর মুছিয়েছে। তাই সে প্রসন্ন।

স্নান সেরে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে হেমন্ত বলল,

—জানো, আমি যখন সমুদ্রে যাচ্ছিলুম, মিঃ হালদারের সঙ্গে দেখা। ওঁরা স্নান সেরে ফিরছিলেন।

—জানি-ই-ই।

—কি জান ?

— সন্ধ্যায় চা খাবার নেমন্তন্ন ।

— ও, এসেছিলেন বুঝি ? তোমাকে তাহলে অলরেডী বলে গেছেন ? ভদ্রমহিলাকে বসতে-টসতে বলেছিলে তো ?

সুটকেশের এক হাতে ধরে-থাকা ডালাটা ঢপাৎ করে ফেলে দেয় শ্যামলী । পলকে তার উঁচু করে বাঁকানো ঘাড়টা সাপের ফণার ভঙ্গী নেয় । কপালে ভাঁজ । চোখে জ্বলজ্বলে চাউনী ।

— আমাকে ব্যঙ্গ না করে কথা বলতে পার না তুমি, তাই না ?

—তোমাকে আবার ব্যঙ্গ করলাম কখন ?

— এই তো করলে । আমি কি এতই আনকালচার্ড যে একজন ভদ্রমহিলা নিজের থেকে আলাপ করতে এসেছেন, তাঁকে বসতে পর্যন্ত বলব না ? আমাকে আজকাল আর মানুষ বলেই মনে হয়না তোমার । তাই দেখছি ।

শ্যামলীর কাঁধের চুল চিবুকের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল । চুলগুলোকে সে সরিয়ে দেয় হাতের ঝাপটে । তারপর সুটকেশটাকে দুহাতের দমকা ঠেলায় সরিয়ে দেয় দূরে । সুটকেশটা দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খায় । চামড়ার সুটকেশ । তাই ভয়ংকর শব্দ হয় না ।

হেমন্ত চুল আঁচড়ায় আয়না ছাড়াই । সে দাঁড়িয়ে আছে — জানলার সামনে শ্যামলীর দিকে পিছন ফিরে । সে কোন কথা বলে না । জানে এখন কথা বললে যজ্ঞের আগুনে ঘি দেওয়া হবে । রাগের বোধহয় আলাদা একটা গন্ধ আছে । কিংবা তাপ । হেমন্ত সেটা অনুভব করতে পারে উল্টো মুখে দাঁড়িয়েও ।

— কাউকে অপমান করে কেউ বড় হতে পারে না । তুমিও পারবে না । যেন আরো অনেক কথা বলার আছে, এমনি ভাবেই সে দম নেয় ।

— এই তুমিই না সকালে বিরক্ত হয়েছিলে, যখন বলেছিলাম, একটু ধরতো বিছানাটা পেতে নি । এখন বিছানা পাতার কি দরকার ? চলো সমুদ্রে ঘুরে আসি । বিছানাটা পাতা ছিল বলেই তবু বসতে দেওয়া গেল । না পাতা থাকলে কিসে বসতে বলতাম ? নিজে বড় বড় কথা বলে খালাস । ঝক্কি-ঝামেলা যা পোয়াবার সব আমি ।

হেমন্ত ভেবেছিল কোন কথা বলবে না । কিন্তু সে যেন ভিতর থেকে তাড়া খেল প্রতিবাদ জানানোর ।

— ঝক্কি-ঝামেলা পোয়াতে তুমি ভালবাস, তাই পোয়াচ্ছ । এ আর নতুন কি ?

—ভালবাসিটা আর বোলো না । বরং বলো, আমার ঘাড়ে ঐগুলো চাপাতে তোমরা ভালবাস । শান্তি পাও ।

—বাজে কথা বোলো না শ্যামলী । এই যে এখানে এসে তোমাকে ঝক্কি পোয়াতে হচ্ছে, এটার জন্য কে দায়ী ? শম্ভুকে ডেকে তুমিই প্ল্যান করনি যে,

হোটেল-ফোটেলে, লজে-টজে উঠবে না। অনেক খরচ।

—সেটা আমার সুখের কথা ভেবে নয়। তোমারই পার্সের কথা ভেবে। যখন হোটেলের না টুরিস্ট লজের কথা উঠল, তখন তুমি বলনি—ওহে শম্ভু, আমার বাজেট কিন্তু ভাই এই।

— তাতে কি হয়েছে। যে পয়সায় আমরা এখানে পনেরো দিন থাকবো, সেই পয়সায় হোটেলে না হয় দশ দিন থাকতাম।

—ঐ তো তোমার মস্ত একটা গুণ, বাক্য। বাক্যে কে পারবে তোমার সঙ্গে? ছেলে পড়িয়ে পড়িয়ে ঐটেই রপ্ত করেছ খুব। নিজের মুরোদের দিকে নজর নেই। কথাবার্তায় আমিরি চালটা ঠিক আছে। বেশ তো, এতই যদি স্ত্রীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ভাবনা, খোঁজ নাও, কোন্ হোটেলে ঘর খালি আছে। চলে যাব।

—এখন আর সেটা হয় না। হলে এখুনি তাই করতাম। মিঁয়া সাহেবকে এ্যাডভান্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেকগুলো টাকা।

—তাহলে চুপ করো। আর বকিয়ো না। মাথা দপ্ দপ্ করছে যন্ত্রণায়।

শ্যামলী বিছানায় শুয়ে পড়ে। সমুদ্রে স্নান করলে খিদে বাড়ে। হেমন্তর পেটের ভিতর থেকে একরকম গড়গড় গড়গড় আওয়াজ উঠছিল। খিদে পেলে ঐ রকম আওয়াজ হয়। খিদের সাইরেন। কখন খাওয়া জুটবে, প্রশ্ন করতে সাহস হয় না তার। সে একটা সিগারেট ধরায়।

হেমন্তর এই জানলা দিয়ে দেখা যায় দূরের ব্যাকওয়াটার। দুপুরের রোদে রুপোর পাতের মত দেখাচ্ছে। ব্যাকওয়াটারও সমুদ্রের জল। কিন্তু সমুদ্র থেকে আলগা হয়ে আটকা পড়ে গেছে একটা ধরা-বাঁধা স্থির গণ্ডীর ভিতরে। তাই এর কোন গর্জন নেই, আলোড়ন নেই, সাদা ফেনার মত ঢেউ নেই। সে গৃহপালিতের মত শান্ত, স্তিমিত।

যত নষ্টের গোড়া ঐ শম্ভুটাই। শ্যামলীরই দূর সম্পর্কের ভাই। চাকরী করে বার্ড কোম্পানীতে। ওর বড়দার চাকরী ইস্টার্ণ রেলে। পার্বলিসিটিতে। সেই সূত্রে রেলের লোকজনের সঙ্গে খুব খাতির। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা উঠলেই শ্যামলী ডেকে পাঠায় শম্ভুকে। শম্ভু তার দাদার দৌলতে অনেক জায়গায় ঘুরেছে। ওতো বলে, অর্ধেক ভারতবর্ষ। শম্ভুর পরামর্শ মতই প্ল্যান করে তারা। শম্ভুই সব করে দেয়, টিকিট, রিজার্ভেশন! এবারেও ডাক পড়েছিল শম্ভুর। শম্ভুই বাতলালে, একবার যা, গোপালপুরটা ঘুরে আয়। তোর তো মাথার ব্যামো। হাই প্রেসার। সমুদ্রই ভালো। সস্তায় মাছ খেতে পাবি। আর কি সুবিধে জানিস, ওখানে ভীড় ভাট্টা থাকে না একদম। পুজোর সময় তবু কিছুটা হয়। এখন গিয়ে দেখবি, ফাঁকা। অফ সিজন তো। তখনই হেমন্ত জিজ্ঞেস করেছিল, শম্ভুদা টোটাল খরচটা কি রকম হবে বলতে পারো? আমার বাজেট কিন্তু এই। ইচ্ছে করেই অনেক কম টাকা বলেছিল হেমন্ত।

বাবা মা বোনের কানে গেলে ভাববে অন্যরকম। বোনটা কতদিন ধরে বলছে একটা সোনার দুলের কথা, সেটা হয় না। কিন্তু বৌকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার সময় টাকা পয়সা সব জুটে যায়। আর তখনই বলেছিল, আমি বাৎলে দিচ্ছি সস্তায় কি করে রাজার হালে থাকা যায়, তার রাস্তা। হোটেল-ফোটেল লজে-টজে উঠবি না তোরা। বুঝলি। অকারণে কতকগুলো পয়সা গলে যাবে। খাওয়া-দাওয়া এমন কিছু নয়। ঠাট-ঠমকাই আসল ঐ সব জায়গায়। একদম ও পাড়া মাড়াবি না। সোজা চলে যাবি সমুদ্রের কাছে। বাঁ দিকে ঘুরলেই দেখতে পাবি একটা বাড়ি। অনেকটা দুর্গের মত। নাম, রাহ মনিয়া মঞ্জিল। মালিক মুসলমান। ঠিক মালিক নয়, কেয়ার-টেকার। নাম মিঁয়া সাহেব। তার বিবির নাম জাহিদা। দুজনেই খুব ভালোমানুষ। মিঁয়া সাহেব মোগলাই রান্নায় একস্‌পার্ট। বিরিয়ানী করে দেবে, একস্‌সেলেণ্ট। সটান চলে যাবি ওখানে। উপরে নীচে অনেকগুলো ঘর। নীচের ঘর ভাড়া নিবি না। ছাদের উপরে দুখানা বড় ঘর আছে। সেটাই নিবি। ছাদের নীচেই সমুদ্র। ভাড়া খুব সস্তা। রাঁধবার খাবার হাঙ্গামা নেই। জিনিস-পত্র কিনে দিলে বিবিজীই রান্না করে দেবে।

হাতের সিগারেট নিবে গেছে হেমন্তর। সিগারেটের ডগায় জমে আছে লম্বা সাদা ছাই। হেমন্ত এখন স্থির, যেন পাথর। তাই সিগারেট থেকে ছাইটা ঝরে পড়েনি। এই মুহূর্তে নিজেকে পাথর ভাবছিল না। ভাবছিল, পরাজিত।

॥ ৪ ॥

—এসব কি করেছেন? করলেন তো চায়ের নেমন্তন্ন। এত খাবারদাবার?

—এত আর কি দেখছেন? সামান্যই। তবে ভয়ের কিছু নেই। মিষ্টি ছাড়া, সব মিসেসের নিজের হাতে তৈরী। আপনারা ভাল হয়ে বসুন না। বিছানা তো কি হয়েছে! যেখানে যেমন। এখানে চেয়ার টেবিল আর কোথায় পাব। নিন নিন, খেতে আরম্ভ করুন।

—আপনারা?

—আমরাও খাচ্ছি। কই, তুমি কোথায় গেলে? এখানে এসে দাঁড়াও।

মিসেস হালদার কাছেই ছিলেন! মিঃ হালদারের বেডরুমের সঙ্গে লেগে আছে একটা বেশ চওড়া ঢাকা বারান্দা। সেটাকেই তিনি বানিয়ে নিয়েছেন অস্থায়ী রান্নাঘর। রান্না করছেন স্টোভ জেবলে। মিসেস হালদার সাড়া দেন, যাই বলে। এবং একটু পরে তিনি আরও কয়েক প্লেট খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকেন। ছেলে-মেয়েদের ডাকেন। তারা ছাদে ছিল। ছাদ থেকে এসে খাবারের প্লেট নিয়ে আবার ছাদে চলে গেল। মিসেস হালদার তাঁর স্বামীর পাশে বসলেন। হেমন্ত বললে—দেখুন, মিষ্টি কটা তুলে নিন।

—কেন, ডায়াবিটিস নাকি?

হেমন্ত লজ্জা পায়। তার ডায়াবিটিস নেই। কিন্তু তার চেহারা দেখলে লোকের সেটা মনে হয়। চায়ে চিনি কম দেবার কথা বললেই, লোকে এই প্রশ্ন করে। হেমন্ত তখন মনে মনে বলে, আজ্ঞে না, ডায়াবিটিস নয়, আমি হেরে গেছি বলে, চেহারাটা এই রকম। কিসে হেরেছি? দাবায়। মনে মনে আমি ছক সাজিয়েছিলাম এই ভাবে রাজ্য জয় করবো। হয়নি। আমার সমস্ত ঘোড়া হাতী নৌকো মন্ত্রী আর বোড়েদের একে একে ছিনিয়ে নিয়েছে প্রতিপক্ষ। আমি এখন রাজা হয়েও এক।

হেমন্ত হেসে বলে—আজ্ঞে না, ওসব এখনো হয়নি। তবে হয়ে যাবে, দেরী নেই। আসলে আমি মিষ্টর ভক্ত নই। নোনতাই ভালবাসি।

—নোনতাও আছে। খান।

শ্যামলী বলে—দিদি, আমি কিন্তু সত্যিই এত খেতে পারবো না। আপনি দেখলেন কত অবেলায় খাওয়া হল।

—গল্প করতে করতে ঠিক খাওয়া হয়ে যাবে।

একমুখ গরম নিমকি চিবোতে চিবোতে মিঃ হালদার বললেন,

—একটা মজার ব্যাপার কি বলুন তো! আমাদের এখনো ভাল করে আলাপ পরিচয়ই হলনা, কারো সঙ্গে। কেউ কারো নাম জানিনা। আমার পরিচয়টা দিই আপনাদের। নরেশ হালদার। ক্রীক রো-এ থাকি। চাকরী করি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায়। আমার গিন্নী মৃদুলা।

এবার হেমন্তর পালা।

—আমার নাম হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। পেশা, অধ্যাপনা। আমার স্ত্রী, শ্যামলী। আমরা থাকি বাগবাজারের কুণ্ডু লেনে।

নরেশবাবুর হাসি-খুশি আমুদে মুখখানার উপরে একটা পাতলা পলেস্তারা পড়ল যেন। সেটা বিস্ময়ের। তিনি কিছুক্ষণ নিমকি চিবোনো বন্ধ রেখে হেমন্তর দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন—আপনার নাম হেমন্ত?

হেমন্ত কিছুটা আড়ষ্ট ভাবে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ। কেন বলুন তো? আপনি কি আমাকে চেনেন? আগে কোথাও আলাপ হয়েছিল?

—না, তা নয়।

নরেশবাবু ঘুরে তাকান তাঁর স্ত্রীর দিকে, পাশাপাশি বসে শ্যামলী আর মৃদুলা। ওরা চাপা গলায় গল্প করছিল সংসারিক বিষয়ে। হেমন্তকে আজ, এই মুহূর্তে স্তম্ভিত করে দিয়েছে শ্যামলী। ও যে এমন করে সাজসজ্জা করবে সেটা আশা করেনি হেমন্ত। ভেবেছিল, চা খাওয়ার নেমন্তন্ন যখন, যেমন-তেমন করে আসবে। বেশ মাঝারি ধরনের সুন্দরী দেখাচ্ছে শ্যামলীকে। স্নো-পাউডার-লিপস্টিক ওর মুখ থেকে সরিয়ে দিয়েছে সেই সব রেখা, শীরর আর মনের অসুখ, অসুখ আর অতৃপ্তি, যা খোদাই করেছিল দীর্ঘ দিন ধরে।

—শুনলে ? নরেশবাবুর ডাকে মৃদুলা চোখ সরাল শ্যামীর দিক থেকে।

—কি বলছো ? চা তো, হ্যাঁ, করছি।

—হ্যাঁ, চা করো এবার। এনাদের নাম শুনেছো ?

মৃদুলা ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ জানালেন। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন—

হেমন্ত নাম কী পৃথিবীতে একজনেরই হয় ? আশ্চর্য মানুষ তো তুমি ! হেমন্তর হেঁয়ালী লাগে। তার নামের মধ্যে এঁরা যেন রহস্য খুঁজে পেয়েছেন কিছু। হেমন্ত হাসবার চেষ্টা করে বলে,

—আমার নাম নিয়ে আপনাদের মধ্যে যেন কিছু একটা হয়েছে ?

বেশ কিছুটা সময় বোলবো কি বোলবনা-জাতীয় সংকোচ খেলা করল নরেশবাবুর মুখে।

—না না, আপনি কিছু ভাববেন না। আপনাকে নিয়ে কিছু নয়। আপনার নামটা এখুনি শুনলাম তো। তাতেই একটা খট্‌কা দেখা দিয়েছিল। কিছু মাইন্ড করবেন না।

—মাইন্ড করার কি আছে। বলুন না।

—তা যদি বলেন তো, আপনাকে মশাই আরো একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, আপনি কি আর্টিস্ট ? এর আগে কি কখনো এসেছিলেন গোপালপুরে ?

—আর্টিস্ট ? না মশাই, জীবনে কোনদিনও তুলি ধরিনি। আর গোপালপুরেও এই প্রথম। কেন বলুন তো ?

—আপনি কি ঘুরে দেখেছেন ওপরের সবটা ?

—না।

—কাল সকালে দেখবেন। আমাদের এই ঘরটার দুপাশে দুটো বারান্দা আছে। আপনাদের দিকটায় নেই। সেই বারান্দা দুটো কবিতা আর ছবিতে বোঝাই। কলকাতার রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে মাঝখানে যেমন মাও-সে-তুঙের মুখ আর শ্লোগানের ছড়াছড়ি পড়েছিল, তারই মত অনেকটা। দু-লাইন চার-লাইন করে কবিতা। তার পরেই ছবি। ছবি মানে একটা মেয়ের মুখ। নানা ভঙ্গীতে আঁকা। আর সবকটা ছবির নীচে লেখা, হেমন্ত আর নন্দিতা। ওর মধ্যে আবার শ্যামলী বলে একটা মেয়ের নাম জড়ানো আছে। আপনি যখন আপনার গিন্নীর নামটা বললেন, তাতেই একটু চমকে উঠলাম।

শ্যামলী ঘুরে তাকাল নিজের নাম শুনে। কপালে ভাঁজ। চোখে জিজ্ঞাসা।

—আমার নাম আবার কার সঙ্গে জড়ানো ?

—দেখুন মশাই, কবিতা-টবিতা আমি বুঝি না। আমার ওসব মনে থাকে না। আমার ছেলেমেয়েরা পড়েছে। ওদের মুখ না কি সব যেন লেখা আছে কোনো একটা কবিতায়। দাঁড়ান, ওদের ডাকছি। ঝুমা-আ,-মানু-উ, তোমরা শুনে যাও একবার।

ঝুমার পিছনে ওর দুভাই। ওরা এসে দাঁড়াল নরেশবাবুর সামনে।

—পিছনের বারান্দায় কী কবিতা লেখা আছে, তোমরা তো মুখস্ত করে ফেলেছো, বল্‌তো মা।

ঝুমা মুখে হাত চাপা দিয়ে লজ্জার হাসি হেসে নেয় এক প্রস্থ।

—লজ্জা কি। বল না।

ঝুমা বলে—কোন্‌টা বোলবো। অনেকগুলো তো।

—না, না ঐ যে শ্যামলীর মুখ নিয়ে একটা আছে না। ঐটেই শোনাও।

'—শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন ঃ
যখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল
সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে বলে,
মহিলারি প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল
টের পেয়ে, দ্রাক্ষা দুধ ময়ূর শয্যার কথা ভুলে
সকালের রূঢ় রৌদ্রে ডুবে যেত কোথায় অকূলে।"

ঝুমা থামতেই নরেশবাবু এক গাল হেসে উঠলেন।

—বলুন তো মশায়, এ কবিতা মনে রাখা যায়! আপনি অবশ্য প্রফেসর মানুষ। আপনাদের কথা আলাদা। আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারলুম না।

ওদিক থেকে ছুটে আসে শ্যামলীর প্রশ্নের বর্শা, হেমন্তর দিকে।

—কে লিখেছে গো?

—কে লিখেছে কি করে বলব। কবিতাটা তো জীবনানন্দ দাশের। কেউ একজন লিখে গেছে শখ করে।

নরেশবাবু বললেন—আরো আছে। কাল সকালে এসে দেখবেন।

॥৫॥

পরের দিন সকালে বাজারে দেখা হয়ে যায় দুজনের। হেমন্ত এবং নরেশবাবুর। নরেশবাবু বলেন, একসঙ্গে ফিরবো। আমার রিক্‌সা আছে।

দুজনে রিক্সা করে যখন বাড়ির দিকে ফিরছিল, নরেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন,

—কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল তো?

—হয়েছিল। বেশ হাওয়া দেয় তো।

—যাক, সেটাই ভাল। আচ্ছা আপনাদের ঘরের দেয়ালে-টেয়ালে কোন লেখা-টেখা বা কবিতা-টবিতা নেই?

হেমন্ত মিথ্যে করে বলল—কি জানি, চোখ পড়েনি। আছে হয়তো।

দেখবেন তো একটু। ব্যাপারটা মিসটিরিয়াস।

—কেন?

—কাল রাত্রে আপনাদের বলি নি। প্রথম দিন এসেছেন। হয়তো ঘুম-টুমই

আসবে না, ভয়ে। আপনারা যে-ঘরে উঠেছেন, গতবছর ঐ ঘরে একটা সুইসাইড হয়ে গেছে।

বিস্ময়ে লাফিয়ে ওঠে হেমন্ত। না, লাফিয়ে ওঠে রিক্সাটা, গর্তে পড়ে। আর হেমন্ত বিস্ময়ে ঘুরে তাকায়। নরেশবাবুর মুখের দিকে।

— কে সুইসাইড করেছে জানেন নাকি?

— না মশাই, সে সব কি করে জানবো। আমাদের নুলিয়া, ফটিকচাঁদ, ওর মুখেই শোনা এসব। মিঁয়া সাহেব এ সব কথা কাউকে বলে না।

—সুইসাইড করেছে, ছেলে না মেয়ে?

—মেয়ে একজন। আমার তো সব দেখে শুনে সন্দেহ হয়, এ কাপ্‌ল-এর একজন হবে।

—মানে, আপনি বলছেন, ঐ হেমন্ত আর নন্দিতার কথা?

—তাইতো মনে হয়।

—আপনার নুলিয়া কোন ডেসক্রিপশন দিয়েছে মেয়েটির।

—না, সেরকম কিছু দেয়নি। দেয়নি মানে আমরা সে রকম ভাবে জিজ্ঞেস করিনি। তবে নুলিয়াটা ওদের চিনতো। সে শুধু আমাদের বললে, মেয়েটি বড় আমুদে ছিল। খুব সুন্দর দেখতে। হাসি-খুশী। আর সমুদ্রের ধারে হাঁটতে হাঁটতে গান গাইতো, কবিতা পড়তো।

—চোখে চশমা ছিল কি? গালের বাঁ দিকে একটা তিল? ভুরুর কাছে ছোট্ট একটু দাগ?

এবার নরেশবাবু লাফিয়ে উঠলেন বিস্ময়ে। না, লাফাল রিকসাটা, গর্তে পড়ে। নরেশবাবু বিস্ময়ে ঘুরে তাকালেন হেমন্তের দিকে।

—আপনি চিনতেন নাকি?

—আজ্ঞে না, আমি অন্য একজন নন্দিতাকে চিনতাম, সে কিনা মিলিয়ে দেখছিলাম। আমার কলেজ-মেট।

—ওঃ।

আর কোন কথা বলে না হেমন্ত। রিকসাতেই মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, শ্যামলীর সঙ্গে আর বেশী কথা কাটাকাটিতে জড়াবে না। কি জানি, হয়তো এই ঘরটাই অভিশপ্ত। এখন থেকে তারা অভিনয় করে যাবে সুখী দম্পতীর।

এই সিদ্ধান্তের পর হেমন্ত এক ফাঁকে চোখ বুজিয়ে নন্দিতার স্বর্গত আত্মার জন্যে যেন কিছু প্রার্থনা করে নেয়।

—নন্দিতা তুমি হেরে গেলে? অত বিপুল স্বপ্ন নিয়েও? আমি কিন্তু হারতে হারতেও হারছি না। স্বপ্নগুলো হারাচ্ছে। আমি হারছি না।

রিকসা এসে দাঁড়ায় রাহ মনিয়া মঞ্জিলের সামনে। সামনে সমুদ্র। হেমন্তর মনে হল, সমুদ্র যেন তারই দিকে তাকিয়ে হা-হা করে অজস্র সাদা দাঁতে হাসছে।

কর্কটরাশি, বৃষলগ্ন
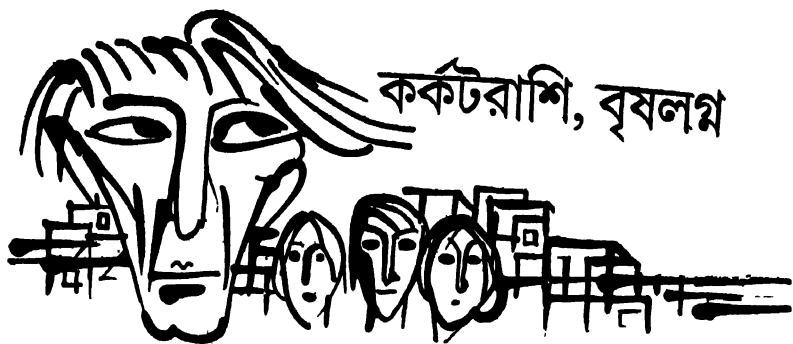
আমি ঠিক বুঝতে পারি না, কেন এমন হয়। কাউকে বলতেও
পারি না। বললে বলবে, বানানো গল্প ছাড়ছি বাজারে।
অথচ ঘটনা ঘটেই চলেছে, গুপ্ত হত্যার মত মর্মান্তিকতায়।
প্রথম প্রথম মনে করেছিলাম, কো-ইনসিডেন্স। তৃতীয়বার
থেকে সন্দেহটা সরু ছুঁচের মত গেঁথে যায় মনে।
তারপর সরু ছুঁচটা ছুরি হয়, ছোরা হয়, পাঁঠা কাটার খড়্গ
হয়। আমি ফালা ফালা হই, আমার ভিতরে রক্তপাত হয়। এই
ভাবেই ক্যানসারের মত একটা উপশমহীন এবং যন্ত্রণাবহুল
ব্যাধি আমার চেতনার ভিতরে থাবা পেতে বসেছে।
একটানা দশ-বারো বছরের ব্যাধি।
প্রথমবারের ঘটনাটা বলি।
আমার এক মাসতুতো ভাই এসেছেন দিল্লী থেকে। ইনফরমেশন
এ্যান্ড ব্রডকাস্টিং-এর হোমরা-চোমরা অফিসার। বাবা বাড়ি
ফিরে বললেন,
—ওরে শিবু, পরশু তোর কি কাজ আছে ?
—কখন ?
—সন্ধ্যের পর। এই ধর সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ।
—তেমন কিছু নেই। টিউশানী ছিল। সেটা সকাল বেলায়।
—ওগো শুনছো···
যার উদ্দেশে বাবার ডাক তিনি অর্থাৎ মা এসে দাঁড়ালেন আমার

ঘরের বিছানার কাছে। বাবা তখনো আপিসের জামা ছাড়েননি। বোতাম খুলছেন জামার। ভিতরে বোধহয় কোনও চাপা আবেগ বা আনন্দ হাঁড়ির ভিতরের ভাতের মত ফুটছিল। সেদিন বাবার চোখ-মুখ যেন নেয়াপাতি ডাব।
—জানো, শিবুটার বোধহয় একটা হিল্লে হয়ে যাবে। তবে কলকাতায় নয়, দিল্লীতে। সমীরণ এসেছিল রাইটার্স-এ। কী দরকারে চীফ মিনিষ্টারের সঙ্গে কথা বলতে। যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এখনো অনেস্ট আছে ছেলেটা। নমস্কার না করে মেসোমশাই বলে প্রণাম করলে। অনেকক্ষণ কথা বললে। তখনই শিবুর কথাটা বললুম। তোমরা আছ, দেখনা, যদি উন্নতির একটা রাস্তা করে দিতে পার। এম. এ পাশ করে বসে আছে। সব শুনল, বলেছে পরশু দিন সন্ধ্যের পর ওদের বাড়িতে যেতে। তুমিও একবার চলে যাও না। অনেকদিন তো বোনকে দেখনি।
আমি আর মা দুজনে মিলেই গিয়েছিলাম সেজ মাসীমার বাড়ি। মায়ের বেশ গল্পগুজবে কাটছিল। আমার মনটা মিয়ানো মুড়ি। কেননা সমীরণদা হঠাৎ সেইদিনই সকালের ফ্লাইটে চলে গেছেন দিল্লী, আর্জেন্ট ট্রাঙ্ককল পেয়ে। তবে পরের দিনই ফিরে আসবেন। তাই বলে গেছেন, আমি যেন কাল সন্ধ্যেয় আসি। রাত হয়েছে। আমরা উঠবো উঠবো করছি। যেতেও হবে অনেক দূর। আলিপুর থেকে শ্যামবাজার। সেই সময়েই দিল্লী থেকে এল আরেক ট্রাঙ্ককল। খবর পেয়ে মাসীমা মূর্ছা গেলেন। সারা বাড়িটা মড়া আগলানো শ্মশানের মত হয়ে গেল শোকে, দীর্ঘশ্বাসে, কান্নায়, চীৎকারে, নীরবতায়। সমীরণদা সেদিন সকালেই মারা গেছেন এয়ারক্রাসে। এরপর দ্বিতীয়বারের ঘটনা।
পুষ্পেন আমার সহপাঠী। বি. এ পর্যন্ত আমরা এক কলেজের ছাত্র। তারপর চলে গেল খড়্গপুরের আই. আই টিতে। আমি তখন এক মফঃস্বলের কলেজে। বদলির চাকরী। পুষ্পেন ততদিনে তুখোড় ইঞ্জিনীয়ার। আপাদমস্তক বদলে গেছে সে। আগে ছিল ধুতি-পাঞ্জাবীর। এখন স-টাই স্যুট। মুখের পাইপ সব সময় হাতে। ছিল এ্যালুমিনিয়ম। হয়ে গেছে ইস্পাত। চাকরী পেয়েছে জার্মানীতে। চলে যাবে। যাবার আগে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে মিট-টোগেদার। বাড়ীতে নয়। পার্ক স্ট্রীটে। স্কচে নাকি ডুবিয়ে দেবে। আমি যাব না বলেছিলুম। কারণ স্কচে স্নান করে বাড়িতে ফিরলে মা যাবেন গঙ্গাস্নান করতে, বাবা দরজা খুলে দেবেন চিরকালের গেট আউটের জন্যে। আমাদের পরিবার গোঁড়াস্য গোঁড়া। কনজারভেটিবস্য কনজারভেটিব। লুকিয়ে চুরিয়ে খাইনা তা নয়। তবে তাকে ভোজন না বলে আচমন বলাই ভাল। পুষ্পেন নাছোড়বান্দা। সে বললো, ঠিক আছে, রাত্রে বাড়িতে ফিরতে হবে না। আমাদের বাড়িতে থাকবি। আমি ফোনে মেসোমশাইকে বলে দেবো। বলে দিয়েও ছিল। পুষ্পেনের এতটা পেড়াপিড়ি করার অন্য একটা কারণ ছিল। ও যাকে বিয়ে

করবে, তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চায়। এখন কোর্টসিপ। বিয়ে করবে সামনের বছর। ওদের প্রেম নাকি অনেকদিনের। মেয়েটি পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্রী। পুষ্পেন বলেছিল।
—ব্রিলিয়াণ্ট, এ্যাট দা সেম টাইম বিউটিফুল। এ রেয়ার কমবিনেশন অব আর্টিসটিক্ টেমপারামেণ্ট এ্যাণ্ড ইউবিক্যুইটাস ইনটেলেক্ট। দুর্দান্ত ক্লাসিকাল গায়। ছবি আঁকে। ক্যামেরায় পাকা হাত। একবার বিউটি কনটেস্টে দাঁড়িয়েছিল। একবারই। মিস ইণ্ডিয়া। তুমি শালা কবিতা লেখো। আমরা জানি না। ও জানে। তোর এ্যাডমায়ারার।
অনেককাল বাদে, বলতে গেলে সেই বছর পাঁচেক আগের কলেজ লাইফ বাদ দিলে, জীবনে একটা হৈ-চৈ-এর সুযোগ। জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। তৎসহ অসাধারণ রূপসী এবং বিদুষী রমণীর মুখ থেকে প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি। তদুপরি স্কচ, যা লাস্ট ফাইভ ইয়ারে চাখিনি। আমার পিঠে দুটো ফুরফুরে ডানা গজাচ্ছিল। মনে মনে দিন গুনে চলেছি কবে আসবে উনিশে আগস্ট।

আপনি কী অনুমান করতে পারেন, এর পরের ঘটনা? আপনার পক্ষে পারা সম্ভব নয়। কারণ আপনি মানুষ। হয়তো ঈশ্বর পারেন কিংবা দেবদূত। কেননা তাঁরা স্বর্গ নামক এক য়ুটোপিয়ান ওয়ার্ল্ডের অলীক প্রাণী। হয়তো স্বর্গের কোন জায়েণ্ট-সাইজের মাকড়শাদের নামই ঈশ্বর-টিশ্বর। ঐ উনিশে অগাস্ট সকালেই সুইসাইড করেছিল পুষ্পেন। সেই ব্রিলিয়াণ্ট এ্যাট দি সেম টাইম বিউটিফুল মেয়েটিই, যার নাম পরে জেনেছি আমরা, মল্লিকা, তার মৃত্যুর কারণ। সেদিন সারারাত আমাদের কারও পেটে এক ফোঁটা জলও পড়েনি। খবর পেয়েছিলাম বিকালে। তারপর থেকে থানা, পুলিশ, হাসপাতাল। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পাওয়া গেল পরের দিন। তারপর শ্মশান। বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম জ্যান্ত মুরগী। ফিরলাম রোস্টেড।

প্রথম দুটো ঘটনাই বললাম। আরও আছে। বলতে ইচ্ছে করে না আর। শ্বাসকষ্টের মত ব্যথা লাগে বুকে। এই সব স্মৃতিই আমাকে একলা করে দিয়েছে। আমার আমি ছাড়া আর কোনো আত্মীয় নেই। যখনই দেখবো কোনো মানুষের উপর নির্ভর করছে আমার সুখ অথবা সাফল্য, সে মানুষ থাকবে না। গভীর কোনো প্রত্যাশা নিয়ে যারই সংস্পর্শে আসি, সে ধ্বংস হয়ে যায়, থাকে না। কেন এমন হয় বলতে পারেন? আমি কর্কট রাশি, বৃষ লগ্নের জাতক বলে? জন্মেছিলাম রাত্রে। ফাল্গুনে। ফাল্গুন সম্বন্ধে কবিরা কত মিছরি-মিছরি কথা লিখে থাকেন। কবিতা লেখার সময় আমিও লিখি। এখন নয়। আগে লিখতাম। অথচ আমার জন্মদিনের ফাল্গুনটা ছিল পৃথিবীর একটা জঘন্যতম দিন। সকাল থেকে বৃষ্টি। ঝোড়ো হাওয়া। কাদা ল্যাপটানো ঘর-দোর। আমি জন্মেছিলাম আমার দেশের বাড়িতে। মেদনীপুরে। আমি জন্মানোর

মুহূর্তে শাঁখ বাজানো হয়েছিল। কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীরা কেউ শুনতে পায়নি। বিপুল বিপর্যয়ের মধ্যে এত নিঃশব্দে আমার জন্মলাভ।

এত কথা আপনাদের বলছি একটা ভয়ংকর কারণে। আমার ভিতরে একটা ভীষণ শব্দময় এবং অস্থির কাঁপুনির জেনারেটার চলেছে যেন। কিংবা অসংখ্য বিকটাকার যন্ত্রপাতি নেমে পড়েছে গর্ত খুঁড়তে। আমার সামনে জীবন এবং মৃত্যু, সৌভাগ্য এবং সর্বনাশ, রেস্তোরায় প্লেটের দুপাশে কাঁটা আর চামচ যেভাবে সাজানো থাকে, সেইভাবে পাশাপাশি। আকস্মিকভাবে আমি এক দুর্ঘটনার মুখোমুখি।

আমি এখন চাকরী করছি কলকাতাতেই। বাংলার অধ্যাপক। পার্মানেণ্ট। বাবা মারা গেছেন। মায়ের একটা টিউমার দুবার অপারেশন করার ফলে তিনি শয্যাশায়ী। আমার ছোট ভায়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই এক ছেলে। ছোট পরিবার। সুখী পরিবার। দুই বোন। তারাও বিবাহিতা। এবং সুখী। আমি বিয়ে করিনি। কেন করছিনা, তা বাড়ির লোককে বোঝাতে পারি না। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এইভাবেই চলছিল আমার সন্ন্যাস-জীবন। কবিতা আর লিখিনা। যেহেতু কবিতার কাছেও আমি মনে মনে একসময় হাত পেতেছিলুম, আমাকে খ্যাতিমান জ্যোতিস্মান করো এই প্রার্থনায়, কবিতা মুছে গেছে মর্মমূল থেকে। সত্যিকথা বলতে গেলে বড় নির্ভয় এবং নিরাপদ জীবন কাটিয়ে চলেছিলাম ক-বছর। পূর্ণতাহীন, প্রত্যাশাহীন, অথচ পরিতৃপ্ত। তাই ইতিমধ্যে মারাও যায় নি কেউ। একমাত্র অনিমেষ ছাড়া। অবশ্য অনিমেষের মৃত্যুর সঙ্গে আমার কর্কট রাশি এবং বৃষ লগ্নের কোন সম্পর্ক নেই। অনিমেষ মারা যাবে, এটা আমি জানতুমই। দুম্ করে স্টেটসম্যানের সোনার চাকরী ছেড়ে দিয়ে ও যেদিন গেরিলা হয়ে গেল ডেবরা-গোপীবল্লভপুরের অন্ধকার জঙ্গলে? সেইদিনই। অনিমেষের কাছে আমার কোনও প্রত্যাশা ছিল না। অনিমেষকে আমি ভুলেও গিয়েছিলাম। মনে পড়েছিল শুধু একবার। কয়েকদিনের জন্যে। আমাদের বাড়ির সামনে, অর্থাৎ দেশবন্ধু পার্কের কাছাকাছি অঞ্চলে তখন এক ত্রাসের রাজত্ব। বোমবাজীর শব্দে কান, প্রাণ ঘর বাড়ি চৌচির। এবেলা খুন। ওবেলা খুন। ষোলো সতেরো বছরের ছেলেরা সব খুন হচ্ছে। ষোলো-সতেরো বছরের ছেলেদের মুখ-চোখ-চুল-হাসি-হাঁটা-চলা রাজহংসের মত। যতখানি মাধুর্যময় হওয়া উচিত ছিল, তারা তখন তেমন ছিলনা। তাদের চোখে একই সঙ্গে বিপন্ন এবং অগ্নিময়। তাদের চুলে যেন ছাই মাখা সন্ন্যাসীর জট। তাদের হাসি ছুরির ফলার মত। তাদের হাঁটা হায়নার মত নিঃশব্দ অথচ ষড়যন্ত্রময়। একদিন একটা মার্ডার হল একেবারে আমাদের বাড়ির দরজায়। আমরা সেই সতেরো বছরের ছেলেটির মৃত্যু-চীৎকার শুনেছিলুম। কিন্তু কেউই দরজা খুলে তাকে বাঁচাতে আসিনি। সারাদিন সারারাত আমরা ছিলাম দরজা-জানলা

ভেজিয়ে। যেন দুর্গ। যেন সভ্যতার থেকে অনেক দূরের দুর্গম পাহাড়ে রয়েছি। পৃথিবীর সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতির নাগালের বাইরে। সেইদিন রাত্রে আমার মনে পড়েছিল অনিমেষকে। মনে মনে অনেকক্ষণ কথা বলছিলুম অনিমেষের সঙ্গে। অনিমেষের হাত দুটোকে জাপটে ধরে বলেছিলুম।

—এ কী করছিস তোরা? সমস্ত ষোলো-সতেরো বছরের ছেলেরা, সমস্ত পোটেনশিয়াল ইয়ুথ যদি এইভাবে এক পক্ষ অন্য পক্ষের ছোরায় পাইপগানে শেষ হয়ে যায়, তোদের ভবিষ্যৎ সেনাবাহিনী গড়বি কাদের নিয়ে? এ কী হত্যা এবং হিংসার চারা বুনলি তোরা? অনিমেষ, তোরা চাইছিস মানুষের মুক্তি। আর মানুষ তোদের ভয় পাচ্ছে। এতগুলো দিন-মাস-বছর ধরে যারা মারা গেল তারা কার শত্রু? তারা কে? তারা তো মন্ত্রী নয়। হোর্ডার নয়। কালোবাজারী নয়। ক্যাপিটালিস্ট নয়। তারা তো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া বানায় নি? ইকনমিক কমিশনের সদস্যও ছিল না? তারা কেউ সংবাদপত্রের মালিক ছিল না। সংস্কৃতিতে কুরুচির ভেজাল দেয়নি কেউ। সভ্যতাকে শুয়োরের আখড়া বানায় নি তারা। তারা মানুষ। নিছক মানুষ। ধুলোর ফুল। ফুটপাতের পলাশ। তারা কেন নিহত হবে অনিমেষ? ষোলা-সতেরো বছর বড় স্বপ্নময়। স্বপ্নকে হত্যা করতে নেই।

অনিমেষ সেদিন আমার মনে মনে বলা সব কথা মন দিয়ে শুনেছিল। শুনে বলেছিল।

—ঘাবড়াসনা শিবু! আমরা আসছি। রাজনীতি একটা অংক। যোগ-বিয়োগের ভুল হয়ে যায় কখনো কখনো। আমরা ভুল বুঝতে পেরেছি। আবার আসছি। যারা নিহত হয়েছে, তাদের হাড়-কংকাল, থ্যাৎলানো হৃদয়, চৌচির মাথার খুলিগুলো হাতড়ে হাতড়ে আমরা খুঁজে নেবো সমস্ত হারানো স্বপ্ন। ভয় পাসনা শিবু। এই রক্তাক্ত অন্ধকারকে আমরাই বদলে দেবো রোদের কল্লোলে।

সেইদিন থেকে বেশ কয়েকটা দিন অনিমেষ আমার খুব কাছে রয়ে গেল। মন থেকে মুছে গেল ভয়, উদ্বেগ, আশংকা, এবং শূন্যতাবোধ। কিছুদিন যে-কোন দুর্ঘটনা অথবা হত্যাকাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আমি মনে মনে মন্ত্র পাঠের মত বলে যেতাম

—ভয় নেই। অনিমেষরা আসছে অন্যরকম হয়ে। কলকাতা নামের হিংস্র অরণ্য আবার উদ্যান হয়ে যাবে।

কী জানি, ঐটুকু প্রত্যাশাই হয়তো ভুল হয়েছিল। হয়তো জেল থেকে পালাবার সময় অনিমেষের গুলী খেয়ে পিঠ ঝাঁঝরা করে মারার কারণ, অনিমেষকে ঘিরে আমার ঐ স্বপ্ন-সাধ। হতে পারে। আগে মনে হয়নি। এখন মনে হচ্ছে, হতে পারে।

যাই হোক, বেশ কয়েকটা বছর শীতের রাতের ঠাণ্ডা ভাতের মত বেশ ছিলাম আমি। কারো কাছে আমার কোন প্রত্যাশা ছিল না। তাই মৃত্যুও ঘটেনি কারো।

হঠাৎ ঘটে গেল দুর্ঘটনা। যার কথা বলছিলাম।
আমার কলিগ সুনীত, ইতিহাসের অধ্যাপক। একদিন জোর করে নিয়ে গেল পার্ক হোটেলের এক শাড়ীর একজিবিশনে। সুনীতের সঙ্গে তার স্ত্রী মহুয়া। সুনীত আর মহুয়া শাড়ী ঘাটছিল। আমি কেবল শাড়ির শোভা দেখছিলাম। সেই সময় দ্বিতীয় এক মহিলার সঙ্গে মহুয়াকে দেখলাম গল্প করতে। তারই কিছুক্ষণ পরে মহুয়া সেই মহিলাকে আমার সামনে টেনে নিয়ে এল। তিনি সামনে এসেই কিছু না বলে আমাকে নমস্কার করলেন। মহুয়া মিষ্টি হেসে পরিচয় করিয়ে দিলে।

—মল্লিকা দাশগুপ্ত।
মনের ক্ষোভ বা বিরক্তি মনেই লুকিয়ে আমি ভদ্রতাসূচক ভঙ্গীতে বললাম—
—আপনার নাম শুনেছি···
মল্লিকা তার আগেই বলে উঠল
—আপনার নাম পুষ্পেনের কাছে অকেকবার শুনেছি। আলাপ হয়নি। কিন্তু একদা আমি আপনার কবিতার একজন ভক্ত পাঠিকা ছিলাম। আজকাল কী একদমই লেখেন না? দেখিনাতো!
—না।
—সামনের সপ্তাহে বিড়লা এ্যাকাডেমীতে আমার পেইন্টিং-একজিবিশন। আসবেন? আমার কাছে, আয়াম স্যরি, এখন একটাও কার্ড নেই। আমি মহুয়ার মারফৎ পাঠিয়ে দেবো। আসবেন কিন্তু।
স্বতস্ফূর্তভাবে হ্যাঁ বলতে পারিনি। কারণ আমার মন বলছিল, ঐ মেয়েটি হল পুষ্পেনের হত্যাকারী। ওর সঙ্গে মিশোনা শিবনাথ।
তবুও ঐ সুনীত মহুয়ার টানেই একজিবিশনে গিয়েছিলাম। একেবারে লাষ্ট ডেটে। সেদিন মল্লিকা আমাকে নিমন্ত্রণ করল ওর বাড়িতে। ঠিকানা লেখা কার্ডটা তুলে দিলে হাতে।
গতকাল গিয়েছিলাম। ওর আঁকা ছবি দেখলাম আরো অনেক। একটা প্রকান্ড কোলাজ দেখলাম নিজের বিছানার কাছে। ওর অভিনব ধরনের বুকর‍্যাক দেখলাম। সত্যই ও কবিতা ভালবাসে। অজস্র কবিতার বই থাকে থাক্। ওর রেকর্ডের স্তূপ দেখলাম। ঘরের কোনে কার্পেটের উপরে দাঁড় করানো তানপুরা দেখলাম। ওর হাসি দেখলাম। গর্বিত গ্রীবার মরালের মত হাঁটা দেখলাম। ওর সরু কোমরের ঢেউ এবং বুকের তরঙ্গ দেখলাম। ওর সরলতা দেখলাম। বুকের ভিতরের লুকনো শূন্যতা এবং কান্না এবং অভিমানের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। পুষ্পেনের আত্মহত্যার কারণও জানা হয়ে গেল। মল্লিকার কাছে হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়েছিল ওর ডিবচারি। সেই মৃত্যুর এত বছর পরেও মল্লিকা কেন বিয়ে করেনি তাও জানা হয়ে গেল। বুঝলাম, পুষ্পেনকে ও যথার্থই ভালবাসতো।
একদিনের আলাপেই মল্লিকা তার বন্ধ হৃদয়ের অনেকগুলো বোতাম খুলে ফেললে

আমার কাছে। উঠতে যাব। আমার সামনে এগিয়ে ধরল একটা ময়লা বই আর সবুজ ডটপেন। তাকিয়ে অবাক। আমারই কবিতার বই। আমার প্রথম ও শেষ কবিতার বই। মল্লিকার চোখে তখন শরৎকালের ভিজে শিউলীতলার মত এক সুস্নিগ্ধ অনুনয়...

—কবিকে পেয়েছি সামনে। ছাড়বো না। কিছু লিখে দিন।

দ্বিধান্বিত। কী লিখবো বুঝতে পারছি না। হঠাৎ উড়ো পালকের মত মনে এসে গেল জীবনানন্দের একটা কবিতার ভুলে যাওয়া কয়েকটা লাইন। আমি লিখে দিলাম—

"যে আমাকে চিরদিন ভালবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনদিনই দেখিনি
সেই নারীকে···"

—বাঃ, চমৎকার! জীবনানন্দের লাইন। জীবনানন্দ বুঝি আপনার সবচেয়ে প্রিয় কবি?

—হ্যাঁ।

—আমারও? বিদেশীদের মধ্যে?

—বোদলেয়ার। আপনার?

—রিলকে আর এলুয়ার। ঈস্, জানেন জীবনানন্দের দুটো বই আমার নেই। মহাপৃথিবী আর ঝরাপালক। পাওয়া যায় না আর?

—না বোধহয়। আপনি পড়বেন? আমার আছে।

—দেবেন?

—কেন দেব না?

—কবে আসছেন আবার?

—দেখি। গান শোনাবেন সেদিন?

—শোনাবো।

কোনও একদিন যাব কথা দিয়েছিলাম। আজ নয়। অথচ আজ এই সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় আমি এইমাত্র বাস থেকে নামলাম। ল্যান্সডাউনে। মল্লিকাদের বাড়ির কাছে। আমার হাতে, মহাপৃথিবী। ঝরাপালকটা খুঁজে পেলুম না। আজকেই কেন ছুটে এলাম? কাল কিংবা পরশু এলেও তো চলতো। হ্যাঁ চলতো। কোনদিন না এলেও কোন ক্ষতি ছিলনা। কেননা আমার জীবনকে আমি বানিয়ে নিয়েছিলাম পাড়হীন বিধবার শাড়ি। তবু ছুটে আসতে হল। কাল সারারাত, আজ সারা দিন আমার ভিতরে একটা তুমুল সাইক্লোন। ডুবে-যাওয়া জাহাজের মত আমি বিপন্ন, বিধ্বস্ত, আর্তনাদময়। কাল সারারাত, আজ সারাদিন মল্লিকার কাছে যাব কী যাব না এই প্রশ্নের ঝড়ো হাওয়ায় ওলোট-পালোট হয়েছি আমি। কাল সারারাত, আজ সারাদিন আমার শরীর জ্বরের জ্বলুনি-পুড়ুনির মত কেঁপে কেঁপে উঠেছে এক অপ্রতিরোধ্য যৌনকামনায়। যেন

দীর্ঘকালের পাথর-হয়ে-থাকার ঘুম থেকে সহসা জেগে উঠেছে মহেনজোদারের বৃষ, তার প্রবল জীবনীশক্তি নিয়ে। কাল সারারাত, আজ সারাদিন আমার ভিতরে কেবলই কথা বলে-বলে, হেসে-হেসে, হেঁটে-হেঁটে, দুষ্প্রাপ্য সেণ্টের গন্ধ ছড়িয়ে রাজহংসীর মত সাঁতার কেটেছে মল্লিকা। অনন্তকাল পরে জীবনের অর্থ ও স্বাদ খুঁজে পেয়েছি আমি। অনন্তকাল পরে কবিতার আবছায়াময় সব পংক্তি ভ্রমরের গুনগুনোনি শুরু করে দিয়েছে আমার চোখে, চিবুকে, চুলে, সর্বাঙ্গে। কাল সারারাত আজ সারাদিন কেবলই মল্লিকাকে বলেছি, কী প্রগাঢ় ঘুম, কী বিপুল অপচয়ের ভারী পর্দাটাকে তুমি সরিয়ে দিলে মল্লিকা, হঠাৎ আমি যেন এসে পড়েছি শতকোটী নক্ষত্রের নহবত-বাজানো সমারোহের ভিতরে। মল্লিকার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমার পা কাঁপছিল। কলিং বেলের সামনে হাতটা নিয়ে গিয়েও ফিরিয়ে এনেছিলাম একবার। কারণ আমি যে কর্কট রাশি এবং বৃষলগ্নের জাতক।

এইমাত্র কলিং বেলটা টিপলাম আমি।

এবার কে নিশ্চিহ্ন হবে? আমি? না মল্লিকা?

জানোয়ার

আমাদের ইচ্ছে ছিল না। না আমার, না নন্দিতার। সত্যি কথা বলতে কি, 'জীবে প্রেম করে যেই জন' নামের যে শোলোকটা বাজারে চালু আছে, সেটা আমার স্বভাবে নেই।

নন্দিতাও কলকাতা শহরের একেলে মেয়ে। ছিমছাম থাকতে ভালবাসে। আত্মকেন্দ্রিক হয়তো নয়। আত্মীয়কেন্দ্রিক বললে খানিকটা ঠিক বলা হয়। বিধাতা তার পিঠের দু দিকে দুটো ডানা এঁটে দিয়েছিলেন, যার একটার নাম রূপ, আরেকটার নাম গুণ। ডানা ঝাপটে বেহিসেবী উড়ে বেড়ানোর অনেক সুযোগ-সুবিধেও ছিল তার জীবনে। কিন্তু নন্দিতার স্বভাব, নিজেকে গুটিয়ে রাখা। সঞ্জয় গান্ধীর 'হাম দো, হামারা দো' শ্লোগান তৈরীর সাত বছর আগে অর্থাৎ আমাদের বিয়ের বছরে, ফুলশয্যার রাতে, খাটের বাজুতে জড়ানো ফুলগুলো শুকোতে না শুকোতেই সে হুঁসিয়ার করে দিয়েছিল আমাকে।

—দেখ, বাড়াবাড়ি করবে না কিন্তু। বেশী ছেলেপুলে ধাতে সইবে না আমার।

নন্দিতার আদেশ অমান্য হয়নি এখনো। এখনো পর্যন্ত আমাদের একটিমাত্র মেয়ে, সিঞ্জু। ভাল নাম সঞ্জিতা। আমার নাম সঞ্জীব। সঞ্জীব আর নন্দিতা মিলিয়ে সঞ্জিতা। সিঞ্জুর জন্যে বাড়িটা জন্তু-জানোয়ারে ভর্তি। কাঠের ঘোড়া,

তুলোর খরগোস আর হাতি, রাবারের রাজহাঁস, জিরাফ, দম-দেওয়া কলের কুমীর, প্লাস্টিকের ভালুক, এমনি আরও কত কি। ওদের উপদ্রবেই অস্থির আমরা। নতুন কোনো জীবন্ত উপদ্রবের দরকার ছিল না আর। তবুও যে বেড়ালটা শেষ পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে শিকড় গেড়ে বসল, তার মূলে ছিলেন মা এবং সিঞ্জু।

নন্দিতা যাবে তার স্কুলে। সে শিক্ষয়িত্রী। আমি যাব আপিসে। আমার চাকরি ব্যাঙ্কে। ডাইনিং টেবিলে দুজনের বাড়া ভাত! নন্দিতা সবে মাত্র খেতে বসেছে। আমি স্নান করে চুল আঁচড়াতে গিয়ে সারা ড্রেসিং টেবিলটা তছনছ করেও খুঁজে পেলাম না চিরুনীটা। আমার বিরক্তিকর চীৎকারে নন্দিতা খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে এসেছিল ছুটে, এঁটো হাতে। আর ঠিক সেই সময়েই, সেই এক পলকের সুযোগে নন্দিতার ঝোলের বাটি থেকে মাছটা খেয়ে গেল। সস্তার জিনিস হলে গায়ে লাগত না। মাছ এখন মধ্যবিত্ত সংসারে মহামূল্যের ধন। কুঁচো-কাচা কোনো মাছ হলেও মাথায় আগুন জ্বলে উঠতো না। সেদিন কিনেছিলাম রুই। ষোলো টাকা কিলো। হয়তো শুধুমাত্র রুই-এর জন্যে নয়। অনেকদিন ধরেই ছোটখাটো উপদ্রব চালিয়ে যাচ্ছিল। অনেক দিনের চাপা রাগ সেদিন ঝলসিয়ে উঠেছিল হঠাৎ। আমাদের বাড়িতে লাঠি নেই। রাগের মাথায় আমাদের শোবার ঘরের খাটের মশারী টাঙানোর একটা স্ট্যাণ্ড খুলে নিয়ে আমি উন্মাদের মত খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম বেড়ালটাকে। আমার উত্তেজনা ও চেঁচামিচি শুনে মা বেরিয়ে এসেছিলেন পুজোর ঘর থেকে। গায়ে গরদ। হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে চন্দনের নারায়ণ-ছাপ। মা শুধু একটা কথাই বলেছিলেন সেদিন। তাঁর শেষ বয়সের কোমল কণ্ঠস্বরে যতখানি বিরক্তি ও ক্রোধ ফোটানো সম্ভব সেইটুকু ফুটিয়ে।

—তোরাও কি অমানুষ হয়ে গেলি নাকি ?

তখুনি থমকে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। এই এক ফোঁটা, এক টুকরো বাক্যের মধ্যে দিয়ে মা কি বোঝাতে চাইলেন, তা বুঝে নিতে বেশী সময় লাগল না আমার। হয়তো নন্দিতারও লাগেনি। কাঠের স্ট্যাণ্ডটা খাটের গায়ে যথাযথ ভাবে লাগিয়ে আমি লুঙি ছেড়ে আপিসের প্যাণ্ট শার্টে শরীর ঢুকিয়ে নীরবে খেতে বসে গেলাম। খাবার টেবিলে আমি বা নন্দিতা একটা কথাও বলিনি আর। নন্দিতা বেরিয়ে গেল আগে। আমি পরে। বাস স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দেখি লোকারণ্য। তার মধ্যে রয়েছে নন্দিতাও। বাস আসেনি। ভীড় কাটিয়ে সে এগিয়ে এল আমার কাছে। তার চোখে মুখে থমথম করছে রাগ। কতটা মায়ের বিরুদ্ধে, আর কতটা যথাসময়ে বাস-না-পাওয়ার জন্যে, বুঝতে পারলাম না। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। নন্দিতা তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা লবঙ্গ মুখে দিল।

—তুমি কিন্তু আর কোনদিনও কিছু বলবে না। যা হচ্ছে হোক।

নন্দিতার চাপা গলায় আমার প্রতি এমন সহানুভূতিসূচক মন্তব্য শুনে আমি তার দিকে তাকিয়েছিলাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল না। তার চোখ নামানো ছিল মাটির দিকে।

—পৃথিবীতে উনি একাই যেন মানুষের দুঃখ্যে যত দুঃখ্যু পান। আমাদের আর মন বলে কিছু নেই, হার্ট বলে কিছু নেই।

আমি ফিস্‌ফিসিয়ে নন্দিতাকে বলেছিলাম—

—ও'র কথা নিয়ে অত ভেবো না। সেকালের মানুষ তো। ও'দের সব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থাকে।

—সারাজীবন ওর সেই একই খোঁটা। যেন দোষটা আমাদেরই। আমরাই কলকাতা শহরটাকে জানোয়ার করে তুলেছিলাম। ঘরের মধ্যে বসে আছেন। পৃথিবীতে কি হয়—না হয় কিছুই জানবেনও না, বুঝবেনও না। অথচ কথা বলা চাই।

বাস এসে গিয়েছিল। নন্দিতা ছুটে গেল ভীড়ের দিকে। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। এত ভীড়ে ওঠা যাবে না। তা ছাড়া হাতের সিগারেট তখনও আধখানা। নন্দিতার উগরে যাওয়া কথাগুলোকে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে সেদিন হঠাৎ হাসি পেয়েছিল আমার। মা আমাদের, বিশেষ করে আমাকে একটা প্রতীক করে নিয়েছেন। অমানুষের প্রতীক। যেমন করে একটা গোল পাথরকে ও'রা প্রতীক করে নেন নারায়ণের। আমার উপর অভিযোগ প্রকাশ করে মা শান্তি পান। তাঁর মনের, বুকের, ব্রহ্মতালুর বন্ধ জ্বালা-যন্ত্রণা মুক্তি পায়। আমাকে অপমানিত করে মা প্রতিশোধ নেন তিন বছর আগের সেই অন্ধকার যুগের রক্তে ভেজা অন্ধকার রাত্রিটার উপর। যার জন্যে আমি দায়ী নই, নন্দিতা দায়ী নয়। কে দায়ী জানি না। সেই যুগটা, সেই অন্ধকার রাতটা কবে মুছে গেছে। কিন্তু আমার মায়ের কাছে, মায়ের চোখে এখনও টিকে আছে সবটুকু। তিনি নেভাননি। যতদিন বেঁচে থাকবেন নিভবে না। আর ততদিন আমাদের বইতে হবে কাপুরুষ অথবা অমানুষ নামের এই অসম্মান।

যাই হোক, সেদিন থেকেই বেড়ালটা আমাদের বাড়ির একজন স্থায়ী সদস্যের অধিকার পেয়ে গেল। আমাকে এবং নন্দিতাকে দেখলে ল্যাজ গুটিয়ে পালায়। মা এবং সিঞ্জুর কাছে তার নির্ভয় আসা-যাওয়া। বেড়ালের লোম বা লালা কোনো ভাবে শরীরে ঢুকলে ডিফথিরিয়া হয়, সেই ভয়ে নন্দিতা অনেক রকম করে বুঝিয়েছিল সিঞ্জুকে। শোনেনি। কাঠের, প্লাস্টিকের, রবারের সমস্ত জন্তু-জানোয়ার বরবাদ। বেড়ালটাই হয়ে উঠল তার খেলাধুলোর প্রধান সঙ্গী। সিঞ্জু ইতিমধ্যে তার একটা নামকরণও করে ফেলেছিল। টুনি। আমরা বারণ করলাম।

—টুনি তোমার ছোট মাসির ডাক নাম। ও নামে ডেকো না। ছিঃ।

শেষ পর্যন্ত আমাদেরই নাম বাতলে দিতে হল। জুলি। ঐ নামে একটা হিন্দী ছবি চলছিল কলকাতায়। আমরা দেখেছিলাম। বাংলার চেয়ে হিন্দী ছবিই আমরা বেশী দেখি। দেখে বেশ ফুর্তি পাওয়া যায়। মনটা চাঙ্গা থাকে। মনের অনেক গোপন ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষা আড়াই ঘন্টার জন্যে খুঁজে পায় চরিতার্থতা।

সিঞ্জু আর জুলি ক্রমে অভেদ আত্মা। আগে ও মশগুল ছিল ঘরের মধ্যে জুলির সঙ্গে খেলাধুলো নিয়ে। এখন মশগুল পাড়া প্রতিবেশীকে ডেকে ডেকে ওর বাহাদুরি দেখাত। একদিন আপিস থেকে বাড়ি ফিরে অবাক। আমাদের শোবার ঘরে টুনি।

—আরে! তুমি কখন এলে?

—অনেকক্ষণ। একঘন্টার ওপর।

—তোমার দিদি ফেরেনি?

—কই না। দিদির জন্যেই তো বসে আছি।

—কিছু খবর আছে নাকি? হলুদ খামের ব্যাপার-স্যাপার ঘটতে চলেছে বুঝি? দেখো, তখন যেন আবার অতিথি নিয়ন্ত্রণ দেখিও না।

আমার ইঙ্গিতটা বুঝে টুনি লজ্জা পাওয়ার বদলে সারা শরীর ঝাঁকিয়ে হেসে উঠল। হাসির দুলুনিতে তার কাঁধের ধার থেকে শাড়ির আঁচল গড়িয়ে পড়ল নীচে। টুনির ভরন্ত বুক থেকে এক ঝলক সাদা জ্যোৎস্না ঠিকরে এল আমার চোখে। টুনি আঁচল সামলিয়ে বললে—আপনার খুব খাবার লোভ হয়েছে দেখছি।

টুনি ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। ব্রিলিয়েন্ট মেয়ে হিসেবে ওর নাম আছে। ইতিহাস নিয়ে অনার্স। ওর দিদিও ভাল ছাত্রী ছিল। টুনি দিদির চেয়েও জ্বলজ্বলে। সর্ববিষয়ে। পড়াশোনায় এবং স্বাস্থ্যে-শরীরে। ইস্কুল মাস্টারী করে করে নন্দিতার চোখে মুখে হয়তো তার নিজের অজান্তেই, গেঁথে বসে গেছে এক ধরনের শুকনো গাম্ভীর্য। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমিও যেন তার অন্যতম ছাত্র। আমার বিরক্তি লাগে। প্রতিবাদ করেছি। নন্দিতা হেসেছে। প্রাণপণ হাসিতেও কিন্তু মুছতে পারছে না কপাল এবং ভুরুর অনর্থক ভাঁজগুলো। টুনির কপালে ভাঁজ নেই। কপালে বেগুনী রঙের টিপ। শাড়ির সঙ্গে মেলানো। টুনির কথার মধ্যে, কথা নয়, ঠাট্টাটার মধ্যে দু-রকম ইঙ্গিত ছিল। আমিও একটা দ্ব্যর্থবোধক উত্তর শোনালাম তাকে।

—ঠিকই ধরেছ। সেই তোমার দিদির সঙ্গে বিয়ের পর তো আর কিছু খাইনি।

—বেশ তো, একদিন বাড়িতে আসবেন। খাইয়ে দেবো।

—খাওয়াবার ইচ্ছে থাকলে, এই বাড়িতেও খাওয়ানো যায়।

ইতিহাসের ছাত্রীরা মনস্তত্ত্বও বোঝে। টুনির গাল গোলাপী হয়ে উঠল নিমেষে।

আমিও লজ্জা পেলাম, আমার মনের হ্যাংলামোপনা বুঝতে পেরেছে বলে। মন থেকে রসিকতার মেজাজ এবং গা থেকে আপিসের জামাটা খুলে ফেলে, ফ্যানের রেগুলেটর আরো একটু বাড়িয়ে দিয়ে আমি ওর থেকে খানিকটা দূরে একটা মোড়ায় বসলাম।

—কি ব্যাপার বল। হঠাৎ এলে কি মনে করে?

—বাঃ রে। বেশ মজাতো। আমি এসেছি নাকি? আমাকে তো ফোন করে ডেকেছে সিঞ্জু।

—সিঞ্জু?

—হ্যাঁ। বাড়িতে ফিরতেই মা বললে, সিঞ্জু ফোন করে তোকে ডেকেছে। দেখে আয় তো কি হল। আমরা তো ভয় পেয়েছিলাম। বুঝি দিদির কোন অসুখ।

—তা হলে তো আমিই ফোন করতাম।

—সেটা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু মা এমনভাবে বললেন, তর্ক করলুম না।

—যাক গে, তর্ক না করে ভালই করেছ। তোমার মুখ দেখা গেল। সিঞ্জু ওর বেড়াল দেখাতে ডেকেছিল, তাই তো? ও এখন ঐ করে চলেছে।

—চা খাবে?

—না। থাক।

—না কেন? দিদি নেই বলে কিছু না খেয়ে চলে যাবে নাকি? খাও, খাও। তুমি খেলে আমারও একটু খাওয়া হবে। গ্যাস আছে। এক মিনিট তো লাগবে।

—মোটেই না-খেয়ে নেই আমি। মাসীমা সন্দেশ রসগোল্লা আনিয়ে জোর করে খাইয়েছেন।

এই সময় নন্দিতা এসে গেল। সব শুনে নন্দিতার প্রথম প্রশ্ন সিঞ্জুকে।

—কাদের বাড়িতে গিয়ে ফোন করলে?

আশ্চর্য। আমাদের ফোন নেই। সিঞ্জু টুনিকে ফোন করে ডেকেছিল শুনেও আমার মাথায় একবারও এ প্রশ্ন জাগেনি, কাদের বাড়িতে গিয়ে ফোনটা করেছিল সে। সিঞ্জু কোনো উত্তর দিল না। উত্তর দিতে এগিয়ে এলেন মা। যতক্ষণ আমি এবং টুনি এই ঘরে ছিলাম, মা ঢোকেননি। নন্দিতা আসাতে ঢুকলেন। আমার সেকেলে মাও কোনো কোনো ব্যাপারে আধুনিক।

—শম্পাদের বাড়িতে টেনে নিয়ে গেল আমাকে। সেইখান থেকে ফোন করল। কত বারণ করি—শোনে নাকি একবারও।

নন্দিতা চা করল। চা খেতে খেতে হাসাহাসি হল, সিঞ্জু গোড়ায় তার বেড়ালটার নাম দিয়েছিল টুনি, সেই নিয়ে। রাত্রি হচ্ছে দেখে উঠে পড়ল টুনি। ওকে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে এলাম। রাস্তায় কোনো কথা বলিনি। শুধু

টুনিকে দেখছিলাম। ওর হাঁটা। ওর ঝোলানো বেণী। ওর সাদা ঘাড়ে লেগে থাকা ঝুটো মুক্তোর মালা। ওর বেগুনী প্রিন্ট শাড়িতে চাঁপা রঙের গোল গোল ফুল। ও বাসে উঠবার মুহূর্তেই কথা বললাম শুধু—

—আবার আসবে।

টুনি 'আচ্ছা' বলে লাফিয়ে উঠল। ফেরার পথে মনে মনে ধন্যবাদ জানালুম সিঞ্জুকে। ভালই করেছিল ফোনটা করে। কতদিন পরে টুনিকে দেখতে পেলাম। শান্ত পুকুরে ঢিল ছোঁড়ার মত এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার অল্প একটু ঢেউ। বেশ আরামের এবং উষ্ণতার।

তারপর থেকে প্রতি দিনের ধরা বাঁধা জীবন। তারপর থেকে বেড়ালটাকে নিয়ে আমাদের মাথা-ব্যথা অনেকটা কম। বেড়ালটাও বদলে গেছে আশ্চর্য রকম। এখন খাবার টেবিলে মাছের বাটি রেখে নন্দিতা যদি উঠে আসে, মাছ খেয়েনেওয়ার ভয় নেই। সে জেনে গেছে, তার নির্দিষ্ট বরাদ্দ সে পাবেই। তবে একটা অন্য উৎপাত শুরু হল মাস দেড়েক পর থেকে। অন্য বাড়ির একটা হুলো বেড়াল প্রায়ই আমাদের বাড়ির দেয়ালের উপর দিয়ে হাঁটাচলা শুরু করে দিলে। প্রথম আসতো-যেতো নীরবে। তারপর ক্রমশ বাড়তে লাগল রাগ-আক্রোশ। জুলি বাইরে বেরোলেই আক্রমণ করতো তাকে। বাঘের মত গর্জন করে উঠতো তার গলা। অজগরের মত ফোঁস-ফাঁস। প্রচণ্ড লড়াই আর ঝাপটা-ঝাপটি। সিঞ্জু তাড়া করলে পালিয়ে যেতো। সিঞ্জু জুলির কানে পরামর্শ দিত।

—তুই আর ওর সঙ্গে মিশবি না। ও বাজে ও দুষ্টু।

দিনের বেশীর ভাগ সময় আমরা বাড়ির বাইরে। ঐ সময়ে কি ঘটত জানি না। তবে রাত্রে দেখতে পেতাম সেই হুলো বেড়ালটার অন্য চেহারা। অবিকল মানুষের মত কোমল এবং কাতর গলায় সে পাঁচিলের ওপার থেকে কাঁদতো। মনে হতো যেন কথা বলছে সে। ব্যর্থ প্রেমিকেরা যেমন বলে থাকে করুণ গলায়। এই রকমই চলছিল কিছুদিন। আরও মাস খানেক বাদে একদিন আপিস থেকে ফিরেছি। দরজা খুলে দিয়েই সিঞ্জুর কী লাফ-ঝাঁপ। মুখ-চোখ হাসি-খুশিতে পাকা পেয়ারার মত টসটসে। সে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ড্রইং রুমে। বইয়ের আলমারির তলা থেকে টেনে বার করল একটা কাঠের ডালা। ওটা ছিল আমার ছোট বোন সঙ্গীতার হারমোনিয়ামের বাকসের ঢাকা। বিয়ের আগে সঙ্গীতা গান শিখতো। ডালাটার ভিতরে এক রত্তি তিনটে বেড়াল বাচ্চা। কুঁকড়িয়ে-মুকড়িয়ে গায়ে-গায়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ডালার ভিতরে ছেঁড়া ন্যাকড়ার বিছানা আমার ভাল লাগছিল দেখতে। তবুও আমার গলায় ফুটে উঠল রুক্ষতা।

—এসব কোথ্যেকে এল ?

সিঞ্জুর মধ্যে কোন ভয়-ডর নেই। সে অকপট।

—এরা তো জুলির মেয়ে। বিকেল বেলা, দিদা যখন আমাকে বেলের সরবৎ করে দিচ্ছিল, তখন জুলি একটা একটা করে নিয়ে এল। নিয়ে এসে দিদার

খাটের নীচে লুকিয়ে রাখল। আমি আর দিদা ওদের থাকার ব্যবস্থা করলাম তারপর। জানো বাপি, কি নোংরা হয়েছিল ওদের গা। দিদা সব পরিষ্কার করেছে ন্যাকড়া দিয়ে। ওরা কিন্তু কাঁদেনি একদম।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। বুঝলাম, নন্দিতা এলে আগুন জ্বলবে। কিন্তু নন্দিতা বাড়িতে ফিরে সব দেখে-শুনেও কোন কথা বলল না। সেটা ধাঁধার মত লাগল আমার কাছে। রাতে, বিছানায় শুয়ে কৌশলে ওর মনোভাবটা জানবার জন্যই মিথ্যে রাগের ভান করলাম।

—সিঞ্জুকে তোমার একটু বকা উচিত ছিল।

—কেন?

—কেন মানে? বড় হচ্ছে। এখন একটু একটু করে পড়াশুনোয় মন দেবে। তা নয়, বেড়াল-বেড়াল করে দিনরাত এসব কি হচ্ছে? তা ছাড়া আমাদের বাড়িটা কি বেড়ালের বাড়ি হয়ে যাবে নাকি?

—সব কথা আমাকেই বলতে হবে কেন? তুমি তো আছ। তুমিও তো বলতে পার, বারণ করতে পার। আমি আগ বাড়িয়ে বলবো। উনি ভাববেন, আমার ছেলে কিছু বলছেন না, যত বাড়াবাড়ি কেবল বউমার। ভবেনকে রাখার সময়ও আমিই প্রতিবাদ করেছিলাম প্রথম। মা, ওকে চলে যেতে বলুন। আপনি জানেন না, এর থেকে কী সাংঘাতিক কাণ্ড হতে পারে। দিনকাল ভীষণ খারাপ। তখন মা রাগ করে আমার সঙ্গে কথা বলেননি। কিন্তু তোমার সঙ্গে বলতেন। তুমিও অনিচ্ছা জানিয়েছিলে ঠিকই। কিন্তু মায়ের ধারণা, আমিই শিখিয়ে পড়িয়ে তোমার মুখে কথাগুলোকে তুলে দিয়েছিলাম।

সেদিন আমি আর কথা বাড়াইনি। দিন তিনেক পরের কথা। দাড়ি কামাচ্ছি। হঠাৎ চমকে উঠলাম পায়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগায়। ঘুরে তাকিয়েই দেখি, তিনটে বেড়াল বাচ্চার—একটা। আমাকে নড়তে দেখেই ছুটে পালিয়ে গেল আলমারীর দিকে।

সিঞ্জু আলমারীর সামনে যেন একটা দুর্গ বানিয়েছিল। হাতী, ঘোড়া, খরগোস, রেল গাড়ি, মোটর গাড়ি খেলনা, পিয়ানো এরোপ্লেন আবার তার সঙ্গে এদিক-ওদিক জোগাড় করা কাঠ-কাটরা দিয়ে।

একটু পরে আবার একবার তাকিয়েছি। বাচ্চাটা অবিকল বাঘের ভঙ্গীতে, যেন সামনেই রয়েছে তার শিকার এবং এখুনিই তার শেষ লাফটি ছুটে যাবে শিকারের টুঁটির দিকে, এইভাবে সে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল আমার দিকে। কি তুলতুলে চেহারা। যেন তুলো দিয়ে বানানো। সাধারণত জন্তু-জানোয়ারের জন্য আমি কোনদিন মায়া-মমতা অনুভব করিনি। কিন্তু সেদিন করলাম। ইচ্ছে করছিল ওকে ছুঁয়ে একটু আদর করি। কোলে নিই। আমি হাত বাড়াতেই সে আবার পালিয়ে গেল তাদের নিজস্ব দুর্গের দিকে। আর সেই মুহূর্তে আমার মনে হল টুনিকে।

ভেবেছিলাম অফিসে গিয়ে ফোন করবো টুনিকে। আসতে বলবো। কিন্তু ফোন করিনি। পাছে নন্দিতা ভাবে, বেড়াল বাচ্চাগুলোকে পোষার এবং আদর করার পক্ষে সমর্থন রয়েছে আমার।

কিন্তু আপিস থেকে ফিরে একদিন অবাক হলাম টুনিকে আমাদের ড্রইংরুমে দেখে। বুঝলাম, সিঞ্জুর কান্ড। টুনি আর সিঞ্জু মশগুল হয়ে, মেঝের উপর বসে ওদের সঙ্গে খেলা করছে। আমি বসলাম টুনির খুব কাছাকাছি। টুনি শুধু বেড়ালগুলোকে নিয়ে আমোদ পাচ্ছিল। আমি আমোদ পাচ্ছিলাম বেড়াল এবং টুনিকে নিয়ে। টুনি বাঁকে, শুয়ে পড়ার ভঙ্গীতে হাসে, নীচু হয়, হাত বাড়ায়, ভয় পাওয়ার ভঙ্গী করে। আমি তারই ফাঁকে ফাঁকে টুনির বিনুনি ধরে মৃদু টান দিই। তার খোলা ঘাড়ে আলতো হাত রাখি। খালি কোমরটা ছুঁয়ে নিই একটু। ঠোকা মারি গালে। টুনি বারণ করে না। কটাক্ষ হানে না। আমার সাহস বাড়ে। লোভ লম্বা হয়। কুন্ডুলী খুলে যেভাবে লম্বা হয় সাপ। এক সময় হঠাৎ একটা বাচ্চা বেড়ালকে দুহাতে জাপটে ধরলাম আমি। বেড়ালটা তার দুধের গলায় ক্যাঁও ক্যাঁও আর্তনাদ করতে লাগল। আমি কান দিলাম না। বেড়ালটাকে শূন্যে ঝুলিয়ে আমি টুনির মুখের কাছে ঘড়ির পেন্ডুলামের মত দোলাতে লাগলাম। টুনি মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল। আমিও দাঁড়ালাম। এগিয়ে গেলাম টুনির দিকে। এগিয়ে দিলাম বেড়ালটাকে টুনির দিকে।

টুনি বললে—হাতে দিন।

টুনি হাত বাড়াল। আমি হাতে দিলাম না। টুনির গলার নীচে যতখানি জায়গা জুড়ে জ্যোৎস্নার জমি, তারই দিকে বেড়ালকে এগিয়ে দিলাম। টুনি তখনও হাসছিল। সে ভাবছিল, মজা করছি। আমি মজা করছিলাম না। আমি চাইছিলাম ঐ জ্যোৎস্নার জমিটা থেকে এক খাবলা নরম মাটি আমার জন্যে বেড়ালটা খামচে আনুক। আমি সত্যি সত্যিই বেড়ালকে চেপে ধরলাম ওর বুকে। নরম নখে বেড়ালটা আঁচড়াতে লাগল ওর বুক। টুনি তখন সত্যিই ভয় পেয়েছে। ভয় এবং বিরক্তি দুই-ই তার মুখে তখন স্পষ্ট। সিঞ্জুর মুখ থেকে নিবে গেছে হাসি। আমার এমন আলগা পাগলামি, সে দেখেনি কখনো। টুনি এক সময় চীৎকার করে উঠল।

—কেন, এমন করছেন? দেখছেন না, বুকটা চিরে যাচ্ছে।

টুনির চীৎকারে, তিরস্কারে আবার স্বাভাবিক হলাম আমি। মেঝেয় নামিয়ে দিলাম বেড়ালটাকে। বেড়ালটা ছুটে পালিয়ে গেল তাদের দুর্গের দিকে। আমি টুনির কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারলাম না। টুনি তখন তার বুকের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। সরু সরু কয়েকটা দাগ। সমস্ত দাগটা জুড়ে রক্তের ছোট ছোট বিন্দু। আমি ভয় পেলাম। টুনির জন্যে নয়। নন্দিতার জন্যে ভয়ে ভয়ে বললাম—

—স্যরি টুনি। বুঝতে পারিনি। ডেটল দেবো ? লাগাবে ?
টুনি আঁচল চাপা দিল বুকে। মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ। আমি ডেটল এনে দিলাম। সেই সময়েই নন্দিতা পেঁছে গেল। টুনির চেয়ে, টুনির হাতে ডেটলের শিশি দেখে অনেক বেশী অবাক হল সে। ইতিহাসের ছাত্রী হলেও টুনি রোমান্স বোঝে। সেই-ই আমাকে বাঁচাল, নিজের ঘাড়ে দোষটা টেনে নিয়ে। টুনি তার পরেও হাসল, কথা বলল তার দিদির সঙ্গে। আমি পারলাম না। টুনি যখন চলে যাবে, নন্দিতা বললে—
যাও, ওকে বাস স্ট্যান্ডে পেঁছে দিয়ে এস।
টুনি বললে—না, না। আমি একাই যেতে পারবো।
টুনি চলে গেল। টুনি যেদিন চলে গেল, তার পরের দিন রাত্রেই, মাঝরাতে ঘটল সেই অমানুষিক ঘটনাটা। আমাদের ঘুম ভাঙল মায়ের ডাকাডাকিতে।
—ও মন্টু, ও বউমা ! শিগগির ওঠো।
আমি ঘুম ঘুম আড়ষ্টতার মধ্যেই জিজ্ঞেস করলাম,—কি হয়েছে ?
মা কি যেন বললেন। মায়ের গলার চেয়ে আরও স্পষ্ট করে আমি শুনতে পেলাম ড্রইংরুমের দিক থেকে খড়খড়, ধড়ফড় নানা রকম শব্দ আর সরু গলার তীক্ষ্ম এবং প্রাণান্তকর আর্তনাদ। ঠিক যেন ভবেনের শেষ চীৎকার।
—মন্টুদা ! আমাকে বাঁ-চা-আ-আ-ও-ও।
মে-এ-এ-রে-এ-এ……
আমি লাফিয়ে নেমে পড়লাম বিছানা থেকে। আলো জ্বাললাম। আমি এবং মা ড্রইংরুমের ছিটকিনি আর খিল খুলে ভিতরে ঢুকলাম। ড্রইংরুমের আলো জ্বালার সুইচটা খুঁজতে অনেকটা সময় লেগে গেল। তখনো ঘরের মধ্যে ঝটাপটি করে চলেছে কারা। কিছু যেন তছনছ হচ্ছে কার আক্রমণে। জান্তব চীৎকারে ঘরের বাতাসটা ভর্তি।
আলো জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম গাবদা হুলো বেড়ালটা পালিয়ে গেল জানলা দিয়ে। তারপরেই আমাদের চোখে পড়ল ঘরের মেঝেটা। সিঞ্জুর খেলনাগুলো সারা মেঝেয় ছড়ানো। মেঝেয় ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। তিনটে বাচ্চা বেড়ালের একটা নেই। বাকী দুটো রক্তাক্ত শরীরে লুটিয়ে আছে মেঝের উপর। মা এই দৃশ্য দেখে আর্তনাদ করে উঠলেন।—ও মন্টু। এ কি হল রে ?
আমি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেলাম। মা কি মূর্ছা যাবেন নাকি ? ভবেনের মৃত্যুর পর যেমন হয়ে গিয়েছিলেন ? মাকে সেই দৃশ্য আমরা দেখাতে চাইনি। মা-ই জোর করে ছুটে গিয়েছিলেন, ভবেনকে বাঁচাবেন বলে। মায়ের ধারণা হয়েছিল সাতটা ছেলের সাত দুকুনে চোদ্দটা হাতের ছোরা-ছুরি-লাঠি-পাইপগান আর চোদ্দটা চোখের শান দেওয়া হিংসার হাত থেকে তিনি ছিনিয়ে আনতে পারবেন ভবেনকে। পারেননি। মা যখন ভবেনের বুকের উপরে

আছড়ে ফেলেছিলেন নিজেকে, তখন সে মারা গেছে। তখন সে শুধু ক্ষতবিক্ষত আর রক্তাক্ত একটা মৃতদেহ। মায়ের ধারণা হয়েছিল, আমরা বাধা দিলে ভবেন বাঁচতো। আমরা বাধা দিলে, মা জানেন না, মৃত্যুর সংখ্যা হতো তিন। মা জানেন না, তাঁকে তখনো কোনদিন বলিনি, ওর হত্যাকারীরা একদিন রাতে রাস্তার উপরে ভয় দেখিয়েছিল আমাকে।

—আপনি কিন্তু ওকে আশ্রয় দিয়ে ভাল করছেন না। ও আমাদের শ্রেণীশত্রু। আমরা ওকে খতম করবোই।

শ্রেণীশত্রু কাকে বলে মা জানেন না। আমাদের মায়েরা সেকেলে। ভবেন সম্পর্কে তাঁর বোনপো। ইছাপুর থেকে পালিয়ে সে উত্তর কলকাতার এই এক প্রান্তে পালিয়ে এসেছিল। মা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন আমাদের বারণ না শুনেও। বাঁচবে বলে ও ঘর থেকে বেরোত না। মৃত্যুর আতংকে সে হলুদ হয়ে গিয়েছিল। কোন কথা বললে সে আধমরার মত তাকিয়ে থাকতো। ওকে দেখে আমার এবং নন্দিতার মায়া লাগতো। কিন্তু তবুও ওকে মনে হতো একটা উপদ্রব। ওর জন্যে আমরাও বোমা খেয়ে মরতে পারি যেকোন দিন। লুকিয়েই ছিল ভবেন। তবুও কি করে খবরটা পৌঁছে গিয়েছিল শত্রুপক্ষের কাছে। বোমা ফাটিয়ে, দরজায় লাথি মেরে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ভবেনকে। ভবেন মরে গিয়ে বীর হয়ে গেছে। আমরা মায়ের চোখে চিরদিনের জন্যে কাপুরুষ রয়ে গেলাম।

সেই মায়ের দিকে তাকাতে আমার তখন ভয় হচ্ছিল। তিনি কি মূর্ছা যাবেন? তিনি কি, ভবেনের মৃত্যুর পর যেভাবে কিছুদিনের জন্যে অন্নজল ত্যাগ করেছিলেন, তেমনি করবেন এবারেও?

এসব ভাবতে ভাবতেই, মায়ের মন থেকে কাপুরুষ অভিযোগটাকে মুছে ফেলার জন্যে আমি ছুটে গেলাম মৃত বেড়াল দুটোর দিকে। কিন্তু ভবেনের মত তারাও মারা গেছে আমার পৌঁছবার আগে। একটু পরেই উঠে পড়ল সিঞ্জু এবং নন্দিতা, আমাদের চাপা উত্তেজনার শব্দে। মৃত এবং রক্তাক্ত বেড়াল দুটোর দিকে তাকিয়ে সিঞ্জু সেই যে অঝোর কান্না শুরু করল, আর থামান যায় না। আমি ওকে বোঝাতে লাগলাম।

— ওরা জানোয়ার, নিজেদের ছেলেকে ওরা খুন করে। হুলোটাই ওদের শেষ করে গেছে। তুমি কেঁদোনা সিঞ্জু। লক্ষীটি, কেঁদোনা।

সিঞ্জু আমার মায়ের কোলে আছড়ে পড়ে কেঁদেই চলল। এই প্রথম মৃত্যু দেখল সে।

পৃথিবীর যে দিকটা দক্ষিণ, সেই দিকে মদনের মুখ।
—ও পদ্দো পিসী-ই-ই, পদ্দো পিসী গো-ও-ও, ও সেজ্ জেঠা-আ-আ, সেজ্ জেঠা-আ-আ, ও শৈলদিদি-ই-ই, ওরে ও বুনো-ও ও, পারুলী রে এ-এ-এ, আরে ও পারুলী-ই-ই-ই-ই—
মদনের যখন দক্ষিণ দিকে মুখ, পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম এমন কি উর্ধ্ব অধঃ জুড়ে প্রকৃতি তখন মেতে উঠেছে এক সর্বনাশা খেলায়।
প্রতিযোগিতার খেলা। কে আগে পৃথিবীর কতটা গ্রাস করতে পারে। মদনের আকণ্ঠ চিৎকার তাই যথাস্থানে পৌঁছায় না। বাতাসের তোড়ে ভেসে যায় অন্য দিকে। বৃষ্টির ছাটে মিইয়ে যায়। চাপা পড়ে যায় বজ্রের কড়কড়ে ডাকে। মদন ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারে না। খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি আর ভিজে মাথায় ল্যাপটানো চুলে মদনের জংলা হয়ে ওঠা মুখে তার হেরে যাওয়ার ছবিটা কর্কশ হয়ে ফুটে ওঠে। দৃশ্যটা দেখে প্রচণ্ড আলোর করতালি দিয়ে বিদ্যুৎ নেচে বেড়ায় আকাশের দশ দিকে। আজীবনের এক-রোখা মদন, শুয়োরের মত গোঁয়ার মদন সমগ্র আকাশ-পৃথিবীর উদ্দেশে এইবার মুখখিস্তি করে ধনুকের মত বেঁকে। —বাপের পিণ্ডি খা শালারা।
এইটুকুই সে চেঁচিয়ে বলে। দম নেয়। সামলে নেয় শ্বাসকষ্ট।

তারপর কিছুটা আকাশ-পৃথিবী, কিছুটা নিজেকে শুনিয়ে মনস্তাপের ভঙ্গীতে বলে—

—ই শালাদের জন্যে মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা পর্যন্ত কইতে পারবেনি দেখতেছি। তবে তোরাই থাক। মোরা মরি। মানুষ কি ভগমানের চক্ষুশূল হল নাকি আজ? মানুষ যদি না বাঁচে ভগমানকে ভগমান বলে ডাকবে কি ভাগাড়ের শিয়েল-কুকুর?

মদনের কথা শেষ হবার আগেই আচমকা একটা দমকা হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। একই সঙ্গে গালে চড়, পিঠে ঘুঁষি, পেটে লাথি খেয়ে মদন পড়ে যায় হাঁটু জলে। সকাল থেকে ভিজে ভিজে সাতাশ বছরের শক্ত সমর্থ মদন যেন ছোটখাটো এবং ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। তেলেভাজা মাছের মত, ঝড়ে-জলে দিশে-হারানো কাক-শালিকের মত সিঁটিয়ে গুটিয়ে গেছে সে। তার হাতের আঙুলে পায়ের আঙুলে হাঁজা। পচা ঘায়ের মত। সাদা সাদা। চাকা চাকা। ফোলা ফোলা। কাঁটায় এবং ভাঙা শামুকে তার পা দুটো ক্ষতবিক্ষত। উদ্ধারহীন বিপন্নতার বোধ তার মুখটাকে লম্বা করে দিয়েছে আধ ইঞ্চি। তবে যে-চোখে সকালেও আগুন ছিল, এখন সেটা নিবে গিয়ে এবং ময়লা পৃথিবীর প্রতি-বিম্ব মেখে ধূসর ছাই। তার সারা গায়ে আঁশটে গন্ধ।

—ও পদ্দো পিসী-ই-ই, পদ্দো পিসী গো-ও-ও, ও নগেন কাকা-আ-আ, খুব বিপোদে পড়ে তমাদের ডাকতেছি গো-ও-ও, সব্বোনাশে পড়েছি আমিই-ই, ও সেজ জেঠা-আ-আ, বুনো রে-এ-এ, ও বুনো-ও-ও, ও রাখাল-ল-ল—

কাঠের গলা হলে চিরে যেত। পাথরের গলা হলে ফেটে যেত। এমনি জোরে প্রায় আধঘণ্টা চিল্লিয়ে চলেছে মদন। এর মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলসেছে বার চল্লিশেক। বাজ পড়েছে বার চল্লিশেক। মেঘের ঘড়-ঘড়ানি সারাক্ষণ। গরম তেলে ফোড়ন ছাড়ার মত চড়বড় চড়বড় বৃষ্টির শব্দ সারাক্ষণ। এরই সঙ্গে মিশে রয়েছে বাতাসের নানান রকম শব্দ। কখনো জ্বরের বেহুঁশ রুগীর মত ছাড়া ছাড়া গোঙানী। কখনো মাতালের প্রলাপের মত উল্টোপাল্টা সাঁই সাঁই। কখনো পাগলের মত হাহা হোহো হাসি। বাতাসকে কখনো চোখে দেখা যায় না। কিন্তু আজ যেন দেখা যাচ্ছে। মদন দেখতে পাচ্ছে। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত? দৈত্য-দানবের মত? নাকি একপাল উন্মত্ত ঘোড়া স্বাধীনতা পেয়ে গেছে তাদের খুরে খুরে পৃথিবীর হাড়-পাজরকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার। কখনো কখনো মনে হয়, যেন কোনো বিশালকায় অপদেবতা মহা-প্রলয়কে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। এখানটা ডোবাও। ওখানটা ভাসাও। মুছে দাও ঐ গ্রামটাকে। মাথা মুড়িয়ে ন্যাড়া করে দাও ওর ঘর-দোর। আর এই ছোকরা মদন দোলুই, ভারী অহংকারী ছেলে, কারুর বাঁয়ে ফেরে না, পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের মাতব্বর, পাড়ার মানুষকে

রাজনীতি বোঝায়, কখনো কখনো দেয়ালে পোস্টার সাঁটে, এই তো কদিন আগে খেত-মজুরদের রোজ বাড়াবার জন্যে ছেষট্টি জনের মিছিল নিয়ে হেঁটে গিয়েছিল শশাঙ্ক হাজরার বাড়িতে, ঘেরাও করে ফেলেছিল অমন দাপ-দাপটের তেজী মানুষটাকে, এর বাড়ি-বাগানটাকে, ডোবাটাকে, গোয়ালটাকে একবারে তলিয়ে দাও তো জলের তলায়। ছোকরাটার অহঙ্কারের আরও একটা বড় কারণ বউটা সুন্দরী। অনেকটা মা দুর্গার মত মুখ। ভারী সুন্দর টানা টানা চোখ। মুখের হাসিটি যেন ফোটা শালুক। ও ব্যাটার যা-কিছু অহঙ্কার গুঁড়িয়ে মুঁড়িয়ে থ্যাঁতা-ছেঁচা ব্যাঙের মত চিৎপাত করে দাও তো। আর ঐ বউটাকে··· মদন নিজের মনে শিউরে ওঠে। সত্যি যদি অপদেবতার হাওয়া লাগে সুভদ্রার গায়ে? সুভদ্রা যদি বিয়োতে না পারে? বিয়োনোর পর যদি ছেলেটা মরে যায়? যদি মরা ছেলে বিয়োয় সে?

—ও শৈল দিদি-ই-ই, ও পদ্মো পিসী-ই-ই, সেজ জেঠা গো-ও-ও, আগো ও খুড়িমা-আ-আ, আরে ও বুনো-ও-ও, বুনো রে-এ-এ, তোর মাকে এগবার ডেকে দেনা রে-এ-এ, আমি তোর মদনা কাকা ডাকতেছি, খুব বিপোদে পড়ে ডাকতেছি রে-এ-এ, তোর খুড়িমার বেথা উঠেছে-এ-এ, ছেলে হবার বেথা-আ-আ, কাটা পাঁঠার মত ছটকোচ্ছে রে-এ-এ, পেথম বিয়োনী বউ, সেও কিছু জানেনি, আমিও কিছু জানিনি, ও পদ্মো পিসী-ই-ই···

মদন বুঝতে পারে তার ডাক কোথাও গিয়ে পেঁছচ্ছে না। রাগে দুঃখে, বুকের ভিতরের আকুলি-বিকুলি আক্রোশে তার ইচ্ছে করে আরো দশ হাত লম্বা হয়ে উঠতে। দ্রুত চলা-হাঁটা-দৌড়ানোর জন্যে পাখির মত দুটো ডানা, নৌকোর মত ভাসবার ক্ষমতা পেতে ইচ্ছে করে। দুটো চাষাড়ে হাতের সমস্ত শক্তি নিয়ে টুঁটি টিপে ধরতে ইচ্ছে করে বজ্র-বিদ্যুতের। কোটি কোটি ফণা উঁচোনো বিষধর সাপের মত জলরাশিকে লাথি মেরে শায়েস্তা করতে ইচ্ছে করে। লাঠি পেটা করে ঝোড়ো হাওয়াকে পাকুড়দা গ্রামের ত্রিসীমানার বাইরে, আটবেল্লের মাঠ পর্যন্ত খেদিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বিকেলের পর থেকে মদন বুঝতে পেরে-গেছে, সে খুব ছোটো। সে ক্ষমতাহীন।

সেই দুপুর থেকে লড়াইয়ে নেমেছে মদন। একাই যেন দশটা সৈনিক। দশ দুগুণে কুড়িটা হাত যেন তার। বৃষ্টি নেমেছিল সকাল থেকেই। গুঁড়ি গুঁড়ি। আকাশটা রাখালের বাবা গোপাল সাঁতের ছানিপড়া চোখের মত ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল সকাল থেকেই। দমকা হাওয়ায় গাছপালা থর-থরিয়ে বেঁকে যাচ্ছিল সকাল থেকে। কিন্তু তখনো না মদনের, না অন্য কারো মহা-প্রলয়ের কথা মনে হয়নি। এখন যেমন চেঁচাচ্ছে এমনি করে কিংবা এখনকার চেয়ে অনেকটা কম জোরে চেঁচিয়ে কথা বলেছিল সে অন্যদের সঙ্গে।

—হ্যাঁগো সেজু জেঠা, মেঘের গতিক তো খুব খারাপ মনে হয় গো। মোদের ইদিকেও কি বান-টান হবে নাকি গো? অ্যাঁ!

বানের কথাটা ঠাট্টা করে বলেছিল মদন। মনে মনে বিশ্বাস করে বলেনি।

হাওয়ার গায়ে হাতীর জোর এল দুপুর থেকে। বৃষ্টির ফোঁটা মোটা, বর্শার ফলার মত ধারালো এবং বেগবান হল দুপুর থেকে। জল-ঝড়ের গোঁত্তা খেয়ে চোখের সামনে প্রথম আছড়ে পড়ল গোয়াল ঘরের দেওয়ালে। উল্টে পড়ে গেল ডোবার ধারের কলাবন। আম-জাম-তেঁতুলের পলকা ডালপালা আছড়ে পড়ল উঠোনে। তারপর ডোবার জল মিশে গেল মাঠ-ঘাটের জলের সঙ্গে। ভেসে গেল ঘাটের খেজুর গুঁড়ির সিঁড়ি। জল ছুটে এল উঠোনে। ছলাৎ ছলাৎ ছোবল মারল তুলসীমঞ্চের পায়ে। বাড়তে বাড়তে সেই জল বিকেলের মধ্যেই উঠোন ডুবিয়ে দাওয়া ডোবাল। দাওয়া ডুবিয়ে ঢুকে পড়ল রান্নাঘরে, ঢেঁকশালে। বিকেলের দিকেই উড়ে গেল রান্নাঘরের চাল। খড় ছিল সামান্য। তালপাতা ছিল বেশী। এক একটা জলে ভেজা ভারী তালপাতা যেন ঝড়ের মুখে ছেঁড়া ডানা ফড়িংয়ের। তারপরে উপড়ে ফেলল শোবার ঘরের অনেকখানি ছাউনি। চোখের সামনেই একটু একটু করে ঘর-বাড়ির চেহারাটা হয়ে উঠল জলে ভাসা কঙ্কাল, অল্প-স্বল্প মাংস জড়ানো।

মদন তখনও ছিল আঁটোসাঁটো। তখন বিশ্বাস ছিল মহা-প্রলয় হবে না। একটু পরেই সব থেমে যাবে। থেমে যাবে, কেননা সুভদ্রার প্রসব ব্যথা উঠেছে। তাদের সন্তান জন্মাবে। প্রথম দিকে বোকার মত, কৃপণের মত সে সব কিছুকেই বাঁচাতে চেয়েছিল। খুঁটিনাটি সব কিছু। ঝাঁটা থেকে, গুড়ের কলসী, সিকেয় ঝোলানো তেঁতুল, কুমড়ো, মাদুর-চাটাই, কাঁথা-কানি সব কিছু। একরত্তি একটা মানুষের এমন মরণ-পণ উদ্যম, হাড়মাসের এমন বেপরোয়া তেজ-দম্ভ দেখে উঠোনের জল হেসে উঠেছিল খলাৎ ছল ছল, খলাৎ ছল ছল। মদনের এই রগড়ের কান্ডকারকারখানা দেখবার জন্যে সাদা আগুন জ্বালিয়ে বিদ্যুৎ ছুটে এসেছিল তার ঢেঁকশালের, রান্নাঘরের কাছ বরাবর। রাগে দাঁত কড়কড় করে বজ্র হুমকি দিয়ে উঠেছিল আকাশেঃ কি বাঁচাবি, তুই, কি বাঁচাবি রে ছোঁড়া? কড়াৎ কড় কড় গুম গুম, কড়াৎ কড় কড় গুম গুম।

মদন তৎক্ষাণাৎ বুঝে নিয়েছিল, সব বাঁচানো যাবে না। গোইলের আঁটিবাঁধা খড় বাঁচাতে গিয়ে কুঁচনো খড় ভেসে গেল। খোলের বস্তা বাঁচাতে গিয়ে চিটে গুড়ের টিন ভেসে গেল। ঢেঁকশালের ধান-চাল বাঁচাতে গিয়ে খুদ-কুঁড়ো, শুকনো কাঠ-কাঠরা, সাঁড়া-জ্বলুনি ভেসে গেল। রান্নাঘরের হাঁড়ি-কুঁড়ি, হাতা-খুন্তি, বাসন-কোসন বাঁচাতে গিয়ে ঘটি-বাটি তৈজসপত্রের কৌটো-বাওটা, মালসা-গামলা ভেসে গেল।

—ও সেজু জেঠা, সেজু জেঠা গো-ও-ও, ও কার্ত্তিকের বউ, কার্ত্তিক রে-এ-এ, ও

পদ্দো পিসী-ই-ই, পদ্দো পিসী গো-ও-ও, ও নগেন কাকা-আ-আ, নগেন কাকা গো-ও-ও। খুব বিপোদে পড়েছি গো আমি। বউটার বেথা উঠেছে, ছেলে বিয়োবার বেথা। কী করতে হয় কিছুই জানিনি যে আমি। সাপে কামড়ানোর মত হালি হয়ে গেছে গো বউটা। আর বেথা দিতে পারতেছেনি। কাঁদতেছে, ছটকাচ্ছে। আমি পাগল হয়ে যাবো যে গো। আগো কেউ তমরা এসবেনি এগবার এই সময়। ও পদ্দো পিসী-ই-ই, ও শীতলা-দিদি-ই-ই, বুনো রে-এ-এ…

মদন ডাক পেড়ে চলেছিল গোয়ালঘরের সামনে ডাঁই করা ছাইগাদার উপর দাঁড়িয়ে। ছাই-গাদাটা ক্রমশ পায়ের তলা থেকে নেমে যাচ্ছে। জল ছোবলাচ্ছে। মদন জানে, একটু পরেই উঠোনের তুলসীমঞ্চটার মত এটাও গলে যাবে জলে। গলে মিশে যাবে জলের দশ রকম আবর্জনার সঙ্গে।

এখন সন্ধ্যে। এর আগেও অনেক সন্ধ্যে এসেছে পৃথিবীতে। অন্ধকার সন্ধ্যে। রাক্ষস-খোক্ষসের মুখোশ-পরা বড়-জলের সন্ধ্যে। কিন্তু আজকের সন্ধ্যেটা অন্য রকম। জলের গন্ধ, বাতাসের গন্ধ শুঁকে মদন বুঝে নিয়েছে। মদনের বাবা একবার গল্প করেছিল এক মহাপ্রলয়ের। ভয়াবহ দুঃখের গল্প। মানুষ কীভাবে সর্বস্বান্ত হয়েছিল, না খেয়ে, না আশ্রয় পেয়ে কুকুর-বেড়াল, গরু-বাছুর উপড়োনো গাছপালার সঙ্গে ভেসে গিয়েছিল কীভাবে, কীভাবে আকাশ ভরে গিয়েছিল শকুনের কালো ডানার কর্কশ উল্লাসে, সে কথা মদনের এখনো মনে আছে। কিন্তু মদনের কাছে সে সব পুরাণের কাহিনী, সীতার পাতাল প্রবেশ অথবা নল-দমন্তীর কিংবা হরিশচন্দ্রের দুঃখে মানুষ দুঃখ পায় ঠিকই, কিন্তু সে দুঃখটা বিছেয় কামড়ানোর মত কটকটে-দগদগে নয়। এক রকম ভালো লাগাও মিশে থাকে তার ভিতরে। চোখের সামনে ঘটা দুঃখ-কষ্টের বাস্তবতার যন্ত্রণা মানুষের কাছে শোনা কাহিনীর জ্বালা-যন্ত্রণার চেয়ে অনেক বেশী রূঢ়।

ধীরে ধীরে বৃষ্টির জল যত বেড়েছে, ততই কমে এসেছে মদনের সহ্যের ক্ষমতা। ধ্বংস অথবা সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে আর দুপুর কিংবা বিকেলবেলার মত জোয়ান-মদ্দ নয়। এখন, এই বিশ্বব্যাপী দক্ষযজ্ঞের মাঝখানে তার ধুকধুকে বুকের মধ্যে শুধু একটাই প্রার্থনা, সুভদ্রা এবং সুভদ্রার পেটের ভিতরকার শিশু-সন্তানের মঙ্গল।

—ও সেজ্ জেঠা-আ, সেজ্ জেঠা গো-ও। আগো ও পদ্দো পিসী-ই। ও নলি দিদি-ই। ও বুনো বুনো রে-এ। খুব বিপোদ পড়ে ডাকতেছি গো-ও; ছেলে হবার বেথা উঠেছে গো সুভদ্রার। এগবার এসেবেনি কেউ? কী কাতরাচ্ছে, কাঁদতেছে দেখে যাও না গো এগবার। আগো, তমরা কী কেউ বাড়িতে নেই থালে শুনতে পাচ্ছনি কেন? আর ই শালার রাবণের পেচ্ছাপ ঝরছে তো

ঝরার আর শেষ নেই। ভগোমানের চোখেও ছানি পড়েছে বোধ হয়। দেখতে পাচ্ছেনি ধরাতলের অবস্থাটা।

এই সময় মদনের মনে হল, কে যেন তাকে ডাকছে। সুভদ্রার মতই খিনখিনে গলায় চেরা ডাক। কি হল? আবার সাপ উঠল নাকি বিছানায়? বিকেল বেলায় একটা উঠেছিল। তবে জাত সাপ নয়। তাছাড়া দুর্যোগের সাপ কামড়ায় না। তবু দরজার খিল দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে থেঁতলে মেরেছিল সে। একটু বাদে একটা ছেলে হবে। আশপাশে সাপ থাকাটা ভাল হয়, এই বুঝে। সুভদ্রার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হল নাকি তাদের প্রথম সন্তান? তাহলে কান্না কই? নাকি কাঁদতে ভুলে গেছে, প্রকৃতির রকম-সকম দেখে? লম্বা পা দুটোকে বকের ঠ্যাংয়ের মত বারবার উঁচু করে, ছবাক-ছবাক শব্দে জল ঠেলে মদন গোয়ালের দিক থেকে ঘরে আসছিল। উঠোনের মাঝখানে এসে মদন বুঝতে পারে জল আরো বেড়েছে। হাঁটু ছাপিয়ে গেছে। মদন তার কোমরে গোটানো কাপড়টাকে আরও গুটিয়ে নেয়। এবং অল্প একটু এগোতেই ধাক্কা খায় একটা শক্ত কাঠের সঙ্গে। খটাৎ করে লাগে ডান পায়ের হাড়ে। যন্ত্রণায় কাতরে ওঠে সে। এই সময়ে চোখ-ঝলসানো আলোয় সে দেখতে পায় ধাক্কা-লাগায় জিনিসটা কি। ঢেঁকী। ঢেঁকশাল থেকে ভেসে এসেছে ঢেঁকীটা?

ভাগ্যিস ধান-চালের বস্তাগুলো সরিয়ে নিয়েছিল বিকেল-বিকেল। তখুনি ঢেঁকিটাকে জল থেকে তোলার দরকার ছিল। কিন্তু মদন তুলল না। সুভদ্রা কোঁকাচ্ছে না। আর কোনো শব্দ আসছে না তার ঘর থেকে। তাহলে নিশ্চয়ই ছেলে বিইয়েছে। ছেলে বিইয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি? একটা লাল রক্তমাখা সদ্যজাত শিশুকে দেখার আগ্রহ ঢেঁকীর পাড়ের মত ওঠা-নামা করছিল তার বুক। ব্যাঙের মত কয়েকটা লম্বা লাফ দিয়ে সে শোবার ঘরের জলরাশির ভিতরে এসে দাঁড়ায়।

—বউ!

শোবার ঘরের তক্তাপোশ এবং তক্তাপোশের উপবের সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে নিমেষে চুপসে যায় তার আগ্রহ-উদ্দীপনা।

—ডাকতেছিলি বউ?

সুভদ্রা একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে তক্তাপোশের উপরে বসে। বসা এবং শোয়া দুইই বলা যায় তাকে। মাথাটা চৌকীতে ঠেকানো। হাত দুটো ঠাকুর-থানে হত্যে দেওয়ার ভঙ্গীতে ছড়ানো। মুঠো পাকানো হাত। হাঁটু দুটো মোড়া। পাছাটা উঁচু। হাঁড়ির মত নীচে ঝুলে আছে তলপেট। ঝুলে আছে দুধে ভরা ফোলা বেগুনের মত দুটো স্তন। যৎসামান্য আলোয় সুভদ্রার উপুড়-হওয়া চেহারাটা যেন কোনো আদিম জন্তুর নাড়ি-ভুঁড়ির মত দলা পাকানো। যেন আধ-উলঙ্গ। বস্ত্র সম্বন্ধে কোন সচেতন বোধ নেই তার। এখন আর আগের মত জোরালো

কাতরানি নেই। কিন্তু চাপা কোঁকানি আছে। চৌকিতে শুধু সুভদ্রা নেই। ওদের অর্ধেকটা সংসার উঠে এসেছে চৌকীতে। ভাতের হাঁড়ি থেকে ধান-চালের বস্তা, কাপড়-চোপড়ের পুঁটলি-পাঁটলা, বাসন-কোসন সব। সংসার-ময় জলরাশির ভিতরে এই তক্তাপোশটুকুই যা নিরাপদ দ্বীপ।

—ডাকতেছিলু বউ ?

সুভদ্রা সাড়া দেয় না। শুধু তাকায়। সুভদ্রা এখন যেন আঁশ-ছাড়ানো মাছ। তার ফ্যাকাশে-পাশুটে মুখে চোখ দুটোই শুধু লাল। কেঁদে কেঁদে। অন্ধকারে, তেলহীন হ্যারিকেনের মরা আলোয় সুভদ্রাকে মনে হচ্ছে যেন ঠ্যাং উঁচুকরা প্রকাণ্ড একটা মাকড়সার মত। মদনের ভয় করে। কিংবা মদনকে ভয় পাইয়ে দেয় সুভদ্রার বিকট জান্তব চেহারাটা। তবু গলায় যথার্থ স্বামীর মত স্নেহ-ভালবাসা ফুটিয়ে কথা বলে সে।

—মোর মনে হল, তুই ডাকতেছু। তাই ছুটে এনু। এখনো খালে হলনি ? কি হবে বউ ? অ্যাঁ! উদিকে তো ডেকে ডেকে ফেনা উঠে এল মুখে, কারুর সাড়া পেনুনি। মোর ডাক কেউ শুনতে পাচ্ছেনি না সবাই চলে গেল ঘর-বাড়ি ছেড়ে, কিছু তো হদিশ পাচ্ছিনি। সব যেন কেমন হয়ে আসতেছে। বড় ভয় করতেছে বউ। তাড়াতাড়ি বেথা দে। বেথা উঠলে ভয় পেয়ে হজম করে ফেলিসনি যেন। ছেলেটা হয়ে যাক। বড় কষ্ট পাচ্ছু বউ। তোরও বরাত মন্দ। মোরও পোড়া কপাল। নইলে এমন দুর্যোগের দিনে বেথা উঠে ?

এই সময় বাজ পড়ে। সারাদিনের হাজারটা বাজের চেয়ে সবচেয়ে ভয়ংকর বাজ। যেন ফাটিয়ে চৌচির করে দেবে পৃথিবীটাকে। বিদ্যুতের ঝলসানিও তেমনি। যেন আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত একটা শান দেওয়া আলোর কাতান। বজ্র যা ভাঙবে সেটাকেই কুচি-কুচি করবে কেটে। আলোর ঝাঁঝে তার চোখের সামনে থেকে সুভদ্রার শরীরটা মুছে গেল ম্যাজিকের মত, এক পলকের জন্যে। সুভদ্রার বদলে সুভদ্রার একটা সাদা ধপধপে আদল। ভয় পেয়ে সুভদ্রাও কেঁদে উঠল ডাক ছেড়ে।

—আমি আর বাঁচব নি গো! মা গো-ও-ও, আমাকে বাঁচাও গো মা-আ-আ।

—কি হয়েছে বউ ?

—পেটের মধ্যে ছেলেটা ছটকাচ্ছে। ভয় পেয়েছে গো। আমি আর ছেলে বিয়োতে পারব নি গো। মা গো-ও-ও-ও।

—অত ভেঙে পড়িস নি বউ। সব ঠিক হয়ে যাবে। ভগমানকে ডাক। মা কালীকে ডাক। যত জোরে পার বেথা দে বউ।

মদনের এই সময় একটা বিড়ি খেতে ইচ্ছে করে। একটা বিড়ি খেলে শরীরটা একটু তাপ পাবে, গায়ের শীত কমবে। কিন্তু সে মনে করতে পারে না, দেশলাই

আর বিড়ি কোথায় রেখেছে। সন্ধের সময় হ্যারিকেন জ্বালিয়েছিল সে। অনেক কষ্টে হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে জানলায় ভিজে তালপাতার আড়াল দিয়ে রেখেছিল। কেরোসিন ছিল না বেশী। জ্বলতে জ্বলতে সেটা এখন নিবে আসার মুখে। তারপরই দেশলাইকে বাঁচানোর কথা মনে পড়েছিল তার। খুব সাবধানে কোথাও লুকিয়েছিল। কিন্তু কোথায়?

—দিশলাইটা কোথাকে রাখনু বলতো নুকিয়ে। দেখেছু বউ? ইস্ শ্যালা, পায়ে কি লাগল? সাপ!

—সাপ?

আর্তনাদ করে উঠল সুভদ্রা।

—না, সাপ নয়। মাছ। বেশ বড় মাছ। ন্যাজের ঝাপটা দিয়ে গেল পায়ে। বিড়িটা আর দিশলাইটা কোথাকে রাখনু বল দিক্‌নি। হাওয়ায় উড়ে গেল নাকি?

সুভদ্রা তাকিয়েছিল মদনের দিকে। হালকা আলোর বিদ্যুৎ চমকাল কয়েকবার। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে মদন কাপড়ের পুঁটলিটা হাতড়াচ্ছিল ঘরের কোণে। সমস্ত জামা কাপড়কে মাদুর চাটাই মুড়ে দড়ি বেঁধে একটা জায়গায় রাখা হয়েছে। তার উপরে থলে চাপানো। অনেকগুলো থলে ছিল বলে অনেকটা সুরাহা হয়েছে তাদের। সুভদ্রার গায়ে জলের ছিটে লেগেছে। কিন্তু ভেজেনি। ভিজলেও শুধু তার ডান দিকটা।

—ওগো, অত রক্ত কেন?

সুভদ্রার চীৎকারে মদন বেঁকে দাঁড়ায়। সে ভেবেছে সুভদ্রার কথা।

—কই? কোথা?

—তোমার কোমরে? কিসে কাটলে গো?

—রক্ত?

মদন দুমড়ে বেঁকে নিজের কোমরের দিকে তাকায়। প্রথমটা হতচকিত হলেও পরে বুঝতে পারে, জোঁক। কোমর থেকে প্রাণপণ টানেও জোঁকটাকে ছাড়াতে হিমসিম খেয়ে যায় সে।

নুন নেই, ই শালাকে কি করে মারি বলতো?

শেষ পর্যন্ত মাথায় বুদ্ধি এসে যায় তার। দু'আঙুলে সাঁড়াশীর মত চেপে ধরা জোঁকটাকে ছেড়ে দেয় দেওয়ালে। তারপর কাটারী দিয়ে কুপোয়। রক্তের ফিনকি ছিটকে এসে লাগে মদনের মুখে। মুখের রক্ত, কোমরের রক্ত ধুয়ে নিতে মদনকে এক পাও হাঁটতে হয় না। একটু কুঁজো হতে হয় কেবল। হাঁটুর নীচেই পুকুর।

এই সময় হঠাৎ মনে পড়ে যায় বিড়ির কথা। বিড়ি আর দেশলাই সে লুকিয়ে রেখেছে কুলুঙ্গীতে। লক্ষ্মীঠাকুরের পিছনে। বিড়ি পেয়ে গিয়ে মদনের মনে

বেশ শান্তি ফিরে আসে। বিড়ির আগুনে হাড়-মাসের শীত জুড়োয় খানিকটা। সুভদ্রা একটানা কোঁৎ পেড়ে চলেছে। হঠাৎ সে ডুকরে ওঠে।

—উ কিসের শব্দ হচ্ছে গো?

—কই।

—ঐ যে। কেমন যেন শব্দ।

—গরুটা হামলাচ্ছে।

—না গো, সে শব্দ নয়। ই যে অন্যরকম শব্দ।

—দাঁড়া দেখি।

বিড়িতে শেষ টান দিয়ে মদন উঠোনে নেমে আসে জল ভেদ করে। হ্যাঁ, শব্দ হচ্ছে। অন্যরকম শব্দ। শাঁখ বাজছে। একসঙ্গে একশ জোড়া শাঁখ বাজার মত শব্দ। আর সেই সঙ্গে মানুষের কোলাহল। শিউলি পাড়ার খালের দিক থেকেই আসছে যেন শব্দটা। বাঁধ ডাঙল নাকি? তাহলে তো ঘর-বাড়ি সব ভেসে যাবে। খালের বাঁধ ভাঙলে নদী হয়ে যাবে চরাচর।

মদনের শরীরে আবার শীত গেঁথে বসে। বুকের মধ্যে কাঁপুনি জাগে মেঘ ডাকার মতো গুরুগুরিয়ে। কণ্ঠনালীর কাছে উঠে এসে দলা পাকায় একটা অসহায় ব্যথা, নিরুপায় ক্রোধ। মদনের মনে হয় আর সে হাঁটতে পারবে না জল ঠেলে। প্রথমত তার পায়ের গোছে গোছে যন্ত্রণা। দ্বিতীয়ত বিরাট একটা কচুরি পানার ঝাঁক জলের উপরে শক্ত দেয়াল খাড়া করে রেখেছে। এখন চোখে না দেখেও মদন বলে দিতে পারে, এই কচুরিপানার তলায় যে জল, তার রঙ লাল। দামোদর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। বানের জল ঢুকেছে তাদের গ্রামে। মদন বুঝতে পারে না কি করবে? সুভদ্রাকে অনেক কথাই জানায়নি সে। পাছে ভয় পেয়ে ছেলে-বিয়োনোর ব্যথাটা সটকে যায় তার। কিন্তু আর কী দেরী করা উচিত? এর পর জল যদি বুক সমান হয়ে যায়। গোয়াল ঘরের দেয়ালের মত ঘর-বাড়ি যদি ভেঙে পড়ে। প্রাণে বাঁচতে হলে এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে।

মদন জল ঠেলে আগে চলে গেল গোয়াল ঘরের দিকে। তার একটাই গরু। বাছুর ছিল মরে গেছে। সন্ধ্যে থেকে তারস্বরে হামলে চলেছে গরুটা। সেও বুঝে গেছে এতক্ষণে, পৃথিবী জুড়ে একটা ষড়যন্ত্র চলেছে ধ্বংসের। মদন মঙ্গলার গলা থেকে দড়ির বাঁধনটা খুলে দেয়। গরুর কপালে হাত ছুঁইয়ে প্রণামের মত ভঙ্গী করে। তারপর বলে—

—যা চলে যা মঙ্গলা, যেদিকে পারু চলে যা। ইখেনে থাকলে এখুনি দেয়াল চাপা পড়ে মরবি। আর তোকে রাখতে পারলুম নি মা। রাগ করিস নি। যা চলে যা।

মদনের গরু মদনের সব কথা শোনে। বোঝে। আজ বুঝল না। অন্ধকারেও মদন বুঝতে পারল, মঙ্গলার চোখে অভিমান এবং অশ্রু। মদনের বুকের কাছে

মুখটা এনে কানের ঝাপটা দিয়ে, মুখে গম্ভীর বেদনার্ত গলায় গাঁও, গাঁও শব্দ করে সে যেন বলতে চাইল, আমি যাব না।

মদন কপট রাগের ভঙ্গী করে।

—যাবি নি তো মরবি নাকি? দেখতে পাচ্ছুনি কী দশা হয়েছে দশদিকের। মোদের সব ভেসে গেছে। যেটুকু এখনো জাগা, সেও ডুবে যাবে। আমরাও চলে যাব মঙ্গলা। তোর মাকে বাঁচাতে হবে তো। তার বেথা উঠেছে। বুঝলি। আমরাও তো চলে যাব এখুনি। যা। মঙ্গলা! সোনা মা আমার। য্যাঃ। হ্যাট! হ্যাট! এই নড়, নড় রে। হ্যাট, হ্যাট—

মঙ্গলাকে এক পাও নড়াতে পারে না মদন। তখন মারতে থাকে। গায়ের জোরে মোচড় দেয় ল্যাজে।

—এবার তোকে লাঠি পেটা করে তাড়াব থালে। ভাল কথা বলছি, কানে যাচ্ছে না যখন। না যাস তো মর এখানে। আমি চলনু। অত সময় নেই আমার তোকে খোসামোদ করার। মরার সাধ জেগেছে মর। আমি চলি। মোদের তো বাঁচতে হবে।

ঠিক তখুনি অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ কানে আসে মদনের। গমগমে শব্দ। বোমা পড়ার শব্দের মত। পর পর অনেকগুলো। মদন ছিটকে বেরিয়ে আসে গোয়াল ঘরের বাইরে। মদনের পিছনে বেরিয়ে আসে মঙ্গলা।

—কিসের শব্দ হল? অ্যাঁ?

কাকে প্রশ্ন করল মদন? আকাশ, বাতাস, জল না বজ্র-বিদ্যুৎকে? কে উত্তর দেবে? কেউ উত্তর দেবে না জেনেও মদন হাঁক পাড়ে।

—সেজ্ জেঠা-আ, কি হল গো? কিসের অমন শব্দ? কি ভাঙল? ও পদ্দো পিসী-ই-ই, শৈল দিদি-ই-ই, তমরা বেঁচে আছ না মরে গেছ সব? আমরা এখুনি বেরি পড়তেছি গো। বউটাকে নিয়ে কি করব বুঝতে পারতেছিনি। না বেরি পড়লে আর বাঁচবনি কেউ। আগে তো প্রাণে বাঁচিই-ই-ই...

মদনের কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলা আর্তনাদের মত হাম্বা হাম্বা-আ করে কয়েকবার ডেকে ওঠে। আর তারই সঙ্গে গর্জন করে ওঠে বজ্র। আকাশ যেন অদ্ভুত কোন হাসির দৃশ্য দেখে ফেটে পড়তে চাইছে অট্টহাসিতে। দশদিকে আকাশের দশটা দাঁতের মত ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। জলের ভিতরেও যেন একটা হাসির শব্দ। বাতাসের ভিতরেও।

মাথাটা গরম হয়ে যায় মদনের। তার দুর্বল, ভিজে-ভিজে, শীত-শীত শরীরের ভিতরে হাঁড়ির ফুটন্ত ভাতের মত টগবগ করে ওঠে একটা তিতি-বিরক্ত মনোভাব। তার ভিতরেও যেন গর্জন করে ওঠার জন্যে তৈরী হতে থাকে এক ধরনের বজ্র। ক্যালেন্ডারের বিশ্বামিত্রের মত সে হঠাৎ আকাশের দিকে তুলে ধরে তার তর্জনী।

—তোর ইয়ে করি, শালার বৃষ্টি। দয়া-মায়া সব ভেসে গেছে বুঝি মন থিকেন।
তাই গরীবদের ঘর ভাসাতে এসেছু ? ঘর ভাসিয়ে কি পাবি ? খাই তো খুদ—কুঁড়ো। পেটে যদি পুয়োতী মেয়েদের মত নোলা চাগরে উঠে তো যানা হাজরাদের বাড়ি আছে। তিনতলা বাড়ী আছে, ফিরিজ আছে। গুদোম ঘর আছে। ধানের গোলা আছে। সব পাবি শিখেনে। যা না, সেখানে যা।

সে বিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে নামায় তার তর্জনী।

—খুম লম্পো-ঝম্পো দেখানো হচ্ছে ? জোষ্টি-আষাঢ় মাসে যখন জল জল করে চেঁচিয়েছিনু, তখন মোদের ডাক কানে যায়নি ? এখন বেরিয়ে এসেছো সব গিলতে ? মাঠের ধান গিলে খেয়েছো তো ? ক্ষেত-খামার পেটে পুরে এখন গ্রামের ঘর বাড়ি, গাছপালা, গরু-বাছুর সব খাও। মনের সুখে খাও। খেয়ে ওদের ওলাউঠা হোক। কলেরা হোক। জিভ পচে যাক। কুষ্ঠো পড়ুক সারা গায়ে।

সে আবার তর্জনী তোলে আকাশের দিকে। কিছু বলতে গিয়ে থমকে যায়। নিজের ভাষায় আর্তনাদ এবং কান্নাকাটি করতে করতে মঙ্গলা চলে যাচ্ছে দূরে। মদনেরও আর্তনাদ এবং কাঁদতে ইচ্ছে করে। জল বড় নরম। পায়ের তলার জলটা শক্ত পাথর হলে, সে মাথা কুটতো।

মদন এই মুহূর্তে মাথা কোটার বদলে শরীরে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। আকাশের বজ্র-বিদ্যুতের দিকে মুখ করে চীৎকার করে ওঠে।

—খচ্চরের আঁদি হল এই দুটো হাড়-হারামজাদা। আকাশে বসে খুব লম্বাকি মেরে হাসি-ঠাট্টা হচ্ছে। সবাইকে খেপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ধরাতলকে রসাতলে পাঠাতে। পৃথিবী রসাতলে গেলে তোদের বুঝি খুব আনন্দো ? মুখে মুতে দিই অমন আনন্দের। হাগতেও ঘেন্না করে তোদের মুখে।

হাগা এবং মোতা দুটোই পেয়েছিল দুপুর থেকে। সময় ফুরসৎ পায়নি মদন। পেটটা টাটিয়ে ছিল এতক্ষণ। নিজের হাগা মোতার চেয়ে সংসারটাকে, সুভদ্রাকে বাঁচানোর ব্যথাটাকে অনেক বড় মনে করেছিল বলেই ভুলে থাকতে পেরেছিল তলপেটের টনটনানি।

দুপুর আর বিকেলের মাঝখানে ঝড়ে যখন শোবার ঘরের চালটা ওলোট-পালোট হয়ে গেল তখন সুভদ্রার কাছেও ছেলে হওয়ার ব্যথার চেয়ে সংসারটাকে বাঁচানোর ব্যথা বড় হয়ে উঠেছিল। হাঁউ-মাঁউ করে কেঁদে উঠেছিল সে।

—কী সব্বোনাশ হল গো। শুবার ঘরে জল ঢুকতেছে যে। তুমি একা সব সামলাতে পারবেনি। আমি যাই।

মদন বজ্রের মত দাবড়ানি দিয়েছিল সুভদ্রাকে।

কি এমন লাখোপতির সংসার যে একা সামলাতে পারবেনি শুনি ? তুই যেখানে

আছু, সেইখানে চুপ করে বসে থাক। বেথা দিয়ে যা। জোরে জোরে বেথা দিয়ে যা। এখনও দিনমান আছে। ছেলেটা হয়ে যাক। এখন এই জলঝড়ে চলতে-ফিরতে গিয়ে নিজে মরে পেটের ছেলেটাকেও মারবি নাকি?

সুভদ্রা মেয়েমানুষ। সংসারের ধুলোটুকুর উপরও তার মায়া। সে শোবার ঘর থেকেই চিনচিনে গলায় চেঁচাতে থাকে।

—আগো রান্নাঘরে একটা হাঁড়িতে ভাত আছে। কড়ায় চচ্চড়ি আছে। তুলে আগো, কোথাকে গেলে, ইদিকে এসো না। সব কাপড় পুঁটলি বেঁধে ফেললে নাকি? বেশ মানুষ বটে। ছেলে বিয়োবার জন্য কাপড় লাগবেনি বুঝি? তিনখানা ছেঁড়া শাড়ি আলাদা করে রেখেছিনু। সব মিশি ফেল্লে বুঝি? এই জন্যেই বলি, আমি এগবার উঠি। ঢেঁকশালের মাটির গামলা চাপা দেবা ছিল এক কলসী খুদ। তুলেছ তো, নাকি ভেসে গেল? পেয়েছ? ওরই পাশে দুটো হাঁড়ি দেখতে পেয়েছ একটাতে তেঁতুল আছে। আরেকটাতে তেঁতুল বিচি। এক গোছা ঝাঁটার কাঠি রেখেছিনু যে গো। শিকের কুমড়োয় হাত দিতে হবেনি। উ সব যেমন ঝুলছে ঝুলুক। দুটো শিকে খালি আছে। তুমি বরং দুটো চালের হাঁড়ি ঝুলিয়ে দাও। হায় গো। চিঁড়ে ছিল এক কলসী। দেখতে পেয়েছ? রান্নাঘরে একটা পিতলের বড় ঘটি দেখতে পাবে। উটা শৈল দিদির। কাল বিকেলে গুড় পাঠিছিল। ফিরত দেবা হয়নি। উটা আলাদা করে সরি রাখো। পরের জিনিস। একটা চুপড়িতে দুটো বেগুন, কাঁচালংকা আর পিঁয়াজ ছিল, দেখতে পেলে? ওগো শুনছো, এইবার ইদিক পানে এসো বলতেছি, রান্নাঘরের উপরের তাঁকে ছোটো কাঁসার গেলাসে আধগেলাস দুধ আছে, খেয়ে নাও দিকনি। আর শোনো—

মদন সব কথা শোনেনি। আসলে ঘরের মধ্যে আছে বলেই সুভদ্রা বুঝতে পারেনি তখনো, পৃথিবীর বাইরের চেহারাটা কী রকম ভয়ংকর। সুভদ্রার হিসেব মত কাজ করতে গেলে দুটো বেগুন আর তিন ছটাক কাঁচালংকা বাঁচাতে গিয়ে ভাসিয়ে দিতে হয় ধান-চালের বস্তা, খড়ের গাদা, গুড়ের কলসী, ডালের টিন।

যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেইখানেই হাগা-মোতাটা সেরে নেয় মদন। শরীরটাকে সুস্থ লাগে বেশ। এই সময় আবার সেই গমগমানি শব্দটা কানে আসে। কানে আসে মঙ্গলার দূর থেকে ভেসে আসা আর্তনাদ। কানে আসে দূর-দূরান্তরের কোলাহল। কোনো শব্দই তেমন ধারালো নয়। জলে ভেজা, মিয়োনা অথচ প্রতিধ্বনিময়।

জলে উপুড় হয়ে যাওয়া উচিচংড়ের মত ছটফট করে ওঠে মদনের আত্মা ও শরীর। জল এখন কোমর ছাপিয়ে বুকের নীচে। জলের উপরটা কচুরিপানা আর নানান

রকম ভাসা জিনিসে ভরে গেছে। জলের পাঁচিল ঠেলে ধুড়-লাফ দিতে দিতে মদন এসে ঢোকে তার শোবার ঘরে।

—বউ! উঠে পড়। আর বেথা দিসনি। বেথা সব গিলে ফ্যাল। হজোম করে নে। আর থাকা চলবে নি। দুড়ুম দুড়ুম করে বাড়ি ধসে পড়তেছে। ইবার পালাতে হবে বউ। আর দেরী করলে বাড়ি চাপা পড়ে মরতে হবে!

কখন যেন সুভদ্রার খোঁপা ভেঙে গেছে। উড়ো চুল নয়, জলে ভেজা গুছি গুছি চুলকে অন্ধকারে মনে হয় যেন ছোটো ছোটো ঢোঁড়া সাপ। কখন যেন শোবার ঘরের আরও অনেকটা খড়ের চাল খামচা মেরে খেয়ে নিয়েছে ঝোড়ো হাওয়া। সুভদ্রার সর্বাঙ্গ ভিজে। এখনও ভিজছে। যদিও বৃষ্টির ঝাপটা আগের চেয়ে একটু কম। মদনের কথা শুনে চৌকিতে লেপটানো সুভদ্রার ভিজে শরীরটা সাপের ফণার মত উঁচু হয়ে ওঠে।

—কি বরে বললে কথাটা? এই দুর্জ্যোগে কোথাকে যাব আমি। কী করে যাব? মোকে মারতে চাও নাকি?

—তোকে এতক্ষণ বলিনি বউ। তুই ভয় পাবি বলে বলিনি। যদি বিয়োনটা হয়ে যায় এর মধ্যে, তাই বলিনি। দামুদর ফুলে উঠেছেন। শিউলীপাড়ার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে বউ। জলের রঙ জোবা ফুলের মত লাল। বানের জল আসতেছে যেন শাঁখ বাজিয়ে। উঠোন ভরে গেছে কচুরিপানায়। কথা বলে দেরী করিসনি বউ। উঠে পড়। মঙ্গলাকেও জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি।

অ্যাঁ মঙ্গলাকে জলে ভাসিয়ে দিলে? তুমি কী মানুষ না পাষাণ? হায়! হায়! সে যে মরে যাবে গো!

—আমরাও মরে যাব বউ। তোর পায়ে পড়ি, উঠে দাঁড়া। ইখেনে বসে থাকলে, তুই বাঁচবিনি। আমিও বাঁচবোনি। মোদের ছেলেকেও বাঁচানো যাবেনি। আর খানিক বাদেই এই চৌকি ভাসতে থাকবে জলে। মোরা ছাড়া গেরামে আর কেউ নেই। সোবাই চলে গেছে। থাকলে, অত যে চেল্লাচেল্লি করনু, কেউ না কেউ সাড়া দিত। আর দেরী করিস নি বউ। উঠে বোস।

সুভদ্রা হাঁউ-মাঁউ করে কেঁদে ওঠে।

—ঘর সংসার ফেলে কোথাকে যাব আমি? কী করে যাব গো-ও? কী করে বাঁচাবো গো পেটের ছেলেটাকে।

—সব ঠিক হয়ে যাবে বউ। ভগমানকে ডাক। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোর পাশে জানলায় থলে চাপা দিয়ে রেখেছি সকালবেলার বাসি ভাত। আর চচ্চড়ি। পারু তো এক মুঠো খেয়ে নে। এর পর আর কখন খেতে পাবি ঠিক নেই। সংসারের কথা ভুলে যা বউ। যা যাবার যাবে। আগে তো পেরানে বাঁচি। তারপর ঘর সংসার।

—কী করে যাব আমি এত জল ঠেলে ? না। আমি যেতে পারবনি। দেয়াল চাপা পড়ে এইখেনেই মরে থাকবো। আমি কিছুতে যেতে পারবনি। মোর মরণ হবে আমি জানতুম গো-ও-ও।

যেন সামনে কারো মৃতদেহ, এমনিভাবে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকে সুভদ্রা। মদনের মাথায় রাগ চড়তে থাকে। ইচ্ছে করে ভিজে চুলের মুঠিটাকে ধরে টেনে নামায় সুভদ্রাকে। এমন অবুঝ মেয়েমানুষের ঐ রকমই শাস্তি। কিন্তু যেহেতু তার পেটে তাদের ভাবী বংশধর, মদন তাই রাগটাকে সামলে নেয়। চিতাবাঘের চোখের মত কেবল তার চোখ দুটো জ্বলতে থাকে অন্ধকারে।

—তুই বড় ছেলেমানুষি করতেছিস বউ। নিজে মরতে চাউ, মরবি। তা বলে পেটের ছেলেটাকে বাঁচাবার কথা ভাবিবনি ? দেয়াল চাপা পড়ে তুই মরলে, তোর পেটের ছেলেটা মরবে নি ?

সুভদ্রার কান্না যুক্তি মানে না। সে হঠাৎ উঠে বসে, কাঁদতে কাঁদতেই।

—তবে মোকে নিয়ে চল মোর মায়ের কাছে।

—তোর মায়ের কাছে ?

—হ্যাঁ ! আমি মা বাপের কাছে গিয়ে মরবো।

—তোর কী মাথা খারাপ হল নাকি বউ ? অ্যাঁ ! পিথিবী জুড়ে প্রোলয় চলেছে। দেশ-গাঁ-চরাচর ডুবে গেছে জলের তলায়। এখন যাবি তুই মায়ের কাছে ? তোর বাপের বাড়ি কী ইখেনে ? যে দু-দশ পা হাঁটলেই পৌঁছে গেনু ?

—থালে কার কাছে যাব ? এই জলে-ঝড়ে কে আশ্রয় দিবে মোদের ?

চিরকালের বৈরাগী মদন, সকাল থেকে উন্মত্ত প্রকৃতির হাতে মার খেয়ে খেয়ে দড়কচা মেরে যাওয়া মদনের ভিতরে লাফ দিয়ে ওঠে গরগরে চিতাবাঘটা।

—ফের কথা কইবি তো নুড়ো জ্বালিয়ে দুবো তোর মুখে, হারামজাদি। নিজে মরে, সংসারটাকে মারবে। দেখতে পাচ্ছিস, কী অবোস্থা চারিদিকের, নরক হয়ে উঠেছে দশ দিক, আর সেই সোময়ে কার কাছে যাবো, কে খেতে দিবে, কে বসতে দিবে, কে শুতে দিবে, তুই মাগীর কী বারোটা ভাতার আছে নাকি যে ভাত রেঁধে বিছানা সাজিয়ে লোক বসে থাকবে দুর্যোগের দিনে ? প্রাণে বাঁচাটাই বলে কত বড় কথা। ঘর থেকে বেরোলে আশ্রয় ঠিক জুটবেই। না জোটে গাছতলা আছে, গাছের ডাল আছে। গাছে উঠে বাঁচবো।

মদন হাঁপাতে থাকে। হাঁপানোর সময় পেটটা ঢুকে যায় ভিতর দিকে। মদনের গনগনে রাগের বহর দেখে সুভদ্রা ভয় পায়। তার চোখ পড়ে মদনের পেটের দিকে। মনের মধ্যে মায়া জাগে তার। মনে পড়ে সেই কোন সকালে দু'মুঠো ভাত খেয়ে সারাটা দিন লড়াই করছে মানুষটা।

সুভদ্রা উঠে বসেই এগিয়ে যায় জানলার কাছে। চটের আচ্ছাদন খুলে বার করে ভাতের হাঁড়ি।

— চচ্চড়িটা কোথা রেখেছে ?
—ওরই মধ্যে আছে ?
—থালে ইখেনে এসো। খেয়ে নাও।
সুভদ্রা চার-পাঁচ মুঠো ভাত আর শাক-ডাঁটার চচ্চড়ির খানিকটা এগিয়ে দেয় মদনের দিকে।
—তোর কই ? তুই আরো এক মুঠো ভাত নে। মোর না খেলেও চলবে। যুঝতে পারব। তোর পেটে আরেকজনা রয়েছে।
—আছে গো আছে তুমি খাও তো।
মদন চৌকির উপরে উঠে বসে। দুজনে মিলে ভাত ও চচ্চড়ি খায়। মদন খায় হাঁড়ির সরায়। সুভদ্রা হাঁড়িতেই হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে। খাওয়ার পর ভাতের হাঁড়ি এবং সরা দুটোই ভাসিয়ে দেয় জলে।
মিনিট দশেক পরে শুরু হয় তাদের অভিযান।

মদন জলের উপরে উপুড় করে দিয়েছে চৌকিটাকে। পায়াগুলো জলের উপরে। জলে-ভাসা মরা আরশোলার ঠ্যাংয়ের মত। তার উপরে, ঠিক মাঝখানে সুভদ্রা। সুভদ্রার চারপাশে তাদের ছিন্নভিন্ন সংসারের যৎসামান্য জিনসপত্র। সুভদ্রা বসেছিল তার সামনে রাখা চালের বস্তাকে ধরে। চালের বস্তার পাশে মাদুর চাটাই মোড়া কাপড়ের পুঁটলিটা। সুভদ্রার কোলের উপরে গোটা তিনেক দলা পাকানো ছেঁড়া শাড়ি। যদি যেতে যেতেই বিইয়ে ফেলে সে, তারই সতর্কতা হিসেবে। আর অল্প কিছু বাসন-কোসন। এর বেশী কিছু নিতে সাহস পায়নি। চৌকি ডুবে যেতে পারে।

সমুদ্রে কাঁদিলে সমুদ্রের জল বাড়ে না। সুভদ্রা লুকিয়ে কেঁদে চলেছে। এ রকম জলরাশি এবং দুর্যোগ সে জীবনে দেখেনি। অবশ্য জীবনটাও তার বেশী দিনের নয়। বিয়ের দু বছর পরে মা হতে যাচ্ছে বলেই তাকে বয়স্কা বলা যায় না। জীবনের অভিজ্ঞতায় সে এখনো কাঁচা ডাঁসা। তার দুঃখ ফেলে আসা সংসারের জন্যে। বিপন্ন স্বামীর জন্যে। এবং গ্রামান্তরের মা-বাবার জন্যে। আজ সকালে প্রথম যখন মোচড় দিয়ে উঠল পেটের ভিতরটা, সুভদ্রা যখন প্রথম বুঝতে পারল পেটের শিশুটা তিড়িং বিড়িং করছে বাইরে বেরোবার জন্য, তখনও কত সুখের ছবি এঁকেছিল সে মনে মনে। ছেলে হলে শাঁখ বাজবে। দাই আসবে। পাড়া-পড়শীদের ভিড়ে, তাদের হাসি মুখে, তাদের রঙ্গ-রসিকতায় সুভদ্রা ভুলে যাবে তার শরীরের নাড়ী-ছেঁড়া দুঃখ। খবর ছুটে যাবে তার মা-বাবা ভাই-বোনদের কাছে। তারাও চলে আসবে দুপুর দুপুর। বাড়িটা হয়ে উঠবে মহোৎসবের বাড়ির মত। সুভদ্রার ইচ্ছে করে ডাক ছেড়ে কাঁদতে। মদনের ভয়ে পারে না।

নিজের গাঁয়ের রাস্তায় পা ফেলে আগে কোনদিন এমন অন্ধ হয়নি মদন। অন্ধ

হলেও অক্লেশে চলতে ফিরতে পারতো, এমন মুখস্থ ছিল এই সব পথঘাট, ঘরবাড়ি, গাছপালা। গ্রামের দশ দিকের আগাপাশতলা মানচিত্র চোখে ছাপা ছিল তার জলস্রোতে ধুয়ে মুছে গেছে সমস্ত বাঁক, সমস্ত সীমানা। মদনের হাতে একটা লম্বা লাঠি, লাঠিটা ডানহাতে। লাঠি ঠুকে ঠুকে সে বুঝে নেয় ভুল পথে হাঁটছে কিনা। অনুমান করতে পারে কোন দিকে নাবাল ক্ষেতে, কোন দিকে পুকুর। চৌকিটাকে কখনো ঠেলে বাঁ হাতে, কখনো হাঁটুর ধাক্কায়।

থেকে থেকে বিদ্যুতের আলো। তখনই সে দেখতে পায় চোখের সামনের পৃথিবীটাকে। মদন থেকে থেকে কথা বলে।

—কী জল দেখছু বউ! দেখতে পেলু গোবিন্দদের নিমগাছটার মাথা ডুবে গেছে।

—হায় হায়! নগেন কাকার পান-বোরোজ। ভেঙে একদম লুটিয়ে পড়েছে জলে। কী হবে নগেন কাকার? ঐ বোরোজেই ভাত-ভিত।

—ও বউ! দেখ দেখ, এইখেনেই সাঁতোদের সাতঘর ছিলনি। হ্যাঁ, ঐতো সেই তেঁতুল গাছ। একখানাও বাড়ি নেই বউ! ইদিকটা নাবাল। তাই বেশী জল। সব ধসে পড়েছে বউ। উঃ, এমন দিশাও দেখতে হচ্ছে মোকে? বুকটা ফেটে যাচ্ছে বউ! ই কী হল আমাদের? হায় রে!

সুভদ্রারও বুক ফেটে যাচ্ছিল একটা জিনিস জানার জন্যে।

—হ্যাঁগো, শীতলপুরেও কী এমনি জল ঢুকেছে?

শীতলপুরে সুভদ্রার বাপের বাড়ি।

মদন ভেবেছিল মিথ্যে উত্তর দেবে। কিন্তু দিল না।

—যিখেনেই মানুষ, সিখেনেই জল। মানুষের উপর ভগমানের কোপ নজর পড়েছে বউ।

—মোর মা-বাপের কি হবে গো।

—সে সব কথা এখন ভাবিস নি বউ। ভাবার সোময় নয়। সবাই যেভাবে বাঁচবে, তেনারাও তেমনি বাঁচবেন। কাঁদিস নি বউ। জল নামলে আমি গিয়ে খপোর নিয়ে এসবো। ও বউ, মাথা নিচু করে বোস। বাবলা বন হেলে পড়েছে। গায়ে কাঁটা লাগবে। আর একটু ঝুঁকে পড়, যতটা পারু।

ঝমঝমে বৃষ্টির ভিতর বুক সমান জল ঠেলে ঠেলে মদন আর হাঁটতে পারে না। বার বার পা টলে যাচ্ছে। এক এক সময় তার ইচ্ছে করে বউটাকে যেমন ভাসছে ভাসিয়ে দিয়ে সে সাঁতার কেটে দিগ-দিগন্তের যেখানে ডাঙা, সেইখানেই চলে যায়। কিন্তু পারে না। সুভদ্রাকে বাঁচাতেই হবে। সুভদ্রার পেটে তাদের বংশধর।

—হায় সব্বোনাশ! ইকি হল?

চৌকিটা ধাক্কা খেল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মদন। লাঠি ঠুকে বুঝতে পারল সামনের রাস্তা জুড়ে বিরাট একটা গাছ। একটু পরেই বিদ্যুতের আলোয়

গাছটাকে চিনতে পারল সে। খিরীশ। গঙ্গা প্রধানের গাছ। সুভদ্রা ডুকরে কেঁদে ওঠে।

—কি করে যাবে গো থালে ?

—ভয় পাসনি বউ। ঠিক যাবো। তুই গাছটায় উঠে বোস। ভাল করে গাছের ডাল ধরবি। আমি চৌকিটাকে সাঁতরে উপারে এসতেছি।

সুভদ্রা গাছের ডাল আঁকড়ে বসে থাকে। এই সময় তার মনে একটা নতুন সন্দেহ হানা দেয়। তার ভিজে শরীরেও যেটুকু তাপ ছিল; সেটাও হিম হয়ে গেল এই নতুন বেদনায়। চৌকিটা নিয়ে মদনের গাছের ওপারে আসতে অনেকটা সময় লাগে। মদন এলেই সুভদ্রা তার আঁকুপাঁকু মনের বোনা বৃষ্টির মত ছাড়িয়ে দেয় মদনের গায়ে।

—কী হবে গো ?

—কেন, আবার বেথা উঠেছে ?

—না গো। পেটে যে কুনু সাড়া শব্দ নেই।

—তুই ভয় পেয়েছু। তাই সেও ভয় পেয়েছে। তুই একটু মনে মনে হাসিখুশি হ। দেখবি আবার নড়বে-চড়বে।

গাছ থেকে নেমে আবার চৌকিতে চাপে সুভদ্রা। কিছুটা যাবার পর সুভদ্রা বলে—

—জানো

—কি ?

—টসটস করে দুধ পড়তেছে মাই দিয়ে।

অত ভাবিস নি বউ। ঐ শোন, উদিকে কারা সব চেল্লাচ্ছে। কে যায় ? কারা গো ? সাড়া দাও না। কুন গেরামের লোক গো তোমরা ? সেজ জেঠা নাকি ? পদ্দো পিসী ই-ই, শৈলদি-ই-ই ? কারা যাচ্ছ গো ? দেখছ বউ, কত মানুষ পালাচ্ছে। ঐ দেখ. সেই শব্দ, ঘর দেয়াল ধসে পড়তেছে। একটা খুব ভুল করে ফেলেছি বউ। জিনিসটা বের করেও কী করে যে ভুলে গেনু নিতে।

—কি ? আলোচালের হাঁড়ি। সে আমি নিয়েছি।

—না না। কাঠারীটা। সামনে অনেক গাছ পড়েছে। ডাল কেটে যাওয়া যেতো। তাছাড়া যেতে যেতে যদি এইখেনেই বেথা উঠে ছেলে হয় নাড়িটা কাটতে হবে তো। তবে ভগমানের আশীর্বাদে জলে যেন না হয়। ডেঙায় গিয়েই হয় যেন।

চারপাশের উত্তাল জলরাশি এই দুটো মরা মানুষের কথোপকথন শুনে অবিরল হাসতে থাকে ছলাৎ ছল ছল, ছলাৎ ছল ছল। ওরা ডাঙা খুঁজতে বেরিয়েছে বুঝি, এমনি একটা আকাশজোড়া প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে আকাশেই এক পাক লুটোপুটি খেয়ে নেয় বিদ্যুৎ, ভেসে বেড়ানো চাপ চাপ মহিষ রঙের মেঘের আলুথালু

জমিতে। বজ্র কোনদিন মুচকি হাসে না। বিদ্যুতের প্রশ্ন চিহ্ন দেখে বজ্রের অট্টহাসি ছড়িয়ে পড়ে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ ভেদ করে, কড়াৎ গুম গুম, কড়াৎ গুম। কোন সুদূর অতীতের এক লোকগাথায় বেহুলা নামের এক নারী তার মৃত স্বামীকে কলার মান্দাসে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল স্বর্গ পর্যন্ত, স্বামীর মরা হৃৎপিণ্ডে প্রাণ ভরে নিতে। সেই অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতার খানিকটা ঋণ শোধ করতে পাকুড়দহের মদন দোলুই আজ ঝাঁপ দিয়েছে দিকচিহ্নহীন দুঃখের অন্ধকার সমুদ্রে, নিজের স্ত্রীকে আমকাঠের চৌকিতে ভাসিয়ে। মদনের লক্ষ স্বর্গ নয়। শশাংক হাজরাদের তিনতলা বাড়ি। মনে মনে প্রতিজ্ঞার মত উচ্চারণ করেছে কথাটা কয়েক বার।

—ঐখেনেই উঠবো। মোদের রক্ত নিঙড়িয়েই তো ওনাদের রাজসুখ। ঐখেনেই উঠবো।

আক্রমণ
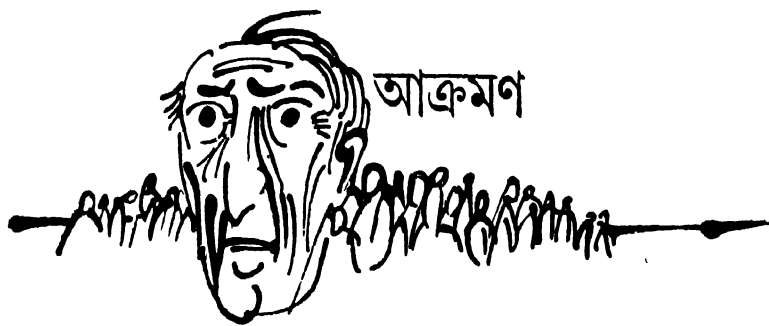
১৯৮০ র ১৭ এপ্রিলের মাঝরাতে, গগনবাবু, প্রায় ধারণাতীতরূপে, আপাদমস্তক অন্য এক মানুষ হয়ে গেলেন। না, আপাদমস্তক বাক্যটা সম্ভবতঃ যথাযথ বা যুক্তিযুক্ত নয় এখানে। আপাদমস্তক অদলবদল ঘটলে সেটা ধরা পড়ত গগনবাবুর বাইরের কাঠামোয়। আসলে রূপান্তরটা ঘটেছিল শরীরে নয়, অস্তিত্বে। ইচ্ছে করলে একে বলা যেতে পারে চৈতন্যের নবজাগরণ।

১৯৮০-র ১৭ এপ্রিলের রাত নটা পর্যন্ত তিনি যা ছিলেন, এখনো তাই। হুবহু এবং অবিকল। উচ্চতায় তিনি ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। বাড়েন নি। মাথায় ফুলকো-লুচি মাপের টাক। যথাযথ। টাকটিকে কেন্দ্রে রেখে, কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অস্থিরতার আদলে, মাথার চতুর্দিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন কেশগুচ্ছের শতকরা ৬০ ভাগ পাকা, ৪০ ভাগ কাঁচা। তাও পূর্ববৎ। এককথায়, অকালবার্ধক্যের যে-সব ছাপ-ছোপ বা আঁচড়-কামড় তাঁর কপাল, ভুরু, চোখ, নাক, হাতের শিরা, গায়ের চামড়া, নড়বড়ে দাঁত, ভাঙা গাল এবং ঈষৎ চালসে-পড়া চোখে জবরদখলের ভঙ্গিতে সেঁটে বসেছে, তার কোনখানেই ঘটে নি কোনো সংযোজন অথবা সংশোধন। মে মাসে ওপরের পাটির গোটা তিনেক দাঁত তোলানোর কথা। বড় ছেলে, মহীতোষ, কথাবার্তা পাকা করে এসেছে

পরিচিত এক ডেন্টিস্টের সঙ্গে। ডেন্টিস্ট জানিয়ে দিয়েছে দাঁত তোলার আগে ব্লাড-সুগার, ব্লাড-প্রেসার ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে। নিজের স্ত্রী সরমাদেবীর মতো তাঁর প্রেশার গগনচুম্বী নয় জেনেও, এমন-কি তাঁর শরীরে ডায়াবিটিসের ঘাঁটি গড়ে ওঠার সুস্পষ্ট কোনো লক্ষণাদির নিদর্শন নেই জেনেও, গত কয়েকদিন যাবং অনিশ্চিত এক দুর্দৈবের আশংকায় ভীত শামুকের মতো নিজেকে তিনি গুটিয়ে রেখেছিলেন হতাশার খোলে।

তৎসত্ত্বেও, ১৯৮০-র ১৭ এপ্রিলের মাঝরাতে এক আকস্মিক বিস্ফোরণ। অর্ধ-জীবনের নিরীহ, নিরপরাধ, ভীরু, কাপুরুষ, সন্ত্রস্ত এবং ন্যাদামারা গগনবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নিজের সাহসে, বীরত্বে এবং ক্ষমতায়। জীবনের অতিক্রান্ত ৫২ বছর বয়েসটাকে, ব্ল্যাকবোর্ডের বাসি অংকের ওপরে ডাস্টার বুলিয়ে নতুন অংক লেখার অনুকরণে, ঢেলে সাজানোর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে এখন তিনি যেন আশাতীতরূপে সুনিশ্চিত। নিজের রক্তে তিনি শুনতে পাচ্ছেন এক অলৌকিক কলনাদ। এখন, এই মুহূর্তে তিনি শুয়ে আছেন বিছানায়। পাশে ঘুমন্ত স্ত্রী। ঘর অন্ধকার। অন্ধকারে তিনি শুয়ে আছেন চোখ বুজিয়ে। যে-খাটে শুয়ে আছেন, সেই খাটের মতোই নিশ্চল তাঁর শরীর। কিন্তু অস্তিত্বের অভ্যন্তরটা, চলতে বা উঠতে গিয়ে উলটে-যাওয়া আরশোলার মতোই অস্থির এবং আলোড়িত।

চোখ বুজে-থাকা সত্ত্বেও তাঁর চোখের সামনে ভেসে চলেছিল সেই সব মুখ, প্রতিপক্ষ হিসেবে যারা তাঁর বহুদিনের চেনা। মুখগুলোকে তিনি যে খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন তা নয়। তবে, অস্পষ্টতা সত্ত্বেও, স্মৃতি গড়ে দিতে পারে বিশ্বাসযোগ্য পরিমণ্ডল। সেইভাবেই, সেই সব অস্পষ্ট অবয়বের প্রতিপক্ষদের দিকে তাকিয়ে নিজের মুখমণ্ডলটিকে তিনি সাজিয়ে তুলছিলেন কটাক্ষময় এক হাসিতে। তাঁর খুব ভাল লাগত যদি এই মুহূর্তে বড় সাহেবের ঘরে ডাক পড়ত তাঁর। ভুয়ো অভিযোগে ১৯৭৯-র পাওনা প্রমোশনকে আটকে দিয়ে যিনি তাঁকে অফিসার র‍্যাঙ্কে উঠতে দেন নি, সেই বড় সাহেবের ঘরে, ঠিক স্বপ্নে নয়, স্বরচিত কল্পনায় ঢুকে পড়লেন তিনি। বড় সাহেবের মুখে চার্চিলের চুরুট।

—ঘোষ এ্যান্ড চক্রবর্তীর ফাইলটা, আপনাকে আমি রিপিটেডলি বারণ করেছিলুম, রাইটার্সে এক্ষুণি না পাঠাতে। বলেছিলুম কি?

—ইয়েস স্যার।

—তাহলে পাঠালেন কেন?

—একাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টের আল্টিমেটাম অনুযায়ী ওটা করতে আমি বাধ্য। আপনার উচিত ছিল, মুখে না বলে, লিখিত নোট দেওয়া।

বড় সাহেব চমকে উঠলেন। চিরকালের ভীত, সন্ত্রস্ত, গোবেচারা গগনবাবু এখন যেন শহীদ ক্ষুদিরাম অথবা বিনয়-বাদল-দীনেশের মতো দৃপ্তভঙ্গিতে তাঁর

সামনে দাঁড়িয়ে। গগনবাবুর চরিত্রের এই বৈপ্লবিক বা আমূল পরিবর্তনে তিনি স্তম্ভিত। আর গগনবাবু দেখছেন, বড় সাহেবের মুখটা চুরুটের মুখে জমে থাকা ছাইয়ের মতো পাঁশুটে হয়ে যাচ্ছে, অধস্তন কেরাণীর কাছে তাঁর নেপোটি-জমের রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার দুর্ভাবনায় গগনবাবুর চরিত্রের বৈপ্লবিক বা আমূল পরিবর্তনটা ঘটে এইভাবে—

১৯৮০-র ১৭ এপ্রিলের রাত ন-টায় নিত্যনৈমিত্তিক নিয়মেই বিছানায় শুয়েছিলেন তিনি। অন্যান্য দিন তাঁর ঘুম ভাঙে ভোর পাঁচটায়। ঐদিন ভাঙে মাঝরাতে, আচমকা। ঘুম ভাঙার বেশ কিছু আগে থেকেই তিনি আবছাভাবে অনুভব করছিলেন এক ধরনের নিষ্পেষণ। আপিস যাতায়াতের সময় ট্রাম-বাসে যে ধরনের নিষ্পেষণে প্রায়ই হাঁপিয়ে ওঠেন তিনি, এ নিষ্পেষণ সে ধরনের সর্বাঙ্গব্যাপী নয়। শরীরের কোন একটা বিশেষ অঙ্গে ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে এক ধরনের অসহ্য চাপ। ঘুম ভাঙার পর তিনি বুঝতে পারলেন, নিষ্পষণের উৎসটা তার তলপেটসংলগ্ন অঞ্চল। সেখানে সুবৃহৎ একটি কার্বংকল পেকে উঠেছে যেন। যৎসামান্য ভাবনাতেই তিনি বুঝে গেলেন তলপেটে পাকা ফোঁড়ার কার্যকারণ। অন্যান্য দিনের মতো নির্ধারিত নিয়মে, শোবার আগে আজ তিনি ভুলে গেছেন পেচ্ছাপটা সেরে আসতে। সেই ভুলের খেসারৎ হিসেবে এখন তাঁকে বিছানা থেকে উঠতেই হবে। কিন্তু ওঠার উপক্রমের মুহূর্তে কয়েকটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন কালো অন্ধকারের ভিতরে আর গাঢ়তর কালো ডানায় ওড়াউড়ি শুরু করে দিলে তাঁর চিন্তায়। যথা—

১. তিনি কি তলপেটের এই টনটনানিকে অগ্রাহ্য করে ঘুমিয়েই পড়বেন আবার ?

২ ঘুমিয়ে পড়তে পারবেন কি ?

৩ না পারলে, বিছানা ছেড়ে বাথরুমে যেতে হলে, একাই যাবেন কি ?

৪ যদি কাউকে ডাকতে হয়, কাকে ডাকবেন ? স্ত্রী ? মেয়ে শ্যামলী ? বড় ছেলেকে ডাকা অসম্ভব। ছোট ছেলে ?

৫. স্ত্রীকে ডাকার বিপদ অনেক। হাইব্লাডপ্রেসারের রুগী। ক্যাম্পোজ গিলে ঘুমোন। আচমকা তার ঘুম ভাঙালে, রূঢ়তম বিরক্তিতে বা রাগে ফেটে পড়াটা স্বাভাবিক।

৬ স্ত্রীর উগ্র গলা-খাঁকারিতে যদি ঘুম ভেঙ্গে যায় টুলুর ? টুলু তাঁর আড়াই বছরের নাতি। রাত্রি-জাগরণে তার উৎসাহ যে কোনো বন্য পশু-পাখির চেয়েও আন্তরিক এবং উদাত্ত। টুলুকে ঘুম-পাড়ানো যাগ-যজ্ঞ উদ্‌যাপনের মতোই একটা জটিলতর বিষয়। আড়াই বছরের দস্যুর চোখে ঘুমের যাদুকাঠি ছোঁয়াতে বৌমা বর্ণালীকে প্রত্যহ যে শোচনীয় সংগ্রামে বিধ্বস্ত হতে হয়, তার ধারাবাহিক ইতিহাস গগনবাবুর জানা। সারাদিন চাকরির পর, ট্রামে-বাসে ঝুলে বাড়ি ফিরে। বাড়ির রান্নাবান্নার কাজে হাত লাগিয়ে ক্লান্ত শরীরের অবশিষ্ট

উদ্যমটুকুকে উজাড় করে যে টুলুকে ঘুম পাড়িয়েছে সে, টুলুর পুনরায় জেগে ওঠার মূলে, বর্ণালী যখন জানতে পারবে যে, শ্বশুর মশায়ের অসময়ের পেচ্ছাপের হাঁক-ডাক, ঘটনা হিসেবে সেটা কি হয়ে উঠবে না খুব লজ্জাজনক ?

৭. কাউকে না-ডেকে, না-জাগিয়ে যদি একাই বাথরুমে যেতে হয় তাঁকে, জ্বালবেন কোন্ আলো ? টিউব লাইট ? বেড সুইচ ? নাকি কোনো আলো না-জ্বালিয়ে বালিশের তলার টর্চটা হাতে নিয়েই সংগোপনে সেরে আসবেন কাজটা ?

৮. কাউকে না-জানিয়ে, না-জাগিয়ে বাথরুমে যাওয়ার ফলে যদি ১৯৭৪ সালের ২১ জুন তারিখের সেই রক্তাক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে যায়, তখন কি গোটা সংসার তাঁকে জর্জরিত করে তুলবে না ক্ষমাহীন এক অপরাধের দায়ে ?

এখানে ১৯৭৪ সালের ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে নেওয়াটা একান্তই আবশ্যক। না বললে, গগনবাবুর সমস্যার গভীরতা সম্পর্কে পাঠকের ধারণায় কুয়াশা-সুলভ এক ধরনের অস্বচ্ছতা থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। পাঠকের পক্ষে সেটা অপূরণীয় ক্ষতিই। পাঠক যেহেতু দর্শক নয়, অপরদিকে পাঠক যেহেতু চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও বিশ্লেষণে আগ্রহী, সেই হেতু. আগ্রহী পাঠকের কাছে, রঙ্গমঞ্চের আদলে কয়েকটি বাছাই-করা নাটকীয় মুহূর্তের চেয়ে, প্রতি মুহূর্তের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় আলোড়ন-আন্দোলনই অধিকতর প্রার্থনীয়। আধুনিক পাঠক এবং আধুনিক লেখকের মাঝখানে কোনো গোপন দরজা বা টানা পর্দা অথবা সলজ্জ ঘোমটার আড়াল বা ব্যবধান না থাকাটাই আধুনিক রচনার আদর্শ।
১৯৭৪ সালের ২১ জুন তারিখে গগনবাবুর জীবনে ঘটে-যাওয়া দুর্ঘটনার সংক্ষিপ্তসার—

১৯ জুন। গিয়েছিলেন পানিহাটি, আপিসের জনৈক নবীন সহকর্মীর বিবাহ উপলক্ষে সেখানে ভূরিভোজ।

২০ জুন। সম্পর্কিত আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ। পুনরায় ভূরিভোজ।
২১ জুন। আপিসে জনৈক সহকর্মীর প্রথম পুত্রসন্তান লাভ উপলক্ষে আপিস ক্যান্টিনের ফিস চপ ইত্যাদি।

২১ জুন রাত্রি। মাঝরাতে পেটে প্রবল তোলপাড়। সেই কারণেই, মাঝরাতে গ্রীষ্মকালের বাথরুম তাঁর পক্ষে ভয়াবহ রকমের বিপজ্জনক জেনেও, দিশেহারা ভঙ্গীতে বাথরুমে দৌড়তে হয়েছিল তাঁকে। অন্তর্গত প্রবল বেগের জন্যে বাথরুম সারতে বেশি সময় লাগেনি তাঁর। ঐ সময় তিনি জ্বেলেছিলেন বাথরুমের ছোট আলোটা। এবং প্রায় সারাক্ষণই চোখদুটিকে বুজিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু নিজের চোখের চালশে-দৃষ্টির সঙ্গে বাথরুমের প্রায়ান্ধকার পরিবেশ জুড়ে যাওয়ার ফলে হাত ধোবার সাবানটি খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। তখন তাঁকে বাধ্য হয়েই জ্বালতে হয় বড় আলো। আর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘটে যায় সেই রক্তাক্ত দুর্ঘটনা। একসঙ্গে ১৫/১৬টি, গগনবাবুর ধারণায় সংখ্যার পরিমাণ আরো

অধিক, আরশোলা নানা দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর উপর। যেন গগনবাবুর জন্যে বিকেল বা সন্ধ্যে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল তারা আক্রমণের প্রয়োগ-পদ্ধতি সহ। বহুদিন ওঁৎ পেতে থাকার পর শত্রুকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেলে আক্রমণকারীদের পেশীতে জেগে ওঠে যে সতেজ, সবল এবং ছন্দোময় এক আন্দোলন ও স্ফূর্তি, ঠিক সেইভাবেই স্পন্দিত হয়েছিল সংঘবদ্ধ আরশোলাদের ডানা। এবং কত দ্রুততায় ও কম শক্তি ব্যবহার করে শত্রুকে পর্যুদস্ত করা হবে, সে-সম্পর্কেও আরশোলাদের মধ্যে ছিল বেশ সুচিন্তিত বোঝাপড়া। এ থেকে মনে হতে পারে, আক্রমণের বহু আগে থেকেই গগনবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে তারা চালিয়ে এসেছে দীর্ঘ অনুসন্ধান। বাড়িওয়ালার স্ত্রীর সঙ্গে জলের লাইনে জল কেন পড়ে না এই সম্পর্কিত নিত্য সংগ্রামে গগনবাবুর চিরদিনই স্ত্রী সরমাকে সামনে ঠেলে দিয়ে নিজের আত্মগোপন করে থাকা অথবা পাড়ার ছোটখাট বিপদের সংবাদে গগনবাবুর ভীত ভঙ্গিতে জড়সড় হয়ে থাকা, ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ দেখলে তাঁর ধড়ফড় করে ওঠা ইত্যাদির মতো গগনবাবুর চরিত্রের আরও নানাবিধ দুর্বলতা সম্বন্ধে যেন তাদের অভিজ্ঞতা ছিল যথেষ্ট পরিমাণ বাস্তব ঘেঁষা। ফলে আরশোলাদের পক্ষে ওই গেরিলা আক্রমণটা সার্থক হয়ে ওঠে এক নিমেষে। আত্মরক্ষার বিষয়ে কোনকিছু চিন্তার আগেই জ্ঞান হারানোর ভঙ্গিতে আছড়ে পড়ে যান গগনবাবু। মাথার খুলিটা চৌচির হয়ে ফেটে যাওয়াটাও অসম্ভব ছিল না। ফাটেনি তার কারণ, সেটা, দৈবক্রমেই, আছড়ে পড়েছিল জল-ভর্তি একটা প্লাস্টিকের গামলার ভিতরে। ডান হাত আর ডান পাঁজরেই আঘাতটা লেগেছিল বেশী। আর পিঠের চামড়াটা লম্বালম্বি চিরে গিয়েছিল উপুড় করে রাখা একটা ভাঙা বালতির খোঁচায়। গগনবাবুর আছড়ে-পড়ার শব্দে এবং আছড়ে-পড়ার সময়ে গগনবাবুর ভয়ার্ত চিৎকারে গোটা সংসারের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল এক ঝটকায়। তারপর যথারীতি ডাক্তার, ইঞ্জেকশান, বোরিক তুলো, ব্যাণ্ডেজ, ডেটল, বেট-না ভেট-সি মলম ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিণামে প্রায় একমাসের মতো আপিস-কামাই ও মেডিকেল-লিভ।

ঈষৎ সুস্থ হয়ে ওঠার পর গগনবাবু ভেবেছিলেন প্রতিবাদে এবং আক্রোশে ঝমঝমিয়ে উঠবেন ছুটন্ত দমকলের ঘণ্টার মতো। ভেবেছিলেন নানাবিধ কাঠের এবং কাগজের বাক্সে এবং নানা মাপের ঝুড়িতে সংসারের নিত্য প্রয়োজনের জন্যে জমা করে রাখা কয়লা, কয়লার গুঁড়ো, ঘুঁটে, গুল ইত্যাদিকে বাথরুমের গায়ের ঘুপচি থেকে টেনে হিঁচড়ে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেবেন পাঁচিলের ওপারে। আর সরমাদেবীর ওপর জারী করে দেবেন হাইকোর্টের চেয়েও কঠোরতর নির্দেশ—কয়লা-ঘুঁটে হটাও। রাঁধতে হয়, গ্যাসে রাঁধো। মনের ভিতরের এসব অগ্নিকাণ্ড সত্ত্বেও তিনি যে প্রতিবাদে অথবা আক্রোশে জ্বলে ওঠেন নি শেষ পর্যন্ত, সেটা শুধুমাত্র গ্যাস-সিলিণ্ডারের অগ্নিমূল্যের কথা মনে রেখেই নয়, প্রতিবাদ বিক্ষোভ ইত্যাদি উত্তেজক আবেগ প্রকাশে আজীবন তিনি অনিচ্ছুক এবং অক্ষম বলেই। যে সরকারী আপিসের তিনি কেরানী, সেখানে দু-নম্বর ইউনিয়নকে শক্তিশালী

এবং যথেষ্ট পরিমাণ সংগ্রামী জেনেও তিনি যে সংখ্যালঘু, সুবিধাবাদী এবং রক্তমাংসহীন এক নম্বর ইউনিয়নেরই সদস্য রয়ে গেছেন, তার মূলেও ওই একই মনোভঙ্গি। দু নম্বর ইউনিয়নের সদস্য হলে নিয়মিত হাঁটতে হবে মিছিলে। মিছিলে হাঁটতে গেলে চিৎকার করতে হবে। চিৎকার করতে-করতে গগনবাবুর শরীরে ক্রোধ জমে উঠতে পারে। ক্রোধ জমে উঠলে গগনবাবুর হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে তার চিরকেলে এবং নিজস্ব নির্বিরোধ স্বভাব।

আমরা ফিরে যাই ১৯৮০-র ১৭ এপ্রিলের মাঝরাতে।

ইতিমধ্যে, বিছানায় উঠে বসে গগনবাবু ছকে নিয়েছিলেন একটা স্বচ্ছ পরিকল্পনা। পেচ্ছাপের জন্য বাথরুমে ঢুকবেন না তিনি। বাথরুমে ঢোকার আগে ছোট্ট উঠোনের পাশে সরু নর্দমাসহ যে কলতলা, সেখানেই সেরে নেবেন কাজটা। সন্তর্পণে ঘরের খিল এবং ছিটকিনি খুলে, একটা না জ্বাললে পাছে দ্রুত অপচয় হয় ব্যাটারির, সেই ভেবে দফায়-দফায় টর্চটা জ্বালিয়ে গগনবাবু এগিয়ে চলেছিলেন নির্দিষ্ট কলতলার দিকে।

কলতলার কাছাকাছি পৌঁছেই তিনি উবু হয়ে বসতে পারলেন না। কিছুটা সময় গেল ফতুয়ার বোতাম খুলে গলার পৈতেটাকে টেনে কানে জড়াতে। মলমূত্র ত্যাগের আগের মুহূর্তে মুখ দিয়ে থুতু ছিটোনোর ভঙ্গিতে 'থুঃ'-জাতীয় এক ধরনের শব্দ উচ্চারণ করা তাঁর স্বভাব। পান খাওয়ার আগে পানের সরু বা ছুঁচোলো দিকটাকে মুখে পুরে, তার সামান্য অংশ দাঁতে কেটে সেটাকে জিভের ঠেলায় 'থু' করে ছুঁড়ে দেওয়া যেমন এক-একজনের মজ্জাগত অভ্যাস, গগনবাবুর অভ্যাসটাও তেমনি। এই কাজগুলো সারার পর তিনি নর্দমার দিকে এগোলেন। আর সেই মুহূর্তে তিনি শুনতে পেলেন অদ্ভুত একটা শব্দ। তাঁরই পায়ের নীচে। ছেলেবেলায় মুখের বাতাসে ছোট-ছোট কাগজের ঠোঙাকে ফুলিয়ে চাপড় মেরে ফাটানোর সময় যে জাতীয় শব্দ হয়, অনেকটা যেন তেমনি। কিন্তু শব্দের দিকে মনোযোগ না দিয়ে তিনি পেচ্ছাপটা সেরে নিলেন। পেচ্ছাপ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি উঠতে পারলেন না। তলপেটের টনটনানি তাঁকে বসিয়ে রাখলো আরও কিছুক্ষণ। যেন আরও অনেক পেচ্ছাপ বাকী। এই রকম একটা অনুভূতির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন তিনি। প্রখর যন্ত্রনার বেশ জেটপ্লেনের মতো দূরে চলে গেলেও পিছনে রেখে যায় শব্দের তোলপাড়।

সময়সাপেক্ষ এই সব জরুরী কাজ সারার পর তিনি অনুসন্ধিৎসু হলেন আগের ঐ শব্দটি সম্পর্কে। টর্চের আলো ছাড়লেন নর্দমার ভিজে ভিজে শানের উপর। দেখলেন লরী চাপা পড়া কুকুরের ভঙ্গিতে থেঁতলে রয়েছে একটা আরশোলা। আরশোলাটি যে তাঁরই রবার স্লিপারের চাপে এভাবে নিহত হয়েছে এটা বিশ্বাস করতে সন্দেহ হল তার। মৃত প্রাণীটি সত্যি আরশোলা কিনা সেটা সঠিক চেনার জন্যে টর্চ জ্বালিয়ে ঝুঁকে পড়লেন তিনি ঈষৎ। আর সেই সময়ই তাঁর চোখে পড়ল অন্য একটা আরশোলা অদূরে অন্ধকার থেকে মৃত আরশোলার দিকে।

বিমূঢ় গগনবাবু দুর্বল মানসিকতার অভ্যন্তরে ঠিক কি ধরনের বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল, তা আমাদের জানা নেই। তিনি সহসা তাঁর রাবারের স্লিপারসহ ডান পা'টিকে ওপরে তুলে কলতলার মেজের ওপরে বসিয়ে দিলেন সবলে একটা লাথি। লাথি মারার পরেই তার ডান পাটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো স্বভাবসিদ্ধ আতঙ্কে। ডান পাটাকে সরাতেও পারলেন না কিছুক্ষণ। রাগের ঝোঁকে খুন করার পর যে-ভাবে অসহায় আত্মগ্লানিতে মুষড়ে পড়ে মানুষ, সেইভাবে কুঁজো হয়ে স্থাণুবৎ রইলেন তিনি। কিন্তু খুন করার পর হত্যাকারী ঠিক যে-ভাবে আচমকা বুঝতে পারে যে, এখন পালানোই তাঁর বাঁচার একমাত্র পথ, গগনবাবুও ঠিক সেভাবে কলতলার থেকে সরে পড়ার তাগিদে ডান পাটাকে সরাতে বাধ্য হলেন। সরিয়ে নেওয়ার পর এক ভয়াবহ অথচ অদম্য কৌতূহলের ধাক্কায় জ্বলে উঠল তাঁর হাতের টর্চ। দেখতে পেলেন, দ্বিতীয় আরশোলাটিও প্রথমটির মতো থেঁতলে গেছে কলতলার খড়খড়ে শানে। তৎক্ষণাৎ এক অ-ভূত বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল তাঁর শরীরে। নিজের সাহস সম্বন্ধে শ্রদ্ধায় আলোড়িত হলেন তিনি। তাঁর এতকালের মিয়ানো স্নিগ্ধধরা চৈতন্যে কোন এক অদৃশ্য অগ্নিশিখার তাপ লাগল যেন। আত্ম-আবিষ্কারের এক অভূতপূর্ব আনন্দে তাঁর পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি শরীরটা ক্রমশঃ দীর্ঘতর হতে লাগল কোন উচ্চতার সীমায় পৌঁছানোর ব্যস্ততায়। যেন তাঁরই মনের মধ্যে লুকিয়ে-থাকা কাউকে তিনি খোঁচাতে লাগলেন বারংবার একটি প্রশ্নেই।

—আপনি বলেছেন, আরশোলা দুটোকে নিপাত করেছি আমি ? আপনি সত্যি বলেছেন ? সত্যি ?

গগনবাবুর আরশোলা-ভীতিটা আজন্ম। কোন কোন মহাপুরুষ সম্বন্ধে আমরা যেভাবে শুনে থাকি যে, তাঁরা নাকি, কনফুসিয়সের দাঁড়ির মতো ; অখণ্ড প্রতিভার পরিপূর্ণতাসহ ভূমিষ্ঠ হন মর্ত্যে। গগনবাবুর বেলায় বলা যেতে পারে, তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন আরশোলা-ভীতির অকল্পনীয় পারদর্শিতাসহ। ১৬ বছর বয়সে একবার আগুনে মারা যেতে বসেছিলেন তিনি। মৃত্যুর কারণ, ঐ আরশোলাই, পাড়াগাঁর রান্নাঘরে বসে তেঁতুলে-পাঁকি দিয়ে পান্তাভাত খেতে খেতে তাঁকে হঠাৎ থুবড়িলাফ খেতে হয়েছিল, বোমারু বিমানের ভঙ্গিতে শূন্য থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া এক আরশোলার আক্রমণে। সেই তালগোল পাকানো ভয়ার্ত মুহূর্তে কিভাবে যেন গায়ে জড়ানো চাদরটা ছুঁয়ে ফেলেছিল পাশে রাখা কেরোসিন ল্যাম্পটাকে। জন্ম থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত আরশোলাকে ঘেন্না করতেন তিনি। ১৬ থেকে বাকি জীবনটার ঘেন্নার সঙ্গে মিশে যায়, অবশ্যই ঐ অগ্নিকাণ্ডকে স্মরণে রেখে এক ধরনের উগ্রতর ভয়। বিয়ের পর প্রথমবার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সুন্দরী শালীদের কাছে তিনি যে মুখরোচক হাসি-ঠাট্টার বিষয় হয়ে উঠেছিলেন সেও ঐ আরশোলারই বাবদে। শালীদের সমবেত হাস্যরোলটা শঙ্খধ্বনির মতো প্রবল হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে, সে-আরশোলা দর্শনে ভূত দেখার মতো শিউরে উঠেছিলেন তিনি সেগুলো ছিল কৃষ্ণনগরের

তৈরি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনী পাঠ না করেও গগনবাবু যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে বিদ্যাসাগরকেই শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছেন আজীবন, তারও উৎস ঐ আরশোলা। এক নিমন্ত্রণ বাড়িতে অক্লেশে অথবা অনায়াসে একটি সিদ্ধ আরশোলা গলাধঃকরণ করে বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহস্বামীর সম্মান রক্ষা করেছিলেন, লোকমুখে এই কিংবদন্তি তাঁর শোনা হয়ে গিয়েছিল যৌবনেই। যে আরশোলা তাঁর কাছে এমন বিপজ্জনকরূপে ভয়াবহ, তাঁকে যিনি ভক্ষণ করতে পারেন, গগনবাবুর কাছে তিনি যে প্রাতঃস্মরণীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর হয়ে উঠবেন, আমাদের পক্ষে সেটা অনুমান করে নেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। সেদিন, অর্থাৎ ১৯৮০-র ১৭ এপ্রিলের মাঝরাতে, কলতলায় পেচ্ছাপ পর্বটা সেরে পুনরায় বিছানায় শুয়ে পড়বার পর কিছুতেই আর ঘুমোতে পারছিলেন না গগনবাবু। তাঁর সর্বাঙ্গ ক্রমশঃ তেতে উঠছিল এক আতিশয্যময় আনন্দের জ্বরে। আত্মশক্তিতে বলবান নিজের শরীর ও মনকে নিয়ে ক্রমাগত আইঢাই করতে লাগলেন তিনি। সারাজীবনে যতবার যার যার কাছে অপমানিত অথবা লাঞ্ছিত হয়েছেন তাদের মুখগুলোকে কল্পনায় হাতড়ে বেড়ানোর ইচ্ছেটাও পেয়ে বসেছিল তাঁকে এই সময়। সেই সুবাদে থানার দারোগা, আপিসের লিফটম্যান, নিজের বাড়িওয়ালা এবং বাড়িওয়ালার মুখরা স্ত্রী, স্থানীয় এম এল এ কর্পোরেশনের এবং ইলেকট্রিক আপিসের নানা কর্তা ব্যক্তি, ট্রেনের গার্ড, বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্সি-ওয়ালা, পাড়ার কিছু বাছাই মাস্তান, ছোটমেয়ের শ্বশুর এবং শাশুড়ি, আপিসের কিছু কিছু সহকর্মী আপিসের বড়সাহেব, দুনম্বর ইউনিয়নের কিছু কিছু মাতব্বর ইত্যাদি আরো একাধিক মানুষের মুখ ভিড় জমিয়ে তুলছিল তার দু-চোখের চারপাশে। প্রতিশোধে সক্ষম কিন্তু আপাতত অনিচ্ছুক এমনি এক বীরত্বময় অথচ ক্ষমতাশীল ভঙ্গিতে তিনি সেই ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন কিছুক্ষণ, ঠিক এই সময়ে তার ঘুমন্ত স্ত্রী তারই দিকে ঘুরে শোয়ার ফলে শত্রু পক্ষকে ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীকেই জড়িয়ে ধরলেন প্রাণময় আবেগে। দীর্ঘদিনের অভ্যাস কাটিয়ে স্ত্রীর সঙ্গেও আজ কোনো প্রতিশোধমূলক যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মেতে উঠা যায় কিনা সেটাও একবার পরখ করে নেওয়ার আগ্রহে নিজের হাতের ব্যস্ত আঙুলগুলো দিয়ে সরাতে লাগলেন স্ত্রী শরীরে আলগা হয়ে লেগে থাকা শাড়ির আস্তরণ। গগনবাবুর মনে হলো। তাঁর চরিত্রের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন, আকস্মিকভাবে তার নবযুবক হয়ে উঠার এই ঐতিহাসিক রাত্রিটিকে স্ত্রীর কাছেও স্মরণীয় করে তোলার প্রয়োজনটাও একান্তভাবে জরুরী। কিন্তু ক্যাম্পোজ খেয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন স্ত্রীর থলথলে এবং শীতল শরীরে নিজের শরীরের অগ্নিগর্ভ উত্তেজনাকে সংক্রামক করে তোলার অক্ষমতায় এবং বিরক্তিতে বেশ কিছুক্ষণ নাস্তানাবুদ হয়ে সেদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়লেন গগনবাবু।

পরের দিনগুলো থেকে গগনবাবুর জীবনে যে-সব অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে শুরু করে, তার ইতিবৃত্ত এই রকম।

১৮ এপ্রিল। সকাল। আশুতোষবাবুর বাজার। গগনবাবু নির্দিষ্ট মাছওয়ালার

কাছে গিয়ে দাঁড়ান। মাছওয়ালা মাছ দেয়। গগনবাবু মাছওয়ালার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠেন,

—তুমি কি ভেবেছো হে? ভদ্রলোকের ছেলে বলে কি রোজই মুখ বুজে তোমাদের দিনে-ডাকাতি সহ্য করতে হবে? দেখি তোমার বাটখারা!

যে মাছওয়ালা গগনবাবুকে এতকাল মৃত এক ধরনের মাছের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু ভাবেনি, গগনবাবুর এই আকস্মিক বিস্ফোরণে সে চমকে উঠে। এই সময় গগনবাবুকে ঘিরে, পলকের মধ্যে জমে যায় একটা গোলাকার ভিড়। মাছের দাম, নকল বাটখারা, ওজনের চালাকি, মাছওয়ালাদের মুখের দাপট এবং ভদ্রতাহীন আচরণের বিরুদ্ধে ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠতে থাকে জনমত। শেষ পর্যন্ত বাজারে-আসা সমস্ত মানুষ একজোটে সেদিনের মতো মাছ কেনা বন্ধ রাখে। মাছহীন বাজার নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে একাধিক চেনা জানা মানুষ গগনবাবুকে জানিয়ে যায় আন্তরিক ধন্যবাদ।

—আপনি সাহস করে এগিয়ে এলেন, তাই হল। দেখবেন কাল থেকে ব্যাটারা সায়েস্তা হবে।

গগনবাবুর সৌজন্যমূলক সংক্ষিপ্ত উত্তর—

—বহুদিন চুপ করে থেকেছি। আজ আর প্রতিবাদ না-করে পারলাম না মশাই।

১৮ এপ্রিল। দুপুর। আপিস। টিফিন-পিরিয়ডে এক নম্বর ইউনিয়নের জরুরী সভা। সিদ্ধান্তের বিষয়, দিল্লির বোনাস-নীতির বিরুদ্ধে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য ছ-দফা দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে দু নম্বর ইউনিয়ন যে সর্বভারতীয় আন্দোলনের আওয়াজ তুলেছে তাতে সমর্থন জানানো হবে কি হবে না। সভায় সবার আগে হাত তুললেন গগনবাবু ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের স্বপক্ষে।

১৮ এপ্রিল। রাত্রি। গগনবাবু খেতে বসেছিলেন। একটা আরশোলা তাঁর মাথার উপরে এপাশ ওপাশ উড়তে গিয়ে ঘুরন্ত ফ্যানের ব্লেডে ধাক্কা খেয়ে আছাড়ে পড়ল খাবারের থালার পাশে। গগনবাবু সঙ্গে-সঙ্গে জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে, অনেকটা ছাদ-পেটাইয়ের সময় দুরমুশ চালানোর ভঙ্গিতে, খাবারের টেবিলে সানমাইকার সঙ্গে পিশে দিলেন সেটাকে। স্ত্রীর মাথার যন্ত্রণা বেড়েছে বলে সেদিন তাঁকে খাবার পরিবেশন করছিল বৌমা বর্ণালী। বর্ণালী ভ্যাবাচাকা খেয়ে-যাওয়া বিস্ময়টাকে সামলাতে না পেরে বলে উঠল,

—বাবা, আপনি আরশোলা মারতে পারলেন?

গগনবাবু, বিষপানরত সক্রেটিসের মতো শান্ত মহিমা মুখে মাখিয়ে জবাব দিলেন,

—কেন, আরশোলা কি অমর নাকি?

১৯ এপ্রিল। সকাল। বাজারে যাচ্ছিলেন। বাজার ঢোকার মুখে দূর থেকেই দেখতে পেলেন তিনি, গোলাকার একটা ভীড়। কাছে যাওয়া মাত্রই ভীড়টা ছেঁকে ধরল গগনবাবুকে।

—আপনার কথাই আলোচনা হচ্ছিল মশাই। আমরা একটা প্রতিরোধ কমিটি

গড়ছি। আপনাকে তার সেক্রেটারি হতে হবে। না, মশাই, না বললে শুনবো না। আপনিই চোখ খুলে দিয়েছেন আমাদের। আমাদের প্রতিনিধি শ্যামবাজার, নাগেরবাজার, হাতীবাজার, মাণিকতলার বাজারে গিয়ে সব কিছুর দাম লিখে আনবে। আমরা মিলিয়ে দেখবো, এই ব্যাটারা কি পরিমাণ ঠকাচ্ছে। আরে মশাই শ্যামবাজারে গতকাল আলু বিক্রি হয়েছে দু' টাকা দশ। এখানে দু' টাকা পঁচিশ।

সমস্ত শুনে গগনবাবু বললেন—

—সেক্রেটারি অন্য কাউকে করুন। কিন্তু আন্দোলনের সঙ্গে আমি রইলাম। দরকার পড়লে হরতাল ডাকবো। বাজার করবো না কেউ।

১৯ এপ্রিল। সকাল দশটা। গগনবাবু ট্রামে। বসার জায়গা পাননি। তাই দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়েই তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন একটি জিনস্-পরা যুবক ইচ্ছাকৃত ভাবে বারবার ঢলে পড়ছে একটি তরুণীর ওপর। তরুণীটি নিশ্চয় কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। হাতের বইপত্র এবং ব্যাগ নিয়ে তার বেসামাল অবস্থা। অন্যান্য দিন গগনবাবু এ-জাতীয় দৃশ্যের দিকে তাকান না। তাকালেও চোখে মাখেন না। একবার বাসের মধ্যে তাঁরই সামনের বসা সিটে এক ভদ্রমহিলার গলা থেকে একজন জানলার বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে ছিনিয়ে নিয়েছিল হার। যেহেতু তিনি ভদ্রমহিলার পেছনে বসেছিলেন, তাই ছিনতাইকারীরহাতটা এগিয়ে এসেছিল তারই সামনে। ইচ্ছে করলেই খপাৎ করে হাতটা জাপটে ধরে ছিনতাই যাওয়া হারটাকে বাঁচাতে পারতেন তিনি। কিন্তু পাছে এই নিয়ে কোন হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে হয়, সেই ভাবনাতেই চোখ বুজিয়ে যা ঘটার ঘটতে দিয়েছিলেন। আজ কিন্তু পারলেন না।

—ওহে ছোক্‌রা···

গগনবাবুর গম্ভীর আওয়াজে ছোকরাটি ঘুরে তাকালো।

—আমাকে বলছেন ?

—হ্যাঁ হে, তোমাকেই। মেয়েটির গায়ে অমন ঢলে পড়ছ কেন ? সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখোনি ?

—আপনি চুপ করুন। বেশী বাজে কথা বলবেন না।

—আমি বাজে কথা বলছি ?

ছেলেটি মারমুখো হয়ে ওঠে। অন্যান্য যাত্রীদের পাথুরে নীরবতা দেখে গগনবাবু একটু ঘাবড়ে যান এই সময়। আজকালকার ছেলেদের না ঘাঁটানোই উচিত ছিল তাঁর। পকেট থেকে ছুরি বার করে পেটে চালিয়ে দিতেও পারে হয়তো। তবুও নিজের অস্তিত্বের ভেতরে সদ্য জাগা সাহসকে নিয়ে তাঁর খেলে বেড়ানোর উৎসাহ অনেকটা যেন নাকি টুনুর মতো। নতুন কোন খেলনা পেলে টুনু সবসময়েই মেতে থাকে সেটাকে নিয়ে।

গগনবাবুকে বাঁচালো মেয়েটিই। ছেলেটির হাঁকডাক এবং ইতর-সুলভ ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে এতোক্ষণ পরে মেয়েটিই ফেটে পড়ল প্রতিবাদে এবং গগনবাবুর স্বপক্ষে। তখন অন্যান্য যাত্রীদের মুখেও খৈ-ফোটা।

২০ এপ্রিল। আপিস। জরুরি মিটিং। গগনবাবুর যোগদান।

২১ এপ্রিল। সকাল সাতটা। বাজার। প্রতিরোধ আন্দোলন নিয়ে আলাপ আলোচনা।

২১ এপ্রিল। সকাল সাড়ে আটটা। বাড়িওয়ালার সঙ্গে কলহ।

২১ এপ্রিল। বিকেল। আপিস। জরুরি মিটিং। যোগদান।

২২ এপ্রিল। সকাল। প্রতিরোধ আন্দোলন নিয়ে পুনরায় আলোচনা।

২২ এপ্রিল। বিকেল। আপিসে জরুরি মিটিং। যোগদান। মিটিং এবং মিছিল বিষয়ে পুংখানুপুংখ আলোচনা।

২২ এপ্রিল। রাত্রি। খাওয়ার পর নাতি টুলুর সঙ্গে খেলা। টুলু খুব বন্দুক পছন্দ করে। তাই বাড়ি ফেরার পথে ছোট্ট টয় রিভলভার কিনে এনেছেন একটা। টয় রিভলভার নিয়ে আজকাল কতো সহজে ব্যাংক ডাকাতি করা যায় সে-সব নিয়ে ছেলে-মেয়ে-বৌমার সঙ্গে আলোচনা। সেই সুবাদে বৌমা বর্ণালী একটা গল্প শোনায়। তাঁর এক নতুন বিয়ে হওয়া বান্ধবী স্বামীর সঙ্গে বিয়ে-বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে বাড়ি ফেরার সময় কিভাবে টয় রিভলভারের ভয়ে গায়ের সমস্ত গয়না খুলে দিতে বাধ্য হয়। গল্প সমস্তটা শুনে মন্তব্য করেন, —আমরা বড় ভীত হয়ে গেছি। কাউয়ার্ড। সে রকম নেতাও নেই যে দেশটাকে নতুন করে গড়বে।

তাঁর শুয়ে পড়ার সময় হয়। নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়ম অনুযায়ী বাথরুমে ঢোকেন পেচ্ছাপ সারতে। পেচ্ছাপ শুরু করার মুখে কোথা থেকে একটা আরশোলা তাঁর মুখের দিকে কিছুটা লাফিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। পেচ্ছাপ শেষ করে গগনবাবু চোখের তল্লাশি চালালেন সেই পলাতকের পেছনে। একটু পরে দেখতে পেলেন আত্মগোপনকারীর শুঁড়, একটা বালতির পেছনে। গগনবাবু সন্তর্পণে বালতিটা সরালেন। আরশোলারা সম্ভবত মানুষের চেয়ে স্পর্শকাতর। বালতির সামান্য নড়ে ওঠার স্পর্শেই আত্মগোপনকারী উড়ে গেল শূন্যে। গগনবাবু শূন্যের দিকে তাকাতেই সেটা তাঁর টাকে এসে বসল। গগনবাবু কখনো ফুটবল খেলেন নি। কিন্তু অনেকটা ফুটবলে হেড করার ভঙ্গিতেই মাথাটাকে আছড়ে দিলেন শূন্যে। গগনবাবুর মসৃণটাকে সুড়সুড়ির মতো সাড়া জাগিয়ে আরশোলাটি উড়ে বসল বাথরুমের দেয়ালে। দেয়াল থেকে বাল্বের শেডে। সেখান থেকে লাফিয়ে হুকে ঝোলান বর্ণালী বা শ্যামলীর শাড়িতে। শাড়িটাকে বেয়ে খানিকটা উঠে, অল্প লাফে বর্ণালী বা শ্যামলীর ঝোলানো ব্রেসিয়ারে। ব্রেসিয়ারের যে অংশটা ফাঁপা বা ফোলানো, ঢুকে গেল তার ভেতরে। ভেতরে গিয়ে যে-ধরনের সুখ-স্বাদ পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল, তা না পেয়ে যেন দ্রুত বেরিয়ে এল বাইরে। বাইরে বেরিয়ে এসে গগনবাবুর দিকে

তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। এই অল্প কদিনে গগনবাবু কয়েকটি আরশোলা মারার যে-দুর্লভ সাহস দেখিয়েছেন, তারই বিরুদ্ধে অভিযান-চালানোর ভঙ্গিতে বুলেট বেগে আরশোলাটি ঝাঁপ দিল শূন্যে, ঠিক গগনবাবুর মুখটাকে লক্ষ্য করে। গগনবাবু দ্রুত সরে গেলেন। সেই সময় তাঁর চোখের দৃষ্টি ঘুরে গেল বাথরুমের কোণের জল-নিকাশী সরু নালার দিকে। সেখান থেকে গল গল করে বেরিয়ে আসছে অজস্র আরশোলা।

১৭ এপ্রিলের মাঝরাতের আগে পর্যন্ত আরশোলা সম্পর্কে তাঁর মনে যে-ধরনের ভয় ও আতঙ্কের ঘাঁটি ছিল, আর যা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ভেবেছিলেন তিনি, সেটাই যেন আবার খাড়া হয়ে উঠতে লাগল তাঁর ভেতরে। তিনি ভয় পেলেন। আরশোলার সম্পর্কে পুনরায় ভয় ফিরে আসা মানেই, আবার সেই পরাস্ত জীবন। আগামীকাল কেন্দ্রীয় বোনাসনীতির প্রতিবাদে মিছিল। তাঁকে যোগ দিতে হবে মিছিলে। মুখোমুখি হতে হবে পুলিশ-ব্যারিকেডের। এর জন্য প্রচুর সাহসের প্রয়োজন তাঁর। নির্ভয় সাহসের প্রয়োজন আরও নানা কারণে।

সুস্পেন-গোছের একটি ছেলে শ্যামলীর পেছনে লেগেছে। শ্যামলীকে জোর করে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। রাজী না হলে ইশারা-ইঙ্গিতে ভয়াবহ পরিণামের সম্ভাবনা জানিয়েছে। এ নিয়ে পাড়ার কিছু মাতব্বরের সঙ্গে কথা বলে থানায় একটা আগাম নালিশ জানিয়ে রাখা দরকার। গতকাল ইলেকট্রিকের বিল এসেছে আকাশ-ছোঁয়া অঙ্ক বুকে নিয়ে। এ নিয়ে ছুটতে হবে ইলেকট্রিক আপিসে। দরকার পড়লে চিঠি লিখতে হবে কাগজে। বাড়িওয়ালার উৎপাত অসহ্য হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। এক বছরে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে পঞ্চাশ টাকা। তাতেও খাঁই মেটেনি। তুলে দিতে পারলে যেহেতু হাল-আমলের রেওয়াজে ভাড়া জুটবে দ্বিগুণ, তাই জল নিয়ে, উনোনের ধোঁয়া নিয়ে, যৎসামান্য খুচরো ভুলভাল নিয়ে রোজই চালিয়ে যাচ্ছে তুলকালাম যুদ্ধ। পাড়ার নগেনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে তাঁর এক চেনা উকিলের কাছে, বাড়ী-ভাড়ার টাকাটা রেণ্ট কণ্ট্রোলে জমা দিয়ে বাড়ীওয়ালাকে টাইট দেওয়া যায় কিনা তার পরামর্শ নিতে। একজন ইলেকট্রিশিয়ানকে দিয়ে লাইনটাও টেস্ট করিয়ে নেওয়া দরকার। বাড়ীওয়ালা আমাদের লাইনের সঙ্গে নিজের লাইন ট্যাপ করে দিয়ে টাকা উসুল করার মতলব আঁটেনি তো? ঘোষ এণ্ড চক্রবর্তীর ফাইলটা নিয়ে শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াবে। ওটা বড় সাহেবের এক পেটোয়া কোম্পানী। দিল্লীর কৃষিমেলার প্যাভেলিয়নের জন্যে টেণ্ডার ডাকা হয়েছিল। কি কারণে কমদামের টেণ্ডার বাতিল করে বেশী দামের টেণ্ডার এ্যাকসেপ্ট করা হয়েছিল, তাই নিয়ে তল্লাশী সুরু হবে এবার। বড় সাহেব ফাঁসাবার চেষ্টা করবেন আমাকে। তার জন্য আগে থেকে কোমর বাঁধা দরকার। সামনের মাসে দাঁত তোলা। দাঁত তোলার আগে ব্লাডসুগার এবং ব্লাড-প্রেশারের রিপোর্ট।

গগনবাবু পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, প্রভূত পরিমাণে সাহস এবং মানসিক শক্তির প্রয়োজন তাঁর। একাধিক আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে তাঁকে সুতরাং—

গগনবাবু দৌড়ে গেলেন বাথরুমের ভিন্ন এক কোণে। হাতের মুঠোয় তুলে নিলেন মুড়ো ঝাঁটা। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন জল-নিকাশী নালার মুখ থেকে গলগল করে উঠে আসা আরশোলার ঝাঁকের দিকে। ঝাঁটার প্রথম ঘায়ে আরশোলাগুলো ছড়িয়ে পড়ল সারা বাথরুমের এদিকে-ওদিকে। কেউ-কেউ খোলা দরজা দিয়ে উড়ে যাচ্ছে দেখে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন তিনি। কেউ কেউ শ্যামলী অথবা বর্ণালীর ঝোলানো শাড়ী-ব্রেসিয়ারের ভাঁজে লুকোতে চাইছে দেখে শাড়ী-ব্রেসিয়ারগুলোকে হুক থেকে সরিয়ে গুঁজে দিলেন বালতির ভিতর। যে-জলনিকাশী নালা থেকে ওরা উঠে এসেছে, কেউ কেউ তার ভেতরে আবার ঢুকে পড়েছে দেখে অন্য একটা ভাঙা বালতি চাপিয়ে দিলেন তার মুখে। এইবার নীরন্ধ্র বাথরুমে তিনি চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হলেন চরমতম আক্রমণের জন্যে। বাথরুমের ভেতরের বাতাস থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো দেয়ালে মেঝে বালতিতে ঝাঁটার তীব্র ঝাপটে, মগ উলটে-পড়ায়, নারকেল-তেলের শিশি ভাঙায়, গগনবাবুর রাবার স্লিপারের লাথি ও মুখের নানাবিধ হুংকারে, গর্জনে, ফুঁসে-ওঠা রাগে। তাঁর এই উন্মাদের মতো রাগ চোখে দেখতে না পেয়েও বাড়ির মানুষেরা ইতিমধ্যে জেগে উঠে বুঝতে পেরেছে হঠাৎ বুঝি উন্মাদই হয়ে গেছেন তিনি। দরজায় ধাক্কা মেরে চলেছে সরমা, শ্যামলী, বর্নালী মহীতোষ, অনুতোষ।

—বাবা, কি করছেন আপনি ?

—ওগো শুনছ, দরজাটা খোল না। কেন অমন করছ ?

—বাবা, আপনি বেরিয়ে আসুন, আমরা আরশোলা মারছি।

—বাবা, পড়ে গিয়ে সেবারের মতো মাথা-টাথা ফাটালে ভাল হবে বুঝি ?

—রাত্রিবেলা নোংরা বাথরুমে কেন তুমি পাগলের মতো কান্ডকারখানা করছো বলোতো ?

—বাবা, দরজাটা খুলুন, আমি স্প্রে করে দিচ্ছি।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, ময়লায় মাখামাখি গগনবাবু ওদের সম্মিলিত প্রশ্নের জবাবে চেঁচিয়ে উঠলেন মাত্র একবারই।

—তোমরা কথা না বলে ঘুমোও গে। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। সবটাকে মেরে······

কথাটা শেষ করতে পারলেন না গগনবাবু। একটা আরশোলা নিরাপত্তার লোভে গগনবাবু ফতুয়ার পকেটে ঢুকে পড়েছিল। আক্রমণের ঝোঁকে নিজের পেটের ওপরেই মুড়ো ঝাঁটার আঘাত হেনে চললেন তিনি।

রাজ্যপাল বদল হয় কেন?
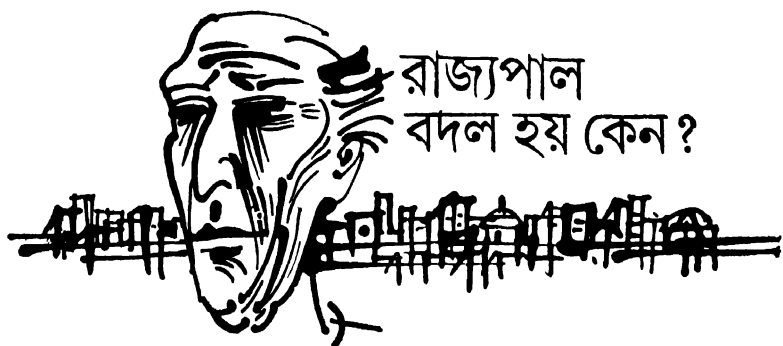
সব মানুষ নয়, কোন কোন মানুষ বড় বিচ্ছিরি।
মানুষটা বিচ্ছিরি নয়, ভেতরের স্বভাবটা। তাদের মগজে
কোন একটা প্রশ্ন ঢুকলে, উত্তর না-পাওয়া পর্যন্ত ছটফটানি।
ছটফটানিটাও ভেতরের। বাইরে থেকে টের পাবার উপায় নেই।
অন্যেরা দেখে বুঝতেই পারবে না মানুষটার হৃৎপিণ্ড
জ্বলছে একশ তিন জ্বরে। খেয়ে-দেয়ে, দেশলাই
কাঠির পেছন দিয়ে দাঁত খুটে, পকেটে পানের কৌটো ভরে, মা
মাগো বলে কাচের আলমারির মাথায় টাঙানো ছোট্ট কালীমাতার
ফটোকে প্রণাম করে, শোবার ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে বারান্দায় এসে,
আকাশের ডানদিক-বাঁদিকে চোখ বুলিয়ে, টুলি, বেশ মেঘ
দেখছি, ছাতাটা দে রে—হাঁক পেড়ে, হাতে ছাতা
নিয়ে, মিনিট সাতেক হেঁটে, সরকারি বাসের লাইনে গিয়ে
দাঁড়ালেন বিনোদবাবু। সেদিন বিনোদবাবুর
ভাগ্যটা ছিল খুব ভালো। দাঁড়াতে
না দাঁড়াতেই বাস। বসার জায়গাও পেয়ে গেলেন চমৎকার। জানলার
ধারে। বাস ছাড়ল। বাস ছাড়ার কিছুটা পরেই ঠিক
তাঁর সামনের সীটের একজন যাত্রী বগলের ভাঁজ করা খবরের কাগজ
প্রথমে পুরোটা খুলে, পরে দু-ভাঁজ করে, শেষে আরও একটা
ভাঁজ করে চোখের সামনে ছড়িয়ে নিলেন। বিনোদবাবু খবরের
কাগজ পড়েন না। আগে, বছর দুই আগে নিয়মিত

পড়তেন। কাগজের দাম চল্লিশ পয়সা হওয়ার পর থেকেই হকারকে বলে দিয়েছেন, না বাবা, আর দিও না। পারব না। হাতী পোষার খরচ। সুতরাং তাঁর চোখের সামনে আধখানা খবরের কাগজ হাট করে খোলা থাকলেও তিনি তাকাবেন না। বিনোদবাবু তাকিয়েছিলেন জানলার বাইরে। লেক টাউনের উল্টোপিঠে নতুন একটা কলোনী তৈরী হচ্ছে। সেখানে জমি কিনেছে তাঁর জামাই। অন্যদিকে তাকালে পাছে কলোনীটা চোখের আড়ালে চলে যায় তাই তিনি চোখ দুটোকে জানলার বাইরেই এঁটে রেখেছিলেন। এটা একটা সাময়িক অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে ওঁর।

বাসটা মিল্ক-কলোনীর কাছাকাছি পেঁছবার মুখে হঠাৎ একটা জোরালো চেঁচামেচির শব্দে সামনের দিকে তাকাতে হল তাঁকে। সেই সময়েই চোখটা চলে গেল খবরের কাগজের হেডলাইনে। হেডলাইনটা পড়ে চমকে উঠলেন তিনি। প্রথমে মনে মনে একবার প্রশ্ন করলেন, তাই নাকি ? তারপর পাশের পরিচিত যাত্রীর দিকে ঘুরে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন, তাই নাকি হে, কেন ? পাশের যাত্রীটি তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। অনেকেই এভাবে ঘুমোন। বিনোদ-বাবুও। সাধারণত তাঁর ঘুম আসে বাসটা আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি পেঁছলে। তারও একটা কারণ আছে। আগে বিনোদবাবু অন্যান্য বয়স্ক যাত্রীর মতোই বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়তেন। নকশাল আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সেই সময় একদিন এই বরাদ্দ ঘুমের জন্যেই আগুনে পুড়ে মরতে যাচ্ছিলেন। হয়েছিল কি, কারা যেন কিসের প্রতিবাদে আঞ্চলিক বন্ধ্ ডেকেছিল সেদিন। বন্ধ্ না মেনে যারাই গাড়ি চালাতে যাচ্ছিল, তাদের উপরই খড়্গহস্ত হয়ে উঠছিল বন্ধ্-পালনের স্বেচ্ছাসেবকেরা। সেইভাবেই তারা সরকারী বাসটাকে আটকায়। যাত্রীদের বিনয়ের সঙ্গেই জানিয়ে দেয়, যাঁরা বাঁচতে চান, নেমে যান মোশাই। আমরা এখন এটাতে আগুন লাগাবো। সবাই হুড়মুড় করে নেমে গিয়েছিল। বিনোদবাবুকে নামার সময় কেউ ডাকে নি। ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার ফলে তিনি শুনতে পাননি বোমার দুমদাম এবং বন্ধ্-পালনকারীদের তড়পানি। ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ আগুনের তাপ পেলেন গায়ে। ধড়মড়িয়ে জাগলেন যখন, বাসের আদ্ধেকটা তখন লাল। সেই অবধারিত মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন, জায়গাটা অপয়া, এটা না পেরোলে আর ঘুমনো নয়।

যাই হোক, পাশের ঘুমন্ত সহযাত্রীর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে বিনোদবাবু আবার, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, খবরের কাগজের হেডলাইনের দিকে তাকালেন। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল বদল আসন্ন। একই অক্ষরের ওপর বারবার চোখ বোলালেন তিনি।

আর ক্রমশ তাঁর মনের ভেতরে, গোটানো লাটাইয়ের সুতো খুলতে শুরু করলে যেমন হয়, সেইভাবেই অনেকটা, লম্বা হয়ে উঠতে লাগল নিজস্ব প্রশ্নমালা।

সেটাকে ধাপে ধাপে সাজালে চেহারাটা দাঁড়াবে এই রকম—

প্রথমে—তাই নাকি ?

পরে—তাই নাকি ? যাঃ চ্যালো, কবে কবে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল ?

আরও পরে—তাই নাকি ? যাঃ চ্যালো, কবে কবে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল ? কই, কারো মুখ থেকে তো শুনিনি এ খবর ? রাজ্যপাল বদল হবে কেন ?

আরও পরে—তাই নাকি ? যাঃ চ্যালো, কবে কবে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল ? কই, কারো মুখ থেকে তো শুনিনি এ খবর ? রাজ্যপালের চাকরির মেয়াদ শেষ হতে তো আরো এক বছর বাকি। তাহলে রাজ্যপাল বদল হবে কেন ? রাজ্যপাল আবার কি করল ? রাজ্যপাল কি গোপনে পাকিস্তানকে কিছু ম্যাপ-ট্যাপ পাচার করেছে নাকি ? নাকি বামফ্রন্ট সরকারের পাল্লায় পড়ে কম্যুনিস্ট ? নাকি গোপনে রাষ্ট্রবিরোধী কোন—

আর. জি. কর ছাড়িয়ে গাড়ি যখন শ্যামবাজারে, বিনোদবাবুকে কে যেন পেছন থেকে ডাকে।

—আরে মুখুজ্যে নাকি ?

বিনোদবাবু ঘুরে তাকান।

—আরে, রাধাকান্ত যে। কোত্থেকে উঠলে ? শ্যামবাজার ? কেন, তোমার তো রাজবল্লভ পাড়া।

—এদিকে একটু আসতে হয়েছিল। কাঠগোলায়।

—কাঠগোলায় ? বাড়ি করছ নাকি ?

—ঠিক বাড়ি নয়। দোতলায় একটা ঘর তুলছি। বড় ছেলের তো বিয়ে হয়ে গেছে। তার অসুবিধে হচ্ছিল।

—তাই নাকি ? কবে বিয়ে দিলে লুকিয়ে-চুরিয়ে ? খবরই পেলুম না। হ্যাঁ হে, রাজ্যপালের খবর জান নাকি কিছু ?

—রাজ্যপাল ? কেন কি হয়েছে ?

—এই যে কাগজে লিখেছে, আমাদের রাজ্যপাল নাকি চলে যাচ্ছেন! দিল্লী আর চাইছে না যে উনি পশ্চিমবঙ্গে থাকুন। শুনেছ কিছু ?

—আঃ, গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছেন কেন ? দুৎ মশাই, আঃ করছেন কি বলুন তো, চোখ নেই নাকি ? বাসে উঠে অত লাটসাহেবী দেখাবে না, আপনি চুপ করুন, থামুন মশাই থামুন, কে ভদ্রলোকের মতো কথা বলছে, সবাই শুনেছে, ভদ্রলোক হলে বুড়ো মানুষের পা-টাকে এমন করে মাড়াতেন না—

ঘোরালো তর্ক-বিতর্কের ঝাঁঝ বিনোদবাবু রাধাকান্তকে ভিড়ের মধ্যে অনেক পেছনে ঠেলে দেয়! ফলে বিনোদবাবুর উত্তর পাওয়া হয় না। তিনি চোখ

বুজিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করেন। কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেন গলায় ইলিশ মাছের কাঁটা বিঁধে গেলে যেমন হয়, রাজ্যপালের প্রশ্নটা তেমনি বিঁধে বসেছে তাঁর মনের ভেতরে। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অগত্যা তাঁকে আবার দ্বিতীয় দফায় ভাবনা শুরু করতে হয়।

বেশ ঘোরালো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। বড় রকমের কোন যুদ্ধ-টুদ্ধ বাধবে নাকি? বাধলে কার সঙ্গে? আমেরিকা, না পাকিস্তান? হতে পারে। সেই জন্যেই বুড়ো আর ভালোমানুষ রাজ্যপালকে সরিয়ে তাগড়াই কাউকে এনে বসাতে হচ্ছে হয়তো। কিন্তু তাতেই বা লাভটা কি? পরে যিনি আসবেন তিনিও তো রাজ্যপাল। রাজ্যপালের বদলে আসবেন রাজ্যপালই। রাষ্ট্রপতি তো আর আসবে না। তা যুদ্ধ যদি লাগেও রাজ্যপাল তো আর যুদ্ধ করবেন না। তাহলে রাজ্যপাল বদল হচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে। বিনা কারণে রাজ্যপাল বদল হতে পারে না। বর্তমান রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গের এমন কিছু ক্ষয়-ক্ষেতি করেছে, যা আমরা জানি না, দিল্লী টের পেয়ে গেছে গোপনে। কিন্তু রাজ্যপাল কি রাজ্যের ক্ষয়-ক্ষেতি করতে পারে? পারে হয়তো। না পারলে রাজ্যপাল বদলের ব্যাপারটা ঘটবেই বা কেন? একটা রাজ্যপাল বদলানো তো ইয়ার্কি'র কথা নয়। সাত-ঝামেলা। আপিসে একটা বড়বাবু রিটায়ার করলে তার জায়গায় অন্য একটা বড়বাবুকে এনে বসাতে কোম্পানি হিমসিম। সেবারে আমাদের আপিসের স্টেনো কাশীনাথ টাটা কোম্পানীতে বেশী মাইনের অফার পেয়ে চলে গেল। তারপর নতুন একটা স্টেনোকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পাক্কা এক বছর। ইউনিয়নের ক্যান্ডিডেট, কোম্পানীর ক্যান্ডিডেট, বিজ্ঞাপনের ক্যান্ডিডেট, ম্যানেজারের নিজস্ব গোপন ক্যান্ডিডেট, পোস্টার, হ্যান্ডবিল, শ্লোগান, হাতাহাতি, কত-শত কান্ডের পর একটা স্টেনো। আর এ কিনা রাজ্যপালের ব্যাপার। তাছাড়া যে-কোন রাজ্যপালকে পশ্চিমবঙ্গে আসতে বললেই ছুটে আসবে নাকি? জল-হাওয়ার ব্যাপার আছে। আমিষ-নিরামিষের ব্যাপার আছে। কত বছরের চাকরি, কি রকম মাইনে, কতটা সুখ-সুবিধে তার হিসেব-নিকেশ আছে। পশ্চিমবঙ্গের তরি-তরকারির, শাক-সব্জির, মাছ-মাংসের, দুধ-ঘি-এর দামের দিকে তাকিয়ে পরে যিনি রাজ্যপাল হবেন তিনি যদি ভেবে দেখেন মাইনের চেয়ে খাই-খরচা বেশী, তিনিই বা নিজের সুখের চাকরি ছেড়ে আসতে চাইবেন কেন? আর নতুন একটা রাজ্যপাল জোগাড় করা যখন এতই কঠিন তাহলে রাজ্যপাল বদল করারই বা এত তাড়াহুড়ো কিসের? প্রধানমন্ত্রীরা না মরা পর্যন্ত যেমন প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপালের বেলাতেও তো তেমনি নিয়ম করে দিলে হয়। আর রাজ্যপাল মরে গেলে, তার ছেলেকে ডেকে এনে বসিয়ে দাওনা বাবা, বাবার চেয়ারে। অত ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটে গিয়ে কী দরকার?

সরকারী বাস পেঁছে যায় ডালহৌসিতে। বিনোদবাবু আপিসে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসেন। হাতের ছাতাটা ঝুলিয়ে দেন একটা নির্দিষ্ট জায়গায়। বসেই ড্রয়ার খোলেন। ড্রয়ারের ভেতরে, পকেট থেকে পানের কৌটো বের করে, রাখেন। এরপর ড্রয়ারের নীচের অংশটা খোলেন। সেখান থেকে বের করেন একটা কাচের গ্লাস। ড্রয়ার বন্ধ করে, কাচের গ্লাসটা হাতে নিয়ে, বাথরুমে পেচ্ছাপ সেরে, মুখে জলহাত বুলিয়ে, রুমালে মুখ মুছে, গেলাস ভর্তি জল নিয়ে. নিজের চেয়ারে ফিরে এসে টেবিলের একপাশে গ্লাসটা রেখে, একটা প্লাস্টিকের চাক্তি ঢাকা দিয়ে, উপর-ড্রয়ারটা আবার খুলে, কৌটোর একটা পান মুখে দিয়ে, বাঁদি'কে হাত বাড়িয়ে একটা ফাইল টেনে নিয়ে ঝুঁকে পড়েন।

একটু পরেই রঙ্গীন ছিটের বুশ শার্ট পরা একটি পাতলা যুবক এসে দাঁড়ায় বিনোদবাবুর কাছে।

—মুখাজ্জীদা, চাঁদাটা।

বিনোদবাবু ফাইলের কালো হরফের নীচে নীল পেন্সিলের দাগ মারতে মারতে, এবং ফাইল থেকে চোখ না তুলেই প্রশ্ন করেন।

—কিসের চাঁদা হে ?

—বাঃ, ভুলে গেলেন! লাহিড়ীর বিয়ে। আমরা কলিগরা ঠিক করেছি সবাই মিলে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা টি. ভি. সেট কিনে দেব, ভুলে গেলেন ?

এতক্ষণে বিনোদবাবু, মুখ না তুলেও বুঝতে পারেন পাতলা যুবকটি কে। হর্ষ। হর্ষ দাস্তিদার। ইউনিয়নের লিডার। বক্তৃতায় আগুন ছোটে। কোম্পানী ভয় পায়। হর্ষের কথা মনে আসতেই আবার রাজ্যপালের প্রশ্নটা ঝট্ করে লাফিয়ে ওঠে মগজে। তিনি হর্ষের দিকে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকান।

—হ্যাঁ হে হর্ষ, তুমি তো রাজনীতিতে ধুরন্ধর। রাজ্যপালের বদলি হওয়ার ব্যাপারটা কি বল তো ? হঠাৎ রাজ্যপাল বদল হচ্ছে কেন ? এখনো তো এক বছর বাকি ছিল...

হর্ষর মুখে সিগারেট। বিনোদবাবুর টেবিলে কোন এ্যাসট্রে খুঁজে না পেয়ে হর্ষ পাশের টেবিলের এ্যাসট্রেতে ছাই ঝেড়ে আবার বিনোদবাবুর টেবিলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আচমকা হো হো করে হেসে ওঠে। তার ঝাঁঝালো হাসিতে ডিপার্টমেন্টের সব কটা চোখ ঘুরে যায় বিনোদবাবুর টেবিলের দিকে। আর হর্ষ, যেন ডিপার্টমেন্টটা একটা মঞ্চ, আর এই দৃশ্যে তাকে সংলাপটা বলতে হবে দর্শকের দিকে তাকিয়ে, তাই ডিপার্টমেন্টের মোট আটচল্লিশটা চেয়ারের আটচল্লিশ জন কেরানীকে শোনাবার মতো জোরালো করে নেয় গলাটাকে।

—আপনারা ভাবতেন মুখাজ্জীদা দেশের কথা, রাজনীতির কথা ভাবেন না। এই দেখুন, মুখাজ্জীদা এই মাত্র আমাকে প্রশ্ন করলেন, রাজ্যপাল বদল হচ্ছে কেন ?

আটচল্লিশজন কেরানীর মাথার ওপরে মোট বারোটা পাখা। তার তিনটে অচল। হর্ষর চিৎকার এবং হাসি এবং সেই সঙ্গে অন্যান্যদের হাসি এবং খুচরো মন্তব্য মোট ন-টা পাখার বাতাসে ঘুরপাক খেতে খেতে সংলগ্ন লম্বা করিডোরের দিকে চলে যায়। তখনই হর্ষ গলাটাকে এমন খাদে নামায়, যেন স্বগতোক্তি।

—আপনি রাজ্যপালকে নিয়ে ভাবছেন? ওদিকে কি অর্ডিন্যান্স আসছে জানেন?

—কি?

—নিয়মে আসা। ঘড়ি ধরে। নিয়মে কাজ। ধর্মোঘট-টর্মোঘট, আপিস-প্রেমিসে শ্লোগান-টোলোগান, ক্যানটিনে টিফিনের পর আড্ডা বন্ধো। না মানলে এসমো। মানে চাকরি খতম।

—সে আবার কি? কবে কবে এত সব হল? কোত্থেকে এল এ-সব উপদ্রব?

—আপনার ঐ রাজ্যপালের চাকরি যাবার নোটিশ এসেছে যেখান থেকে।

—রাজ্যপালেরও কি ঐ-এর জন্যে চাকরি গেল নাকি? নিয়মে কাজ করতেন না বলে? রাজ্যপাল আবার ধর্মোঘট করল কবে? কি বললে কথাটা, কিসের অর্ডিন্যান্স যেন?

—এসমো···

—মানে কি হে?

—এসেনসিয়াল সারভিস মেনটেনান্স অর্ডিনান্স। মানে অত্যাবশ্যক শিল্প ও সংস্থায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ করণের অর্ডিনান্স। বুঝলেন কিছু!

—কই এসব কথা তো আগে বলনি কোনদিন।

—বাঃ, বেশ বললেন তো? পরশু আপিস-ক্যানটিনের মিটিং-এ আপনাকে ডাকলাম না?

—সে কি ঐ জন্যে নাকি? আমি ভাবলুম সামনে পুজো, বোনাস-টোনাস নিয়ে যেমন হয় প্রতি বছর···

—মোটেই না। সতেরোই আগস্ট সারা দেশে 'কালা দিবস' পালন করা হবে। তার প্রস্তুতির জন্যে মিটিং···

এই সময় কে যেন হর্ষকে ডাকে। হর্ষ কথা শেষ না করেই চলে যায়। বিনোদবাবু হর্ষর দিকে উঁচু করে রাখা মুখটাকে আবার ফাইলের দিকে নামিয়ে নেন। এসমো-র সমস্যাটা তাঁর কপালের ভাঁজে লেগে থাকে। কিছুক্ষণের জন্যে রাজ্যপাল-সমস্যার চেয়ে এসমো-সমস্যাটাই বড় হয়ে উঠতে চায় যেন। কিন্তু একটু পরেই যখন তাঁর মনে পড়ে যে কোন অত্যাবশ্যক সংস্থায় তাঁর চাকরি নয়, তখন আবার রাজ্যপাল-বদলের বিষয়টাই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। রাজ্যপালকে যেন নিরীহ, নিয়মের দাস, তবে সম্ভ্রান্ত এই রকম একটি চাকুরের আদলেই দেখতে পান এখন। এই প্রসঙ্গেই, চাকরি চলে গেলে রাজ্যপাল কী খাবেন, কী পরবেন, ছেলে থাকলে পড়ানো, মেয়ে থাকলে বিয়ে, এসব সাত-সতেরো ঝামেলা কী ভাবে মেটাবেন, সেই চিন্তায় বিনোদবাবু বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। তিনি কখনো

রাজ্যপালকে চোখে দেখেন নি। একবার আপিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় মিনিবাসের লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন যখন, একটা সাদা লম্বা গাড়ি ভোঁ বাজিয়ে চলে যাবার পর লোকে বলেছিল, রাজ্যপাল গেলেন।

চোখে দেখিনি তো কী হয়েছে! লোকটা তো আমাদেরই মতো মানুষ। হুট্ করতে চাকরি চলে গেলে আমাদের মতো মানুষের যা হয়, তাঁরও তো সেই রকমই হবে।

আচ্ছা, চাকরি গেলে বেচারীর গাড়ি থাকবে না। তখন কি তাহলে আমার মতোই ট্রামে বাসে? ছোলা-ঝুলি করতে পারবেন তো?

আপিস ছুটির পর বিনোদবাবু মিনিবাসের লাইনের দিকে না হেঁটে সোজা রাজভবনের দিকে মুখ ঘোরালেন। হাঁটার আসল উদ্দেশ্যটা রাজভবন দেখা নয়। ঐ দিক দিয়েই তাঁকে যেতে হবে লিণ্ডসে স্ট্রীটে। সেখানে একটা দোকান আমুলে মাখন দেবে তাঁকে গোপনে। মাখন বাজার থেকে উধাও। মাখন কেন, সবই তো উধাও। আজ পাউরুটি, কাল চিনি, পরশু কেরোসিন, তার পরের দিন আলু। আলু কেন শুধু, পেঁয়াজ। খবরের কাগজে ছেপে বেরোল পেঁয়াজ চালান যাচ্ছে বিদেশে, অমনি পেঁয়াজের পায়া ভারি হয়ে গেল। এক লাফে এক টাকা দাম বেশি। এই শালা খবরের কাগজগুলো যত নষ্টের গোড়া। নচ্ছারের এক শেষ। ওরাই লিখে লিখে এই সব কাণ্ড বাধাচ্ছে। পেটের সব কথা তোকে কাগজে ছাপতে হবে কেন? রাজ্যপাল বলে মানুষ, তিনি থাকছেন কি যাচ্ছেন, তোদের আগ বাড়িয়ে দেশশুদ্ধ লোককে জানানোর কি দরকার পড়ল বাবা? এ্যাঁ! রাজ্যপালকে তো আমরা তৈরী করিনি। দিল্লীর মনে হয়েছিল পাঠিয়েছিল, দিল্লীর মনে হয়েছে, আবার সরিয়ে দিচ্ছে। আর অমন ফলাও করে খবরটা যদি ছাপলি, তাহলে কেন বদল হচ্ছে সেটাতো কই সাহস করে লিখতে পারলিনি! তাহলে বুঝতাম, মুরোদ আছে। কেন ঘটছে তার পেছনের খবরটা যখন জানিস না, তখন সে-কথা নিয়ে অত ঢাক-ঢোল বাজানো কেন? কোন কথা যখন বলবি, তার কার্য-কারণ, কেন ঘটছে, উদ্দেশ্য কি, সেগুলো জানবি তো আগে। তা নয়, মুখরোচক খবর পেল তো, দে ছেপে।

ভাবতে ভাবতেই রাজভবনের সামনে এসে যান বিনোদবাবু। এক নম্বর গেটের মুখোমুখি উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পড়েন। গেটের সামনে সাদা পোষাকে অনেক কনস্টেবল। তারপর লম্বা লাল সুরকি। তার ওপারে সিঁড়ি। কী প্রকাণ্ড বাড়ি! কম করে হাজার খানেক ঘর আছে বোধহয়। সাতশো-আটশো হবেই। এতগুলো ঘর দিয়ে কী করেন রাজ্যপাল? আর এতগুলো ঘর যখন থাকবে না, কী করবেন বেচারা?

ঠিক আমারও এমনি হয়েছিল। দেশের প্রকাণ্ড হাজারদুয়োরী ঘর-বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় আসার পর প্রথম যে ভাড়া বাড়িতে ছিলাম, তার না আছে ঠাকুর

দালান, না পুকুর, না উঠোন, না সিঁড়ি, না টানা বারান্দা, না ছাত। কোথাও কিছু নেই, দেড়খানা ঘর, আড়াইটা জানালা, দেড় হাত বারান্দা, এক চিলতে রান্নাঘর। তারও আবার সতেরো টাকা ভাড়া। বিমলের মা মানে আমার স্ত্রী, সেও কম বড়লোকের বাড়ির মেয়ে নয়। নান্দীচকের ঘোষাল বাড়ির মেয়ে। এখন ভিনো-ভাগারী হয়ে সব তছ্‌নছ। আগে তো ছিল রাজার মতো পরিবার। কলকাতায় ঐ ইঁদুর গত্তে ঢুকে বিমলের মায়েরও কি দুর্গতি! কেঁদে-কেটে অস্থির। বলেছিল, বাচ্চা হলে রোদ খাওয়াবো কোথায়।

রাজ্যপালের সঙ্গে নিজের একটা আবছা মিল খুঁজে পেয়ে বিনোদবাবু যেন আরো সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন রাজ্যপালের ওপর। অন্তরঙ্গ কোন প্রিয় বন্ধু-বান্ধবের আকস্মিক বিপদে মানুষ যে ভঙ্গীতে কথা বলে, মুখের চামড়ার ওপর যে-ভাবে ক্রীমের মতো মাখিয়ে দেয় স্নেহ-মমতা, বিনোদবাবু সেই ভাবেই, রাজভবনের উল্টোদিকের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে, রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলে যান।

জানেন তো বদলীর নোটিশ পেয়েছিলাম একবার আমিও। বলা নেই, কওয়া নেই যেতে হবে শিলিগুড়ি। সর্বনাশ! বাজ পড়ল যেন মাথায়। আমার প্রথম খোকার বয়স তখন মোটে দুই। বিমলের মা মানে আমার স্ত্রীর পেটে তখন আরেকটি। ভরা মাস। জানেন তো সাহেবরা—তখন সাহেবদের রাজত্ব, খুব স্ত্রী-ভক্ত জাত। বাপের অসুখ, কি মা মরণাপন্ন বললে ছুটি বরবাদ। কিন্তু বৌ-এর পেটের অসুখ বললেই, মঞ্জুর। স্যার, বৌ-এর এখন-তখন, বাচ্চাটা খালাস হয়ে যাক স্যার, স্যার একুশে না কাটলে তো বৌ আঁতুড় থেকে বেরোতেই পারবেনি স্যার, এই সব বোঝাতে যাই হোক রাজী হয়ে গেল। যাই বলুন, সাহেব জাতটা ছিল লজিক্যাল। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারলে বুঝত। তো সে-সব দিনকাল তো এখন নেই আর। কি করবেন বলুন।

হাঁটতে হাঁটতে ইস্টার্ণ রেলওয়ের পাব্লিক রিলেশন্‌স আপিসের কাছে এসে আরও একবার দাঁড়িয়ে পড়েন বিনোদবাবু, সিংহ-বসানো গেটের মুখোমুখি। হাতের ছাতাটার ওপর ভর রেখে এমনভাবে দাঁড়ান, দাঁড়িয়ে তাকান, যেন নিজেরই বসতবাটির খুঁত-খাঁতের দিকে নজর তাঁর। দেখতে দেখতে, সম্ভবত খুব গভীর কোন ভাবনায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাই তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে, তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে অন্য একটা মানুষ যে অনেকক্ষণ মুচকি হেসে যাচ্ছে, খেয়ালই করেন নি। খেয়াল হতেই অবাক হয়ে বললেন,

—আরে, মদনবাবু!

—ওদিকে, তাকিয়ে কি দেখছিলেন এক মন দিয়ে?

—না, মানে চলে যেতে হবে তো,...

—চলে যেতে হবে ? কাকে ?
প্রশ্নটা শুনে মাথাটা গুলিয়ে যায় বিনোদবাবুর। তক্ষুণি দেবার মতো উত্তর খুঁজে পান না কোন।
কী আশ্চর্য ! বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে কাকে ? আমাকে ? না রাজ্যপালকে ? অথচ যেন আমাকেই চলে যেতে হবে এই রাজকীয় অট্টালিকা ছেড়ে, এই ভাবেই আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম, বাঁধা-ছাদা, নড়ানো-সরানোর সাত-সতেরো ঝামেলায়। নিজের সম্বিত ফিরে পেয়ে বিনোদবাবু নড়ে-চড়ে ওঠেন।
—শোন নি ? রাজ্যপাল বদলী হয়ে যাচ্ছেন।
তা শুনবো না কেন ? তা নিয়ে তো কাগজে-কাগজে কত রকম খবর। প্রায় জোর করেই বদলী করানো তো। তা আপনি অমন করে রাজভবনের দিকে কি দেখছেন ? নীলাম হলে কিনে ফেলবেন নাকি ?
মদনবাবু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসেন নিজের রসিকতায়।
—ও তুমি বুঝবে না হে। ব্যাপারটা যত সোজা ভাবছ, অতটা সোজা নয়। অনেক কল-কাঠি এর পেছনে। পরে বুঝবে। তা তুমি এদিকে কোথায় ?
—আর বলবেন না। বেশ বিপদেই পড়ে গেছি। এসেছিলাম মোহিতের কাছে, রেলের আপিসে। আমার ভাগ্নে আর তার বৌ, বৌ আবার মেমসাহেব, ওরা আমেরিকা থেকে এসেছে। অমৃতসর-টরের দিকে বেড়াতে যেতে চায়। তাই মোহিতের কাছে, ও তো পিয়ারো ডিপার্টমেণ্টে আছে, তা গিয়ে শুনি তিন মাস আগে বদলী হয়ে গেছে হেড আপিসে।
—এই রকমই হবে এখন। কাউকে তুমি ঠিক জায়গায় পাবে না ভায়া। যেখানে যাবে দেখবে ভুল লোক বসে আছে চেয়ারে। এবার রাজ্যপাল বদল হয় কেন, বুঝতে পারছো ? পারছো না তো ? আচ্ছা চলি হে...
বিনোদবাবু চলে যান। মদনবাবু হতভম্ব তাকিয়ে থাকেন বিনোদবাবুর যাওয়ার দিকে। মোহিতের বদলীর সঙ্গে রাজ্যপালের বদলীর যে কি সম্পর্ক সেটা নিজের মগজে ঢোকাতে না পেরে, বিনোদবাবুর মগজ সম্বন্ধে একটা সন্দেহজনক প্রশ্নকে লুডোর ছক্কার মতো মনের মধ্যে নাড়াতে নাড়াতে পা বাড়ান ডালহৌসীর দিকে।
বিনোদবাবু লিণ্ডসে স্ট্রীটের দোকানে গিয়ে মাখন পান না। এতটা হেঁটে এসে মাখন না পাওয়ার জন্যে মেজাজটা খিঁচড়ে যায় তাঁর। মাখন সম্বন্ধে বিস্তৃত খোঁজ-খবর নিতে গিয়েই আরও অনেক খবর জানা হয়ে যায়। জিনিসপত্র কেন বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়, তার রহস্য। এবং অদূর ভবিষ্যতে জিনিসপত্রের কি রকম আকাশ-ছোঁয়া দাম হবে, তারও আগাম হদিশ। বিনোদবাবু শোনেন। শুনতে শুনতে মাখন, ময়দা, কেরোসিন তেল, সিমেণ্ট, লোহার সঙ্গে মিশিয়ে নেন রাজ্যপাল বদলী হওয়ার সমস্যাটাকেও।
বিনোদবাবু বাড়িতে গিয়ে দেখেন তাঁর শোবার ঘরের খাটে বসে আছে মেয়ে-

জামাই। তাকিয়েই আন্দাজ করে নিতে পারলেন, কোথাও একটা বিপদ ঘটেছে কিছু। জামা-প্যান্ট ছেড়ে লুঙি-ফতুয়া পরে বাথরুমের বেসিনে হাত-মুখ ধোয়ার সময় ছোট মেয়ে টুলি তোয়ালে দেবার অছিলায় দৌড়ে আসে।

—জান, বাবা, দিদি-জামাইবাবুরা খুব বিপদে পড়েছে—

—কি হয়েছে ?

—সে আমি বলব না বাবা। মা বলবে সব।

হাত-মুখ ধুয়ে নিজের শোবার ঘরে এসে মেয়ে জামায়ের পাশে বসে বিনোদবাবু দুজনকেই একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন।

—কখন এলি ? কখন এলে ?

মেয়ে-জামাই দুজনেই খাট থেকে নেমে বিনোদবাবুকে প্রণাম করে। প্রণাম শেষ হতেই বিনোদবাবুর স্ত্রীর কান্না-সপ্ সপে কণ্ঠস্বর।

—ওদের তো খুব বিপদ।

—কেন, কি হয়েছে ?

—শোন ওদের মুখ থেকে।

বিনোদবাবু যেন যে-কোন দুঃসংবাদ শোনার জন্যে প্রস্তুত, এমনি অবিচলিত। অথবা তাঁর মনের হিসেবটা অন্য রকম। রাজ্যপাল বদলী হয়ে যাচ্ছেন, এ-রকম একটা খবরের পর আর কী এমন ভয়াবহ দুঃসংবাদ থাকতে পারে ? তিনি নিজেই মেয়ে-জামাইকে খোঁচান।

—কি হয়েছে ? শুনি ! সাবি, কি হয়েছে বলবি তো।

মেয়ে সাবিত্রীর বদলে জামাই কাশীনাথই বলতে শুরু করে অতঃপর।

—কাল বিকেলে ক্ষুদিরাম কলোনীতে গেছি, রোজ যেমন যাই। গিয়ে দেখি মজুররা কেউ কাজ করছে না। হাত পা গুটিয়ে বসে। শুধু আমার নয়। যে-কটা বাড়ির গাঁথনির কাজ হচ্ছিল, সব বাড়িরই। আমি হেড মিস্ত্রি মকবুলকে জিজ্ঞেস করলুম, মকবুল, কাজ বন্ধ কেন ? মকবুল জবাব দেবার আগেই, ঠিক আমার পাশের প্লটটা যার, কৃষ্ণবাবু, তিনি পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, এদিকে আসুন। আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। খুব সিরিয়াস ব্যাপার। আমি তিন চারটে বাড়ির পর একটা বাঁকে গিয়ে দেখলুম, জনা সতেরো লোক। অনেকেই অচেনা। তবে সকলেই আমার মতো বাড়ি করছে এখানে। সেখানে যা শুনলুম, হাত-পা হিম হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। কাল দুপুরের পর গোটা সাতেক ছেলে হাতে পাইপগান নিয়ে কলোনীর প্রত্যেকটা উঠতি বাড়ির মিস্ত্রী হেডমিস্ত্রীদের শাসিয়ে গেছে, কাল থেকে কেউ কাজে আসবি না। আমরা সবাই এ অঞ্চলের মাস্তান। বেকার। আমাদের কিছু দক্ষিণে না দিয়ে এখানে বাড়ি বানানো চলবে না। এতকাল এ-সব জমি আমরাই পাহারা দিয়ে এসেছি। বুঝলে হে ! তোমাদের বাবুরা এলে বলে দেবে, বাড়ি

পিছু সাত হাজার টাকা দক্ষিণে চাই আমাদের। দিলে কোন শালার ঘাড়ে মাথা নেই যে এ-তল্লাটে এসে কোন রকম ব্যাগড়বাঁই করে যাবে। আর না দিলে কোন শালাকে আর এখানে বাড়ি গাঁথতে হবে না।

—তারপর ?

—তারপর আমরা সবাই যুক্তি-পরামর্শ করে থানায় গেলাম ডায়েরী করতে। থানায় গিয়ে শুনি ওসি বদল হয়ে গেছে গত মাসে। নতুন ওসি না জয়েন করা পর্যন্ত থানা কোন দায়িত্ব নিতে রাজী নয়।

জামাই থামতেই মেয়ে ডুকরে ওঠে।

—কি হবে বাবা ? ও তো কাল থেকে নার্ভাস হয়ে পড়েছে। সব সময় বলছে, হাত-পা ঝিমঝিম করছে। আমি তাই বলছিলুম, প্রেসারটা চেক করিয়ে নাও। বাবা বল না, কি করব এখন ? কত কষ্টে পাওয়া সিমেন্ট-টিমেন্ট সব তো পড়ে আছে ওখানে। ভয়ে কেউ যেতে পারছে না।

বিনোদবাবু কোন উত্তর দেন না। উত্তর দেন না বটে, কিন্তু উত্তরোত্তর তাঁর হৃৎপিণ্ডের ভেতরে একটা জ্বরের মতো যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। রাগ, তাপ, দুঃখ, অপমান, ক্ষোভ, অক্ষমতা মেশানো এক জ্বর। নিজের ভেতরে ভীষণ ছটফট করতে থাকেন তিনি। কোন সমস্যা-সংকুল রাজ্যের রাজ্যপালের মতোই তিনি যেন এখন জড়িয়ে পড়ছেন নানা দায়-দায়িত্বে। অথচ সমস্যার কোনটার জন্যেই দায়ী নন তিনি। সমাধানেও অক্ষম। তাঁর কেবলই মনে হয়, রাজ্যপাল বদল হল কেন, এইটেই আসল সমস্যা। এর উত্তরটা যদি পেয়ে যেতেন, বাকী ব্যাপারগুলো সহজেই সামলে নেওয়া যেতে পারতো। যেহেতু রাজ্যপাল বদলের কোন গোপন তথ্য অথবা ইতিহাস অথবা ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা তাঁর জানা নেই, তাই তিনি হঠাৎ-বদলী-হওয়া রাজ্যপালের মতোই গুম মেরে যেতে বাধ্য হন যেন।

কোন কোন মানুষের স্বভাবটা খুব বিচ্ছিরি। যখন ঘুমোন, ঘুমিয়েই থাকেন। যখন জাগেন, তখন আর ঘুমোতে চান না। এখন বিনোদবাবুর অবস্থাটা সেই রকম। যখন কাগজ পড়তেন না, দেশের কোথায় কী হল না হল, কিছুই ভাঁজ ফেলতো না তাঁর কপালে। বাসের মধ্যে খবরের কাগজের হেড লাইনটার দিকে তাকিয়েই যেন সর্বনাশটা পাকিয়েছেন তিনি। এখন মনে হচ্ছে, খবরের কাগজ পড়াটা উচিত ছিল রোজই। তাহলে হয়তো কিছুটা আঁচ আন্দাজ করতে পারতেন বর্তমান সময়ের, মানে রাজনীতির হালচালের। আর সেই সুবাদে রাজ্যপাল বদল হয় কেন-র পটভূমিকাটাও জানা হয়ে যেত অনেকখানি।

মেয়ে সাবিত্রী, জামাই কাশীনাথ এবং তাঁর স্ত্রী আর খাটের একটু ওধারে ছোট মেয়ে টুলি সকলেই বিনোদবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দাঁত পড়ে গিয়ে গালটা ভাঙ্গা বলেই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় তাঁর চোয়ালের অস্থিরতা। কপালের ভাঁজে ঢেউ-এর ওঠানামা। এ থেকে অনুমান হয়, মেয়ে-জামাইকে

কোন মোক্ষম উপদেশ দেওয়ার কথাই ভেবে চলেছেন তিনি। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে কেবল চোয়াল নাড়া দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে ওঠেন বিমলের মা অর্থাৎ বিনোদবাবুর স্ত্রী। অনেকটা বোয়াল মাছের মতো হাঁ ছড়িয়ে মুখ-ঝামটা দিয়ে ওঠেন তিনি।

—কি গো, তুমি বোবা হয়ে গেলে যে! কতক্ষণ বসে থাকবে ওরা? একটা কিছু বলবে তো?

বিনোদবাবুর ঘোলাটে চোখটা তাঁর স্ত্রীর দিকে উঠে আসে আধ-মরা পাখির পাশ ফেরার ভঙ্গীতে।

বিনোদবাবুর ইচ্ছে করেছিল চিৎকার করে উঠতে। জামাই কাশীনাথের দিকে তিনি ছুঁড়তে চেয়েছিলেন একটা আগুনে-বান।

—ওহে, তোমরা তো আর আমার মতো বৃদ্ধ জরদগব নও। তাজা জোয়ান, রাজ্যপাল বদল হয় কেন-র উত্তরটা নিয়ে এস তো দেখি। আমি তোমার বাড়ির সমস্যা মিটিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু তিনি সে-ভাবে কিছু বললেন না। তাঁর বিচ্ছিরি স্বভাবটা তাঁকে রাজ্যপাল সমস্যার সঙ্গে তখন এমন ভাবে সাতপাকে জড়িয়েছে যে, চাকরি খতমের নোটিশ পাওয়া এক রাজ্যপালের মতোই শোনাল তাঁর ম্রিয়মান কণ্ঠস্বর।

—আমি কি বলবো? আমি তো বদলী হয়ে গেছি।